বিষয় ঃ বৌদ্ধধর্ম

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ড. বারিদবরণ ঘোষ
সম্পাদিত

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

বিষয় ঃ বৌদ্ধধর্ম

এই রাজেন্দ্রলালের কাছ থেকেই হরপ্রসাদ বৌদ্ধশাস্ত্রের গুহায় প্রবেশের 'চিচিং ফাঁক' মন্ত্রটুকু শিখে নিয়েছিলেন। এবং তারপর থেকেই বৌদ্ধধর্মের সূচনা, প্রসার এবং অধোগতি বিষয়ে গবেষণার জন্য জীবনের সিংহভাগ সময় নিজেকে নিয়োজিত রাখলেন। বস্তুত বাঙালিদের মধ্যে তিনিই বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ে এতো গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হন। এরই ফলে তাঁর জীবনের অন্যতম আবিষ্কারটি আরব্ধ হয়—নেপাল রাজদরবারের (তৃতীয়বার অনুসন্ধানকালে) পুথিশালায় চর্যাগীতির পুথি আবিষ্কার যা 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে বুদ্ধিজীবী মহলে।

আগেই বলেছি বৌদ্ধ বিদ্যাচর্চায় তিনি জীবনের সিংহভাগ ব্যয়িত করেন। 'বৌদ্ধধর্ম' নামে (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ) একটি নাতিবৃহৎ পুস্তক রচনা ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু বুদ্ধ-বিষয়ক রচনা প্রকাশ করেন। 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থে বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে?' শুরু করে মোট ১৬টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়। বাকিগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় (এখানে উৎস নির্দেশিত হয়েছে)। এইসব রচনায় বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশের—বিশেষত ধর্মদর্শনের পাশাপাশি সুবিধাবাদী ধর্মাচরকদের দলাদলির ইতিবৃত্তটি ধরা পড়ে গেছে। হীনযান মহাযান সহজযান বজ্রযান তো আছেই—সামান্য দশটি ভোগ্যবস্তুর ভোগের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে একটি ধর্ম যে কিভাবে ভিন্ন আচরণধর্ম গঠন করতে পারে—তার কৌতূহলোদ্দীপক এবং কৌতুককর বিবরণ বাঙালি পাঠক ইতিপূর্বে পাননি। শাস্ত্রীমহাশয় বিষয়গুলিতে গভীরভাবে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন বলেই খুব সহজভাষায় গূঢ় তত্ত্ব বিবৃত করেছেন এবং কোথাও কোথাও সঙ্গতকারণেই তির্যক ভাষা ও মতামত প্রকাশ করেছেন। যা ঘটেছে-তাই বলতে পেরেছেন বলে কারও গায়ে বিস্ফোটকের জ্বালা ধরবার কারণ নেই।

কিন্তু এই সব তত্ত্ব বিচার করতে গিয়ে তিনি রক্ষণশীল হিন্দুদেরও প্রয়োজন ক্ষেত্রে এক হাত নিতে ছাড়েন নি। আসলে তাঁর বৌদ্ধচর্চার একটা মহৎ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল হিন্দু-বৌদ্ধ সমন্বয়বাদী একটা সার্বভৌম বাহনরূপে বৌদ্ধধর্মের সারসত্যকে উদ্‌ঘাটন করা। এই লক্ষ্য বা অভীষ্ট তাঁর পূরণ হয়েছিল কিনা জানি না, তবে তাঁর সৎ চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম চর্চার একটা স্রোত বয়ে এসেছিল। যার ফলে রামদাস সেন, অঘোরনাথ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শরৎকুমার রায় প্রমুখ বিদ্বান ব্যক্তিরা বাংলা ভাষায় বুদ্ধ-বিষয়ক কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। হরপ্রসাদের মীমাংসামুখী প্রবণতা, ধর্মের তুলনামূলক অবস্থান বিচার এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করতে করতে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি যে ধর্মঠাকুরের পূজাতেই—এমনতর সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তাঁকে সাহায্য করেছে। আমাদের মনে হয়েছে বুদ্ধের মতো ধ্যানী হরপ্রসাদের সাধনার ফলেই বৌদ্ধভারত

তথা বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সূর্যালোকে প্রতিভাত হয়েছে।

এর আগে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সীমিত প্রয়াস ছাড়া সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অনিলকুমার কাঞ্জিলালের যুগ্ম সম্পাদনায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাবলীর দুটি খন্ড (১৯৫৬, ১৯৬০) প্রকাশিত হয়। ঘটনাচক্রে এটি অসম্পূর্ণ থাকার পর সত্যজিৎ দাস প্রমুখের সম্পাদনায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ-এর চারটি খন্ড প্রকাশিত হয়। বর্তমান গ্রন্থ সংকলনে এগুলির প্রত্যেকের কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করি। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে এতদতিরিক্ত আরও একটি ইংরেজি প্রবন্ধ ছিল—নগেন্দ্রনাথ বসুর The, Modern Buddhism and its followers in Orissa (১৯১১) নামক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কৃত ভূমিকাটি। সেটিও এই গ্রন্থে সংযুক্ত করে দিলাম।

করুণা প্রকাশনী থেকে মৎ-সম্পাদিত বুদ্ধ-বিষয়ক সাতখানি গ্রন্থ বাংলাভাষী বুদ্ধানুরাগীদের সপ্রেম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভরসা আছে এই সংকলনটিও তাঁদের মনের খোরাক সরবরাহ করবে।

বিনত

বারিদবরণ ঘোষ

॥ সূচিপত্র ॥

।। সম্পাদকীয় ।।

ভারতীয় সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারে যে কয়েকজন বাঙালি আত্মোৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম উপরের দিকে— সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হরপ্রসাদ (১৮৫৩-১৯৩১) স্বগ্রাম নৈহাটিতে বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ থেকে এম. এ. পরীক্ষায় একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে 'শাস্ত্রী' উপাধি পান। নানা স্থানে অধ্যাপনার পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে এই কলেজে এম. এ. ক্লাসের প্রবর্তন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করলে হরপ্রসাদ এই পত্রিকার লেখক হিসেবে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। এছাড়া ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে ওঠে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকেই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে রাজেন্দ্রলালের সহকারী হিসেবে কর্মরত থাকেন। তাঁদের এই ঘনিষ্ঠতার বিবরণ যেমন হরপ্রসাদ নিজে তাঁর 'চল্লিশ বৎসর পূর্বে ঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র' স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন, তেমনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রও তাঁর সুখ্যাত The Sanskrit Buddhism Literature in Nepal (১৮৮২) গ্রন্থের ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে 'a friend of mine' বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুতপক্ষে মিত্র-দীক্ষিত হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের অবর্তমানে সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ ও সম্পাদনার পূর্ণ দায়িত্ব নেবার অধিকারী হয়ে পড়েছিলেন। 'হরপ্রসাদ সংবর্ধনা লেখমালা' দ্বিতীয় ভাগ (১৩৩৯)-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ উভয়ের মধ্যে তুলনাসূত্রে মন্তব্য করেছিলেন ঃ

> আমার মনে এই দুইজনের চরিত-চিত্র মিলিত হয়ে আছে।
> উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর।
> উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা, —যে কোনো
> বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল গ্রন্থিগুলি
> অনায়াসেই মোচন করে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার
> সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর
> হয়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধন-প্রণালী
> সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে?

বৌদ্ধধর্ম যত লোকে মানে, এত লোকে আর-কোনো ধর্ম মানে না। চীনের প্রায় সমস্ত লোকই বৌদ্ধ। জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং সাইবিরিয়ার অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ। তিব্বতের সব লোক বৌদ্ধ। ভুটান, সিকিম, রামপুরবুসায়রের সব লোক বৌদ্ধ। নেপালের অর্ধেকেরও বেশি বৌদ্ধ। বর্মা, সায়াম ও আনাম অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বৌদ্ধ। সিংহলদ্বীপের অধিকাংশ বৌদ্ধ।

বৌদ্ধধর্ম না মানিলেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুই বৌদ্ধদিগের অনেক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে এখনো অনেক জায়গায় বৌদ্ধ মত একটু বিকৃতভাবে চলিতেছে। চাটগাঁ, রাঙামাটির তো কথাই নাই। উহারা বর্মা আরাকানের শিষ্য। উড়িষ্যার গড়জাত মহলের মধ্যে অনেকগুলি রাজ্যে এখনো বৌদ্ধ মত চলে। তাহার মধ্যে বোধ নামক রাজ্য যে বৌদ্ধমতাবলম্বী তাহা নামেই প্রকাশ পাইতেছে। বৌদ্ধেরা এই-সকল মহলে অনেকদিন প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা মহিমপন্থ নামে এক নূতন বৌদ্ধ মত চালাইয়াছেন। বাংলায় যাহারা ধর্মঠাকুরের পূজা করে তাহারা যে বৌদ্ধ একথা এখন কেহ অস্বীকার করেন না। বিঠোবা ও বিল নারায়ণের প্রতিমূর্তি বলিয়া পূজা হয়, কিন্তু এই দুই দেবতার ভক্তেরা আপনাদিগকে বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বাঙালিদের মধ্যে যে তন্ত্রশাস্ত্র চলিতেছে তাহাতে বৌদ্ধধর্মের গন্ধ ভরভর করে। যাঁহারা বলেন ৫ম মহাশূন্যে তারা ও ৬ষ্ঠ মহাশূন্যে কালিকা, তাঁহারা বৌদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহেন, কারণ কোনো হিন্দু কখনো শূন্যবাদী হন নাই, হইবেন না ও ছিলেন না।

এককালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আরো বিস্তার হইয়াছিল। তুর্কিস্তান এককালে বৌদ্ধধর্মের আকর ছিল। সেখান হইতে সাময়েদরা এবং তুর্কিস্তানের পশ্চিমের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম পাইয়াছিল। পারস্য এককালে বৌদ্ধধর্মপ্রধান ছিল। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান পুরাই বৌদ্ধ ছিল। পারস্যের পশ্চিমে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। কারণ রোমান কাথলিকদিগের অনেক আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, পূজা-পদ্ধতি, বৌদ্ধদেরই মতো। রোমান কাথলিকদের মধ্যে দুইজন 'সেন্ট' বা মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাদের নাম 'বারলাম' ও 'জোসেফট'। অনেক পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে এই দুইটি শব্দ বৌদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব শব্দের রূপান্তর মাত্র।

অনেকে এই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস লিখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই ইহার সম্পূর্ণ ইতিহাস দিতে সক্ষম হন নাই। কারণ বৌদ্ধেরা বড়ো আপনাদের ইতিহাস লিখেন নাই। মুসলমানেরা সাত শত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতের বৌদ্ধধর্মের নামও শুনেন নাই। তবকতিনাশিরি ওদন্তপুরী বিহার ধ্বংস হইবার ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি বলেন, মহম্মদি বক্তিয়ার ঐ বিহারটাকে কেল্লা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং যখন উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত "দুর্গরক্ষী সৈন্য" বধ করিয়া ফেলিলেন, তখন দেখিলেন, সৈন্যদিগের চেহারা আর-এক রকম ; তাহাদের সব মাথা মুড়ানো ও পরনে গেরুয়া কাপড়। তখন তিনি মনে করিলেন, ইহারা "সব মাথা মুড়ানো ব্রাহ্মণ"। আবুল ফাজল এত বড়ো 'আইনি আকবরি' লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও বৌদ্ধধর্মের নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধদের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা হিন্দুরা করে নাই, মুসলমানেরাও করে নাই, বৌদ্ধেরাও বড়ো করে নাই ; করিয়াছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, আর সেই ইউরোপীয়দিগের শিষ্য শিক্ষিত ভারতসন্তান। কিন্তু ইহাদের চেষ্টা কিরূপ হইতেছে? শুনা যায় এককালে কোনো অন্ধনিবাসের লোকে হাতি দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সকলেই অন্ধ, সুতরাং তাহাদের জীবন্ত হাতি দেখানো কঠিন। সেইজন্য অধ্যক্ষ অন্ধগুলিকে একটি মরা হাতির কাছে লইয়া গেলেন। কানারা হাত বুলাইয়া হাতি দেখিতে লাগিল। কেহ শুঁড়ে হাত বুলাইল, কেন কানে হাত বুলাইল, কেহ দাঁতে হাত বুলাইল, কেহ মাথায় হাত বুলাইল, কেহ পিঠে হাত বুলাইল, কেহ পায়ে হাত বুলাইল, কেহ লেজে হাত বুলাইল, সকলেরই হাতি দেখা শেষ হইল। শেষে সকলে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। সেখানে সকলে ঝগড়া করিতে লাগিল। কেহ বলিল হাতি কুলার মতো, কেহ বলিল হাতি নলের মতো, কেহ বলিল হাতি উল্টা ধামি, কেহ বলিল হাতি বড়ো উঁচু, কেহ বলিল হাতি থামের মতো, কেহ বলিল হাতি চামরের মতো। সকলেই বলিতে লাগিল 'আমার মতই ঠিক'। সুতরাং ঝগড়া চলিতেই লাগিল, কোনোরূপ মীমাংসা হইল না। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপই ঘটিয়াছে। ইউরোপীয়রা সিংহলদ্বীপেই প্রথম বৌদ্ধধর্ম দেখেন ও সেইখানেই পালি শিখিয়া বৌদ্ধদের বই পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা বলেন বৌদ্ধধর্ম কেবল ধর্মনীতির সমষ্টিমাত্র, উহাতে কেবল বলে 'হিংসা করিও না,' 'মিথ্যা কথা কহিও না', 'চুরি করিও না', 'পরস্ত্রীগমন করিও না,' 'মদ খাইও না'। হজ্‌সন্ [Brian Houghton Hodgson] সাহেব নেপালে বৌদ্ধধর্ম পাইলেন। তিনি দেখিলেন, বৌদ্ধদের অনেক দর্শন গ্রন্থ আছে এবং তাহাদের দর্শন অতি গভীর। কেহ বা শুদ্ধ বিজ্ঞানবাদীমাত্র, কেহ বা তাহাও বলেন না। যে-সকল দর্শনের মত আঠারো ও উনিশ শতে ইউরোপে প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল, তিনি সেই-সকল মত নেপালের পুথির মধ্যে পাইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, এ-সকল মত বৌদ্ধদের মধ্যে দুই-তিন শতে

চলিতেছিল। বিশপ বিগাণ্ডেট ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম দেখিতে পান। তিনি দেখেন, উহার আকার অন্যরূপ। উহাতে পূজাপাঠ ইত্যাদির বেশ ব্যবস্থা আছে। তিনি দেখেন, বৌদ্ধমঠ মাত্রেই এক-একটি পাঠশালা। ছোটো ছোটো ছেলেরা পড়ে। যিনি তিব্বত দেশের বৌদ্ধধর্ম দেখিলেন, তিনি দেখিলেন, সেখানে কালীপূজা হয়, সেখানে মন্ত্রতন্ত্র আছে, হোমজপ হয়, মানুষপূজা হয়। চীন দেশের বৌদ্ধধর্ম আবার আর-এক রূপ। তাহারা সব মাংস খায়, সব জন্তু মারে ; অথচ বৌদ্ধ। জাপানিরা বলে 'আমরা মহাযান অপেক্ষাও দার্শনিকমতে উপরে উঠিয়াছি।' অথচ আবার তাহাদের মধ্যে একদল বৌদ্ধ আছে, তাহারা নানারূপ দেবদেবীর উপাসনা করে।

এইরূপে বৌদ্ধধর্ম নানা দেশে নানা মূর্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে ; কোথাও বা উহা পূর্বপুরুষের উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ভূত প্রেত উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও বা দেহতত্ত্ব উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও কোথাও খাঁটি বুদ্ধের মত চলিতেছে, কোথাও খাঁটি নাগার্জুনের মত চলিতেছে। সুতরাং সমস্ত বৌদ্ধধর্মের একখানি পুরা ইতিহাস লেখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর আবার ভাষার গোল। বুদ্ধের বচনগুলি তিনি কী ভাষায় বলিয়াছিলেন জানা যায় না। তাঁহার বাড়ি ছিল কোশলের উত্তরাংশে। তিনি ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন কোশলে ও মগধে। এই দুই দেশের লোক বুঝিতে পারে এমন কোনো ভাষাতে তিনি ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। এই দুই দেশেও আবার ভিন্ন অঞ্চলের লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বলেন নাই। যে-সকল অতি প্রাচীন বৌদ্ধ পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা না-সংস্কৃত, না-মাগধী, না-কোশলী ; একরূপ মাঝামাঝি গোছের ভাষা। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বোধ হয় ইহারই নাম দিয়াছেন 'মিশ্র ভাষা'। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহারই নাম দিয়াছেন Mixed Sanskrit। বিমলপ্রভা নামে নয় শতের এক পুথিতে আমরা দেখিলাম যে, তৎকালে নানা ভাষায় বুদ্ধের বচন লেখা হইয়াছিল ; মগধ দেশে মগধ ভাষায়, সিন্ধু দেশে সিন্ধু ভাষায়, বোট দেশে বোট ভাষায়, চীন দেশে চীন ভাষায়, মহাচীনে মহাচীন ভাষায়, পারস্য দেশে পারস্য ভাষায়, রুম্ম দেশে রুম্ম ভাষায়। আমরা জানি পারস্য দেশে মগের ধর্ম চলিতে ছিল, অর্থাৎ সেখানকার লোক অগ্নি-উপাসক ও জরথ্রসার শিষ্য ছিল। সে দেশে যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ছিল, একথাই শুনি নাই। তাহাদের ভাষায় যে আবার বৌদ্ধবচনগুলি লিখিত হইয়াছিল সে খবরও এই নূতন। রুম্ম দেশ কাহাকে বলে, জানি না, রোম হইবারই সম্ভাবনা। কারণ, 'বিমলপ্রভা'য় বলে, উহা নীলা নদীর উত্তর। 'বিমলপ্রভা'য় আরো একটি নূতন খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রাকৃত ও অপ্রভ্রংশ ভাষায়ও বুদ্ধদিগের অনেক সংগীত লেখা হইয়াছিল, এ খবর এ পর্যন্ত অতি অল্প লোকেই জানেন।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে, একথা লইয়া নানা মুনির নানা মত আছে। যাঁহারা সিংহলের বৌদ্ধধর্ম দেখিয়া এবং পালি পুস্তক পড়িয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বিহারে বাস করেন, তাঁহারাই যথার্থ বৌদ্ধ। গৃহস্থ বৌদ্ধদের তাঁহারা বৌদ্ধ বলিতে রাজি নহেন। তাঁহারা বলেন, 'ত্রিপিটকে' যাহা-কিছু ব্যবস্থা আছে, সবই বিহারবাসী ভিক্ষুদের জন্য। 'বিনয়পিটকে' যত বিধিব্যবস্থা আছে, সবই ভিক্ষুসংঘের জন্য। গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকাদের তাহাতে স্থান নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, যাহারা "পঞ্চশীল" গ্রহণ করে অর্থাৎ "প্রাণাতিপাত করিব না", "মিথ্যাকথা কহিব না", "চুরি করিব না", "মদ খাইব না", "ব্যভিচার করিব না"—এই পাঁচটি নিয়ম পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করে, তাহারাও বৌদ্ধ। কিন্তু তাহা হইলে এক জায়গায় ঠেকিয়া যায়। যে-সকল জাতি দিন-রাত প্রাণীহিংসা করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, যথা জেলে, মালা, কৈবর্ত, শিকারি, ব্যাধ, খেট, খটিক্ প্রভৃতি জাতির বৌদ্ধধর্মে প্রবেশের অধিকার একেবারেই থাকে না।

এদিকে আবার যাঁহারা নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধধর্ম দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, পৃথিবীসুদ্ধই বৌদ্ধ ; কারণ, যিনি বোধিসত্ত্ব হইবেন, তাঁহাকে জগৎ উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। লঙ্কাবাসীর মতো আপনাকে উদ্ধার করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। এইজন্য নেপাল ও তিব্বতবাসীরা লঙ্কাবাসীদিগকে হীনযান বৌদ্ধ বলেন এবং আপনাদিগকে মহাযান বৌদ্ধ বলেন। এখানে 'যান' শব্দের অর্থ লইয়া অনেক বিবাদবিসংবাদ আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কেহ কেহ উহার ইংরাজি করেন Vehicle অর্থাৎ গাড়ি ঘোড়া ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিক বৌদ্ধদিগের মধ্যে 'যান' শব্দের অর্থ পন্থ বা মত। আমরা যেমন এখন বলি নানকপন্থী দাদুপন্থী কবীরপন্থী, সেকালে বৌদ্ধেরা সেইরূপ বলিত শ্রাবকযান, প্রত্যেকযান, বোধিসত্ত্বযান, মন্ত্রযান ইত্যাদি। Vehicle-এর সহিত উহার কোনো সম্পর্ক নাই। মহাযান বৌদ্ধেরা আপনাদের বড়ো দেখাইবার জন্য আগেকার বৌদ্ধদিগকে হীনযানী বলিত, আর আপনাদিগকে বোধিসত্ত্বযান বলিত।

মহাযানী বৌদ্ধেরা যদি জগৎই উদ্ধার করিতে বসিলেন, তবে জগৎসুদ্ধই তো বৌদ্ধ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলেন 'আমরা বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গাণপত, পৌত্তলিক, রাজপূজক, ব্রাহ্মণপূজক প্রভৃতি সকলকেই উদ্ধার করিব।' কিন্তু সে উদ্ধারের পথ কী, সেকথা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলেন না ; এইমাত্র বলেন, 'যাহার যাহাতে ভক্তি, আমরা সেইরূপ ধারণা করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিব'। এ বিষয়ে 'কারণ্ডব্যূহে' একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। বুদ্ধদেব, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কী করিয়া জগৎ উদ্ধার করিবে? জগতে তো নানা মুনির নানা মত, লোকে তোমার কথা শুনিবে কেন?" তখন করুণামূর্তি অবলোকিতেশ্বর বলিতেছেন, "আমি

বিষ্ণুবিনেয়দিগকে বিষ্ণুরূপে উদ্ধার করিব, শিববিনেয়দিগকে শিবরূপে উদ্ধার করিব, বিনায়কবিনেয়দিগকে বিনায়করূপে উদ্ধার করিব, রাজবিনেয়দিগকে রাজরূপে উদ্ধার করিব, রাজভটবিনেয়দিগকে রাজভট রূপে উদ্ধার করিব।" এরূপে তিনি যে কত দেবতার বিনেয়দিগকে কতরূপে উদ্ধার করিবেন বলিয়াছেন, তাহা লিখিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যায়; সেইজন্য উপরে তাহার কয়েকটিমাত্র দেওয়া হইল। এ মতে তাহা হইলে সকলেই বৌদ্ধ। এখন যেমন থিওজফিস্ট মহাশয়েরা বলেন, "তোমরা যে ধর্মেই থাকো, যে দেবতার উপাসনাই করো, ধর্মে এবং চরিত্রে বড়ো হইবার চেষ্টা করিলেই, তোমরা থিওজফিস্ট এবং যে কেহ থিওজফিস্ট হতে পারে।" এও কতকটা সেইরূপ, তবে ইঁহাদের অপেক্ষা মহাযানী বৌদ্ধদের জগতের প্রতি করুণা কিছু বেশি ছিল। তাঁহারা নিজেই চেষ্টা করিয়া জগৎ উদ্ধার করিতে যাইতেন। তোমার চেষ্টা থাকুক, আর নাই থাকুক, তাঁহারা বলিতেন, "আমরা নিজগুণে তোমায় উদ্ধার করিব"। সেইজন্য মহাযান ধর্মের সারের সার কথা "করুণা"। উঁহাদের প্রধান গ্রন্থের নাম 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। উহার নানারূপ সংস্করণ আছে ; এক সংস্করণ শত সহস্র শ্লোকে, এক সংস্করণ পাঁচিশ হাজার শ্লোকে, আর-এক সংস্করণ দশ হাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ আট হাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ সাত শত শ্লোকে, আর-এক সংস্করণ, সকলের চেয়ে ছোটো, স্বল্পাক্ষরা—'স্বল্পাক্ষরা প্রজ্ঞাপারমিতা'—উহার তিনটি পাতা মাত্র। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' আরম্ভ করিতে হইলে কতকটা গৌরচন্দ্রিকা চাই—শেষ করিতে গেলেও কতকটা আড়ম্বর চাই। এইসব বাহ্য আড়ম্বর ছাড়িয়া দিলে উহাতে একটিমাত্র কথা সার—"সকল জীবে করুণা করো"।

মহাযানের মর্ম গীতায় একটি শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। সে শ্লোকটি অনেকেরই অভ্যাস আছে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তাস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং।

গীতায় এ কথাটি ভগবানের মুখে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মহাযানে এই ভাবের কথা প্রত্যেক বোধিসত্ত্বের মুখে। বোধিসত্ত্বেরা নির্বাণের অভিলাষী, তাঁহারা মানুষ। ভগবানের মুখে যে-কথা শোভা পায়, মানুষের মুখে সে-কথা আরো অধিক শোভা পায়। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহাদের করুণা কত গভীর।

মহাযান মতে তাহা হইলে জীবমাত্রেই বৌদ্ধ, কিন্তু এ-কথায় তো কাজ চলে না। ভারতবর্ষে তখন নানারূপ ধর্ম ছিল, মত ছিল, দর্শন ছিল, পন্থ ছিল, যান ছিল। মহাযান যেন বলিলেন, সকলেই বৌদ্ধ ; কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীরা সে-কথা মানিবে কেন? সুতরাং বৌদ্ধ কাহাকে বলে, এ বিচারের প্রয়োজন চিরদিন ছিল, এখনো আছে। ইহার মীমাংসা কী? বৌদ্ধেরা জাতি মানে না যে, ব্রাহ্মণাদির মতো

জন্মিবামাত্রই ব্রাহ্মণ হইবে বা ক্ষত্রিয় হইবে বা শূদ্র হইবে, বৈষ্ণব হইবে বা শৈব হইবে। একে তো বৌদ্ধ গৃহস্থেরা বৌদ্ধ কিনা তাহাতেই সন্দেহ, তারপর তাহাদের ছেলে হইলে, সে ছেলে বৌদ্ধ হইবে কিনা তাহাতে আরো সন্দেহ। এখনো এ বিষয়ে কোনো ইউরোপীয় বা এদেশীয় পণ্ডিতেরা কোনো মীমাংসা করেন নাই, কিন্তু শুভাকরগুপ্তের 'আদিকর্ম্ম রচনা' নামক বৌদ্ধদের স্মৃতিতে ইহার এক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেওয়া আছে। তিনি বলেন, যে কেহ ত্রিশরণ গমন করিয়াছে সেই বৌদ্ধ।

ত্রিশরণ শব্দের অর্থ—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"
"দ্বিতীয়মপি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"দ্বিতীয়মপি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
দ্বিতীয়মপি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"

বোধ হয় অতি প্রাচীন কালে ত্রিশরণ গমনের জন্য কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না, লোকে আপনারাই ত্রিশরণ গ্রহণ করিত। কিন্তু পরে পুরোহিতের নিকট ত্রিশরণ লইবার ব্যবস্থা হয়। 'হস্তসার' গ্রন্থে ভিক্ষুর নিকট ত্রিশরণ লইবার ব্যবস্থা আছে। যেমন খৃস্টানের পুত্র হইলেই সে খৃস্টান হয় না, তাহাকে বাপ্টাইজ করিলে তবে সে খৃস্টান হয়, সেইরূপ বৌদ্ধ পিতামাতার পুত্র হইলেও, যতক্ষণ সে ত্রিশরণ গমন না করে, ততক্ষণ তাহাকে বৌদ্ধ বলা যায় না। বৌদ্ধদের যতগুলি ধর্মকর্ম আছে, তাহার মধ্যে যেগুলিকে তাহারা অত্যন্ত সহজ বলিয়া মনে করিত এবং সকলের আগে সম্পন্ন করিত, সেই গুলিকে আদিকর্ম বলিত। সেইসকল আদিকর্মের মধ্যেও আবার ত্রিশরণ গমন সকলের আদি। 'বিমলপ্রভা'য়ও লেখা আছে, আগে ত্রিশরণ গমন, পরে এই জন্মেই বুদ্ধ হইবার জন্য কালচক্র মতে লৌকিক ও লোকোত্তর সিদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। রত্নত্রয়ের শরণ লইলেই যদি বৌদ্ধ হয় এবং সেরূপ শরণ লইবার জন্য যদি পুরোহিতের প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে জেলে, মালা, কৈবর্তদের বৌদ্ধধর্মে প্রবেশের আর বাধা রহিল না। 'বিনয়পিটকে' লেখা আছে যে, যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, তাহাকে ভিক্ষু করিতে পারিবে না ও তাহাকে সংঘে লইতে পারিবে না ; কিন্তু তাই বলিয়া কি সে বেচারি বৌদ্ধ হইতে পারিবে না ? শুভাকরগুপ্তের ব্যবস্থায় সে অনায়াসে বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম ছিল। যে সন্ন্যাস লইবে তাহাকে একজন সন্ন্যাসীকে মুরুব্বি করিয়া সন্ন্যাসীর আখড়ায় যাইতে হইত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নাম ভিক্ষু। সন্ন্যাসীর দলের নাম সংঘ। যেখানে সন্ন্যাসীরা বাস করিত তাহার নাম সংঘারাম। সংঘারামের মধ্যে প্রায়ই একটি মন্দির থাকিত, তাহার নাম বিহার। সেই মন্দিরের নাম হইতেই বৌদ্ধভিক্ষুদের আখড়াগুলিকে বিহারই বলিয়া থাকে।

শিক্ষানবিশ একজন ভিক্ষুকে মুরুব্বি করিয়া সংঘে উপস্থিত হন। সেখানে গেলে সর্বাপেক্ষা বুড়া ভিক্ষু, যাঁহাকে স্থবির বা থেরা বলে, তিনি নবিশকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসার সময় সঙ্গে আর পাঁচ জন ভিক্ষুও থাকা চাই। স্থবির নবিশের নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। তাহার কোনো উৎকট রোগ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন, সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, সে রাজার কোনো চাকরি করে কিনা তাহাও জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি আরো জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহার ভিক্ষাপাত্র আছে কিনা, তাহার চীবর আছে কিনা, অর্থাৎ, ভিক্ষু হইতে গেলে যে-সকল জিনিস দরকার, তাহা তাহার আছে কিনা। সে এসব জিনিস আছে বলিলে, তিনি সংঘকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আপনারা বলুন, এই লোককে সংঘে লওয়া যাইতে পারে কিনা। যদি আপনাদের ইহাতে কোনো আপত্তি থাকে, স্পষ্ট করিয়া বলুন, যদি না থাকে তবে চুপ করিয়া থাকুন।" তিনি এইরূপ তিন বার বলিলে, যদি কোনো আপত্তি না উঠিত, তবে তিনি নবিশকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমার উপাধ্যায় কে?" সে উপাধ্যায়ের নাম বলিলে, তাঁহার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইত। সে উপাধ্যায়ের নিকট সন্ন্যাসীর কী কী কাজ, সব শিখিত। এখনকার ছেলেরা যেমন মাস্টার মহাশয়দের মান্য করিয়া চলে, শিক্ষানবিশ শ্রমণেরা সেইরূপে আপনার উপাধ্যায়কে মান্য করিয়া চলিত। ক্রমে সে সব শিখিয়া লইলে, তাহাতে ও উপাধ্যায়ে কোনো প্রভেদ থাকিত না। সংঘে বসিলে, দু' জনের সমান ভোট হইত।

বুদ্ধদেব যখন নন্দকে "প্রব্রজ্যা" দিয়াছিলেন, তখন তিনি উহাকে বৈদেহ মুনির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বৈদেহ মুনি নন্দকে আপনার বন্ধুর মতো দেখিতেন, বন্ধুর মতো তাহাকে পরামর্শ দিতেন ও শিক্ষা দিতেন। বুদ্ধদেব মধ্যে মধ্যে বৈদেহ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিতেন, " কেমন, নন্দ বেশ শিখিতেছে তো?" বৈদেহ মুনি যেমন জানিতেন, সমস্ত খুলিয়া বলিতেন। যেখানে বৈদেহ মুনি নন্দকে কোনো বিষয় বুঝাইতে অক্ষম হইতেন, বুদ্ধদেব নিজে গিয়া তাঁহাকে উহা বুঝাইয়া দিতেন। মহাকবি অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দ' কাব্যে বৈদেহ মুনি ও নন্দের অনেক কথা লেখা আছে। তাহাতে বেশ দেখা যায়, বৈদেহ মুনি নন্দের উপাধ্যায় হইলেও দু' জনে পরস্পর বন্ধুভাবেই বাস করিতেন, তাঁহারা পরস্পর আপনাদিগকে সমান বলিয়া মনে করিতেন।

মহাযান বৌদ্ধেরা উপাধ্যায়কে "কল্যাণমিত্র" বলিত। কল্যাণমিত্র শব্দ হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, সে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক নয়, পরলোকের কল্যাণ-কামনায় গুরুশিষ্যের মিত্র মাত্র। মহাযান-মতাবলম্বীরা দর্শনশাস্ত্রের খুব চর্চা করিতেন। এখানে গুরুশিষ্যে অত্যন্ত প্রভেদ হইবারই কথা, কিন্তু তাহা হইত না। সংঘে অধিকার দু' জনেরই সমান থাকিত এবং উভয়ে পরস্পরের মিত্র হইতেন।

ক্রমে যখন এত দর্শনশাস্ত্র পড়া, এত যোগ ধ্যান করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইতে লাগিল, যখন ভিক্ষুরা বিবাহ করিতে লাগিলেন, প্রকাণ্ড একদল গৃহস্থ-ভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইল, তখন মন্ত্রযানের উৎপত্তি হইল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "মন্ত্র জপ করিলেই, পাঠ, স্বাধ্যায়, তপ প্রভৃতি সকল ধর্মকর্মেরই ফল পাওয়া যাইবে। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' পড়িতে অনেক বৎসর লাগে, বুঝিতে আরো বেশি দিন লাগে এবং 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র ক্রিয়াকর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে আরো বেশি দিন লাগে। এত তো তুমি পারিবে না বাপু, তুমি এই মন্ত্রটি জপ করো, তাহা হইলে সব ফল পাইবে।" যখন বৌদ্ধধর্মের এই মত দাঁড়াইল, তখন গুরুশিষ্যের সম্পর্কটা খুব আঁটাআঁটি হইয়া গেল। তখন তিনটি কথা উঠিল—'গুরুপ্রসাদ', 'শিষ্যপ্রসাদ', 'মন্ত্রপ্রসাদ', অর্থাৎ গুরুকে ভক্তি করিতে হইবে, শিষ্যকে স্নেহ করিতে হইবে, এবং মন্ত্রের প্রতি আস্থা থাকিবে। যে সময় বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মন্ত্রযান প্রবেশ করে, সে সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে গুরুশিষ্যের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল জানা যায় না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আচার্য ও শিষ্যের সম্পর্ক পিতাপুত্রের সম্পর্কের মতো। বাস্তবিকও যিনি শিক্ষা দিবেন, তিনি পিতার কার্যই করিবেন। সন্তানের শিক্ষার ভার তো পিতারই, তবে তিনি যদি না পারেন, তবে একজন প্রতিনিধির হস্তে সন্তানকে সমর্পণ করিয়া দিবেন। শিক্ষক বা আচার্য পিতার প্রতিনিধিমাত্র। আচার্যের মৃত্যুতে শিষ্যের ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হইত। এখনো যিনি গায়ত্রী উপদেশ দেন, সেই আচার্য-গুরু মরিলে, ব্রাহ্মণকে ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু শিষ্য গুরুর দাস, তাঁহার যথাসর্বস্ব গুরুর, এই যে একটা উৎকট মত ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে আর সেরূপ সমান ভাবটি রহিল না, একজন বড়ো একজন ছোটো হইয়া গেল।

বজ্রযানে গুরু আরো বড়ো হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বয়ং বজ্রধারী। এই যানের প্রধান কথা এই যে, দেবতাদিগের এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের বজ্রধর নামে একজন পুরোহিত হইলেন। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের উপর বজ্রসত্ত্ব নামে আর-একজন বুদ্ধ হইলেন। তাঁহাকে উহারা বুদ্ধগণের পুরোহিত বলিয়া মানিয়া থাকে। বজ্রসত্ত্ব কতকটা আদিবুদ্ধ বা ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। এই মতের গুরুদিগকে বজ্রাচার্য বলিত। বজ্রাচার্যের পাঁচটি অভিষেক হইত, মুকুটাভিষেক, ঘণ্টাভিষেক, মন্ত্রাভিষেক, সুরাভিষেক

ও পট্টাভিষেক। তাঁহার দেশীয় নাম গুভাজু, অর্থাৎ, তিনি গুরু, তাঁহাকে সকলে ভজনা করিবে। সুতরাং শিষ্য হইতে তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। মন্ত্রযানে গুরুকে শিষ্যের "প্রসাদ" খুঁজিতে হইত, বজ্রযানে তাহার কোনোই দরকার নাই।

সহজযানের গুরুর উপদেশই সব। গুরুর উপদেশ লইয়া মহাপাপ কার্য করিলেও তাহাতে মহাপুণ্য হইবে। সহজযানের একজন গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, যে পঞ্চকাম উপভোগের দ্বারা মূর্খলোক বদ্ধ হয়, গুরুর উপদেশ লইয়া সেই পঞ্চকাম উপভোগ করিয়াই সে মুক্ত হইয়া যায়।

গুরু উবএসো অমিঅরসু হবহিঁ ণ পীঅউ জেহি।
বহু সত্থত্থ মরুস্থলিহিং তসি এ মরিথউ তেহি।।

[বৌ-গা-দো, পৃ. ১০২]

"গুরুর উপদেশই অমৃতরস। যে-সকল হাবারা উহা পান না করে তাহারা বহু শাস্ত্রার্থরূপ মরুস্থলীতে তৃষ্ণায় মরিয়া যায়।" গুরুর উপদেশ ভিন্ন সহজপন্থীদের কোনো জ্ঞানই হয় না ; আগম, বেদ, পুরাণ, তপ, জপ সমস্তই বৃথা ; গুরুর উপদেশ-মাত্রই সত্য।

আগমবেঅপুরাণে পংড়িত্ত মাণ বহংতি।
পক্ক সিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিত ভুময়ন্তি।।

[বৌ-গা-দো, পৃ. ১২৩]

"যাহারা আগম, বেদ ও পুরাণ পড়িয়া আপনাদের পণ্ডিত মনে করিয়া গর্ব করে তাহারা পক্ক শ্রীফলে অলির ন্যায় বাহিরে বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়ায়।"

এইরূপে যতই বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তন হইতে লাগিল, গুরুর সম্মানও ততই বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

কালচক্রযানে যে গুরুর মান্য কত অধিক তাহা একটি কথাতেই প্রমাণ হইয়া যাইবে। 'লঘুকালচক্রতন্ত্রে'র টীকা 'বিমলপ্রভা' যিনি লিখিয়াছিলেন, সেই পুণ্ডরীক, আপনাকে অবলোকিতেশ্বরের নির্মাণকায় বা অবতার বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তিনি স্বয়ং অবলোকিতেশ্বর, আর-কেহ নহেন। কালচক্রযানের পর লামাযানের উৎপত্তি। সকল লামাই কোনো-না-কোনো বড়ো বোধিসত্ত্বের অবতার। সুতরাং তিনি সাক্ষাৎ বোধিসত্ত্ব, সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। লামাযান ক্রমে উঠিয়া দলাইলামাযানে পরিণত হইয়াছে। দলাইলামা অবলোকিতেশ্বরের অবতার। তিনি মরেন না, তাঁহার কায় মধ্যে মধ্যে নূতন করিয়া নির্মাণ হয়। তিনি এক কায় ত্যাগ করিয়া কায়ান্তর ধারণ করেন।

বৌদ্ধধর্মে প্রথমে যে উপাধ্যায় মিত্রমাত্র ছিলেন, এক্ষণে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার।

বৌদ্ধধর্মের এই দৃষ্টান্ত হিন্দুর সংসারেও প্রবেশ করিয়াছে। তন্ত্রমতে গুরুই

পরমেশ্বর, গুরুর পাদপূজা করিতে হয়, যাহা ব্রাহ্মণের একেবারে নিষেধ, সেই গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে হয়, গুরু শিষ্যের সর্বস্বের অধিকারী, যে শিষ্য ধনজন, আপন স্ত্রীপুত্র ও দেহ পর্যন্ত গুরুসেবায় নিয়োগ করিতে পারে সেই পরম ভক্ত। বৈষ্ণবের মতেও তাই। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অনেকে এখন কর্তাভজা হইতেছেন। তাঁহারা বলেন, "গুরু সত্য, জগন্মিথ্যা, যা করাও তাই করি, যা খাওয়াও তাই খাই, যা বলাও তাই বলি।"

'নারায়ণ', অগ্রহায়ণ, ১৩২১

নির্বাণ

বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ বুঝিতে গেলে অনেকগুলি কথা বুঝিতে হয় ; এবং সেই-সকল কথা বুঝিয়া উঠাও অতি কঠিন। মোটামুটি ধরিতে গেলে নির্বাণ শব্দে নিবিয়া যাওয়া বুঝায়। প্রদীপ যেমন নিবিয়া যায়, তেমনই মানুষ নিবিয়া গেল। প্রদীপ নিবিয়া গেলে কিছু থাকে না ; মানুষ নিবিয়া গেলেও কিছু থাকে না। একথাটা, শুনিতে যত সোজা, ভালো করিয়া বুঝিতে গেলে তত সোজা নয়। প্রদীপ নিবিয়া গেল, আর কিছু নাই, একেবারে শেষ হইয়া গেল ; কিন্তু মানুষ নিবিয়া গেলে কি সেইরূপ একেবারে শেষ হইয়া যায়? একেবারে 'নিহিল' হইয়া যায়? একেবারে 'এনিহিলেশন' হইয়া যায়? একেবারে 'নাস্তি' হইয়া যায়? এইখানেই গোল বাধিল। আমি একেবারে থাকিব না, এবং সেইটিই আমার জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হইবে? আমি তপ জপ, ধ্যান ধারণা করিব, শুদ্ধ আমার অস্তিত্বটি বিলোপ করিবার জন্য? এ তো বড়ো শক্ত কথা।

অনেকে মনে করেন, বুদ্ধ এইরূপ আত্মার বিনাশই নির্বাণ শব্দের অর্থ করিয়াছিলেন। এইজন্য অনেক পাদরি সাহেবেরা বলেন, বৌদ্ধেরা নিহিলবাদী বা বিনাশবাদী। বুদ্ধ নিজে কী বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। তাঁহার নির্বাণের পাঁচ শত বৎসর পরে লোকে তাঁহার বক্তৃতার যেরূপ রিপোর্ট দিয়াছে, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। তাহাও আবার তিনি ঠিক যে ভাষায় বলিয়াছিলেন, সে ভাষার তো কিছুই পাওয়া যায় না। পালি ভাষায় তাহার যে রিপোর্ট তৈয়ারি হইয়াছিল, সেই রিপোর্টমাত্র পাওয়া যায়। তাহাতেও ঐরূপ প্রদীপ নিবিয়া যাওয়ার সহিতই নির্বাণের তুলনা করে। কিন্তু লোকে বুদ্ধদেবকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে নির্বাণের পর কী থাকে। সুতরাং নির্বাণে যে একেবারে সব শেষ হইয়া যায়, তাঁহার শিষ্যেরা সেটা ভাবিতেও যেন ভয় পাইত। বুদ্ধদেব সে কথার কী জবাব দিলেন, আমরা পরে তাহা বিবেচনা করিব।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অন্তত পাঁচ-ছয় শত বৎসরের পর, কনিষ্ক রাজার গুরু অশ্বঘোষ সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম প্রচার করিবার জন্য একখানি কাব্য রচনা করেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, যেমন তিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার জন্য কবিরাজেরা মধু দিয়া মাড়িয়া খাওয়ায়, সেইরূপ আমি এই কঠিন বৌদ্ধধর্মের মতগুলি কাব্যের আকারে লিখিয়া লোকের মধ্যে প্রচার করিতেছি। তিনি নির্বাণ সম্বন্ধে যাহা বলেন, সেটা বুদ্ধের কথার রিপোর্ট নহে, তাঁহার নিজেরই কথা। তিনি বৌদ্ধধর্মের একজন প্রধান প্রচারক, প্রধান গুরু এবং প্রধান কর্তা ছিলেন। তাঁহার কথা আমাদের মন দিয়া শুনা উচিত। তিনি বলিয়াছেন—

দীপো যথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্।।
এবং কৃতী নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিদ্বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্।।

"প্রদীপ যেমন নির্বাণ হওয়ার পর পৃথিবীতেও যায় না, আকাশেও যায় না, কোনো দিক্‌বিদিকেও যায় না ; তৈলেরও শেষ, প্রদীপটিরও শেষ ; সাধকও তেমনই ভাবে, নির্বাণ হওয়ার পর, পৃথিবীতেও যান না, আকাশেও যান না, কোনো দিক্‌বিদিকেও যান না। তাঁহার সকল ক্লেশ ফুরাইয়া গেল। তাঁহারো সব ফুরাইয়া গেল, সব শান্ত হইল।"

এখানে কথা হইতেছে "উপৈতি শান্তিম্"—"সব শেষ হইয়া গেল"—ইহার অর্থ কি নিহিল? ইহার অর্থ কি আত্মার বিনাশ? অস্তিত্বের লোপ? অশ্বঘোষও নির্বাণের পর আর-কিছু থাকিল কিনা, কিছুই বলিলেন না। এই দুইটি কবিতার পরই তিনি অন্য কথা পাড়িলেন। কিন্তু এই কবিতা দুইটির পূর্বে যে তিনটি কবিতা আছে, তাহা পড়িলে, নির্বাণ যে অস্তিত্বের লোপ, এরূপ বোধ হয় না। সে তিনটি কবিতা এই—

তজ্জন্মনো নৈকবিধস্য সৌম্য
তৃষ্ণাদয়ো হেতব ইত্যবেত্য।
তাংশ্ছিন্ধি দুঃখাদ্‌যদি নির্ম্মুমুক্ষা
কার্য্যক্ষয়ঃ কারণসংক্ষয়াদ্ধি।
দুঃখক্ষয়ো হেতু-পরিক্ষয়াচ্চ
শান্তং শিবং সাক্ষিকুরুষ্ব ধর্ম্মম্।

তৃষ্ণাবিরাগং লয়নং নিরোধং
সনাতনং ত্রাণমহার্য্যমার্য্যম্।।
যস্মিন্নজাতির্নজরা ন মৃত্যুঃ
ন ব্যাধয়ো নাপ্রিয়সম্প্রযোগঃ।
নেচ্ছাবিপন্ন প্রিয়বিপ্রযোগঃ
ক্ষমং পদং নৈষ্ঠিকমচ্যুতং তৎ।।

"অতএব তৃষ্ণা প্রভৃতিই নানাবিধ জন্মের হেতু এইটি মনে মনে বুঝিয়া, তোমার যদি মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে সেই তৃষ্ণাকে চ্ছেদ করো। যেহেতু, কারণের ক্ষয় হইলে, কার্যেরিও ক্ষয় হইবে

"এখানে তৃষ্ণাদি হেতুর ক্ষয় হইলে, তোমার দুঃখেরও ক্ষয় হইবে। অতএব তুমি 'ধর্ম'কে প্রত্যক্ষ করো। এ 'ধর্ম' শান্তিময়, মঙ্গলময়, ইহাতে তৃষার উপর বিরাগ হয়, ইহা তাঁহার মত, ইহাতে সর্বধর্মের নিরোধ হয়, ইহাই সনাতন ধর্ম, ইহাতেই পরিত্রাণ, ইহা কেহ হরণ করিতে পারে না, ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

"ইহাই চরম ও অচ্যুত পদ। ইহাতে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই,ব্যাধি নাই, শত্রুসমাগম নাই, নৈরাশ্য নাই, প্রিয়-বিরহ নাই, ইহাই পাইবার মতন জিনিস।"

যখন অশ্বঘোষ এই তিনটি কবিতার পর নির্বাণের ঐ দুইটি কবিতা লিখিয়াছেন, তখন তিনি নির্বাণ শব্দে অস্তিত্বের লোপ বুঝেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন যে, নির্বাণের পর আর কোনোরূপ পরিবর্তন হইবে না, অথচ অস্তিত্বেরও লোপ হইবে না।

পালি ভাষার পুস্তকে বুদ্ধদেবকে নির্বাণের পর কী থাকিবে এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কী উত্তর দিয়াছেন দেখা যাক। "নির্বাণের পর কিছু থাকিবে কি?" বুদ্ধদেব বলিলেন, "না"। "থাকিবে না কি?" উত্তর হইল, "না"। "থাকা-না-থাকার মাঝামাঝি কোনো অবস্থা হইবে কি?" বুদ্ধদেব বলিলেন, "না"। "কিছু থাকা-না-থাকা এদুয়েরই বাহিরে কোনো বিশেষ অবস্থা হইবে কি?" আবার উত্তর হইল, "না"।

তবে দাঁড়াইল কী? এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইল, যে অবস্থায় "অস্তি"ও বলিতে পারি না, "নাস্তি"ও বলিতে পারি না। এ দুয়ে জড়াইয়া কোনো অবস্থা নয়, এ দুয়ের অতিরিক্ত কোনো অবস্থাও নয়। ইহাতে পাওয়া গেল কোনো অনির্বচনীয় অবস্থা, যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না, মানুষের জ্ঞানের বাহিরে।

এই অবস্থাকেই মহাযানে "শূন্য" বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। "শূন্য" বলিতে কিছুই নয় বুঝায়, অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই এই কথাই বুঝায়। কিন্তু বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা বলেন, "আমরা করি কী? আমরা যে ভাষায় শব্দ পাই না। নির্বাণের পর যে অবস্থা হয়, তাহা যে বাক্যের অতীত। ঠিক কথাটি পাই না বলিয়াই আমরা উহাকে "শূন্য" বলি। কিন্তু শূন্য শব্দে আমরা ফাঁকা বুঝাই না, আমরা এমন অবস্থা বুঝাইতে চাই যাহা

অস্তিনাস্তি প্রভৃতি চারি প্রকার অবস্থার অতীত। "অস্তিনাস্তিতদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং শূন্যম্"।

শংকরাচার্য তাঁহার তর্কপাদে শূন্যবাদীদের নানারকমে ঠাট্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যাহাদের মতে সবই শূন্য, তাহাদের সঙ্গে আর বিচার কী করিব?" তিনি বৌদ্ধদের "বিনাশবাদী" বলেন। তাঁহার মতে নৈয়ায়িকেরা "অর্দ্ধবিনশন" অর্থাৎ আধখানা বিনাশবাদী। কেন-না, নৈয়ায়িকেরাও বলেন, "অত্যন্ত সুখদুঃখ-নিবৃত্তির"র নামই "অপবর্গ"। সুখদুঃখ যদি একেবারেই না রহিল, তবে আত্মা তো পাথর হইয়া গেল। তাই শংকরের পর মহাকবি শ্রীহর্ষ গৌতম ঋষিকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন—

মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিত্থ তথৈব সঃ।

অর্থাৎ যে গোতম জীবন্ত প্রাণীকে পাথর করিয়া দিবার জন্য শাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার নামটি সার্থক হইয়াছে, তিনি গোতমই বটেন—তাঁহার মতো গুরু আর দ্বিতীয় নাই।

সাধারণ লোকে বলিবে পাথর হওয়াও বরং ভালো। কেন-না, কিছু আছে দেখিতে পাইব। শূন্য হইলে তো কিছুই থাকিবে না।

যাহা হোক অশ্বঘোষ যে নির্বাণের অর্থ করিয়াছেন, বুদ্ধদেব পালি ভাষার পুস্তকে উহার ˜ অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে নির্বাণ একটি অনির্বচনীয় অবস্থা। শুধু বাক্যের অতীত নয়, মানুষের ধারণারও অতীত। এইরূপ অবস্থাকেই কি কাণ্ট [Immanuel Kant] ট্রান্সেণ্ডেণ্টাল বলিয়া গিয়াছেন? কেন-না, ইহা মানুষের বুদ্ধি ছাড়াইয়া যায়, মানুষে ইহা ধারণা করিতে পারে না।

এরূপ অনির্বচনীয় না বলিয়া, অশ্বঘোষের মতে যে চরম ও অচ্যুতপদ আছে, তাহাকে অস্তি বলিয়া স্বীকার করো না কেন? কিন্তু অস্তি বলিলে, একটা বিষম দোষ হয়। যতক্ষণ আত্মা থাকিবে, ততক্ষণ "অহং" এই বুদ্ধিটি থাকিবে। অহংজ্ঞান থাকিলেই অহংকার হইল। অহংকার থাকিলেই সকল অনর্থের যা মূল, তাই রহিয়া গেল। সুতরাং সে যে আবার জন্মিবে, তাহার সম্ভাবনা রহিয়া গেল। আরো কথা, আত্মা যখন রহিলই, তখন তাহার তো গুণগুলাও রহিল। অগ্নি কিছু রূপ ও উষ্ণতা ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। আত্মা থাকিলে তাহার একত্ব সংখ্যা থাকিবে। একত্ব-সংখ্যাও তো একটি গুণ। সে আত্মার জ্ঞান থাকিবে? না, থাকিবে না? যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে জ্ঞেয় পদার্থও থাকিবে, জ্ঞেয় পদার্থ থাকিলেও আত্মার মুক্তি হইল না। আর, আত্মার যদি জ্ঞান না থাকে, তবে সে আত্মা আত্মাই নয়। সেইজন্যই অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে' বুদ্ধদেব বলিতেছেন, "আত্মার যতক্ষণ অস্তিত্ব স্বীকার করিবে, ততক্ষণ উহার কিছুতেই মুক্তি হইবে না।" তাঁহার প্রথম গুরু অরাড় কালামের

সহিত বিচার করিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে ইহারা বলে আত্মা দেহনির্মুক্ত অর্থাৎ লিঙ্গ-দেহ-নির্মুক্ত হইলেই মুক্ত হয়, তখন সে মুক্তি তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া আত্মাকে "চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত" করিয়া, তবে তৃপ্ত হইলেন।

তাঁহার শিষ্যেরা, আত্মাকে শূন্যরূপ, অনির্বচনীয়রূপ, চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তরূপ, মনে করিলেও ক্রমে তাঁহাদের শিষ্যেরা আবার নির্বাণকে অভাব বলিয়া মনে করিত। তাহাদের মতে সংসার হইল ভাব পদার্থ এবং নির্বাণ অভাব। ভাবাভাব বলিতে তাহারা ভব ও নির্বাণ বুঝিত। তাহারো পরে আবার যখন তাহারা দেখিল যে, প্রকৃত পক্ষে ভব বা সংসার সেও বাস্তবিক নাই, আমরা ব্যবহারত তাহাদিগকে "অস্তি" বলিয়া মনে করিলেও বাস্তবিক সেটি অভাব পদার্থ, তখন তাহাদের ধর্ম অতি সহজ হইয়া আসিল। তখন তাহারা বলিল—

অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা।। [সরহপাদ]

অর্থাৎ ভবও শূন্যরূপ, নির্বাণও শূন্যরূপ। ভব ও নির্বাণে কিছুই ভেদ নাই। মানুষে আপন মনে ভব রচনা করে, নির্বাণও রচনা করে। এইরূপে তাহারা আপনাদের বদ্ধ করে। কিন্তু পরমার্থত দেখিতে গেলে কিছুই কিছু নয়। সবই শূন্যময়।

তাহা হইলে তো বেশ হইল। ভবও শূন্য, ভাবও শূন্য, আত্মাও শূন্য, সুতরাং আত্মা সর্বদাই মুক্ত, স্বভাবতই মুক্ত, "শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ"। তবে আর ধর্মেই কাজ কী? সমাধিতেই বা কাজ কী? ধর্ম অধর্মেই বা কাজ কী? যার যা খুশি করো। তোমরা স্বভাবতই মুক্ত, কিছুতেই তোমাদিগকে বদ্ধ করিতে পারিবে না। পরম যোগীও যেমন মুক্ত, অতি পাপিষ্ঠও তেমনই মুক্ত।

এই জায়গায় সহজিয়া বৌদ্ধ বলিল যে, মূঢ় লোক ও পণ্ডিত লোকের মধ্যে একটি ভেদ আছে। সকলেই স্বভাবত মুক্ত বটে, কিন্তু মূঢ় লোকে পঞ্চকামোপভোগাদি দ্বারা আপনাদের বদ্ধ করিয়া ফেলে, পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া, তাহার পর পঞ্চকামোপভোগ করিলে, কিছুতেই বদ্ধ হয় না।

"যেনৈব বধ্যতে বালো বুধস্তেনৈব মুচ্যতে।" যে পঞ্চকামোপভোগাদি দ্বারা বালজাতীয় অর্থাৎ মূর্খ লোকে বদ্ধ হয়, পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া তাহাতেই মুক্ত হয়।

আর-এক উপায়ে নির্বাণ ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষের চিত্ত যখন বোধিলাভের জন্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন তাহাকে বোধিচিত্ত বলে। বোধিচিত্ত ক্রমে সৎপথে বা ধর্মপথে বা সদ্ধর্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে যেমন তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে লাগিল, তেমনই সে উচ্চ হইতে অধিক উচ্চলোকে উঠিতে লাগিল। যদি তাহার উদ্যম অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তবে সে

এই জন্মেই অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে। কাহারো কাহারো মতে সে এই জন্মেই বোধি লাভ করিতে পারে। বৌদ্ধদের বিহারে যে-সকল স্তূপ দেখা যায়, সেই স্তূপগুলিতে এই উন্নতির পথ মানুষের চোখের উপর ধরিয়া দিয়াছে। স্তূপগুলি প্রথমে একটি গোল নলের উপর খানিক দূর উঠিয়াছে। তাহার উপর একটি গোলের অর্ধেক। তাহার উপর একটি নিরেট চার কোণা জিনিস। তাহার উপর একটি ছাতা। তাহার উপর আর-একটি ছাতা, এটি প্রথম ছাতা হইতে একটু বড়ো। তাহার উপর আর-একটি ছাতা, দ্বিতীয় ছাতার চেয়ে আর একটু বড়ো। চতুর্থটি তৃতীয় ছাতার অপেক্ষা একটু ছোটো, পঞ্চমটি আরো ছোটো। এইখানে এক সেট ছাতা শেষ হইয়া গেল। তাহারো উপর ছাতার খানিকটা বাঁট মাত্র। এই বাঁটের পর আবার আর-এক সেট ছাতা, কোনো মতে ১৩টি, কোনো মতে ১৬টি, কোনো মতে ২১টি, কোনো মত ২৩টিও দেখা যায়। ছাতাগুলি ক্রমে ছোটো হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার খানিকটা ছাতার বাঁট। ইহার উপর আবার মোচার আগার মতো আর-একটা জিনিস। মোচার আগাটি বেড়িয়া উপরি উপরি চার পাঁচটি বৃত্ত আছে। মোচার আগাটি একেবারে ছুঁচের মতো।

বোধিচিত্ত প্রণিধিবলে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তিনি এই স্তূপে উঠিতে লাগিলেন। স্তূপের নিচের দিকটা ভূত-প্রেত-পিশাচ-লোক ও নরক। তাহার উপর যে গোলের আধখানা আছে, সেটি মনুষ্যলোক। বোধিচিত্ত মানুষেরই হয়। সুতরাং সে চিত্ত এইখান হইতেই উঠিতে থাকে। প্রথমে দান, শীল, সমাধি ইত্যাদি দ্বারা সে ঐ নিরেট চারি কোণায় উঠিল। এটি চারি জন মহারাজার স্থান, তাঁহারা চারি দিকের অধিপতি। তাঁহাদের নাম ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়ক, বৈশ্রবণ, বিরূপাক্ষ। তাহার উপর ত্রয়স্ত্রিংশ ভুবন। এখানকার রাজা ইন্দ্র এবং ৩৩ জন দেবতা এখানে বসবাস করেন। ইহার উপর তুষিত ভুবন। বোধিসত্ত্বেরা এইখান হইতে একবারমাত্র পৃথিবীতে গমন করেন এবং সেখানে গিয়া সম্যক্ সংবোধি লাভ করিয়া বুদ্ধ হন। ইহার পর যামলোক। ইহার পর নির্মাণরতিলোক, অর্থাৎ, ইঁহারা ইচ্ছামতো নানারূপে নানা ভোগ্যবস্তু নির্মাণ করিয়া উপভোগ করিতে পারেন। ইহাদের পরে যে লোক, তাহার নাম পরনির্মিতবশবর্তী, অর্থাৎ তাঁহারা নিজে কিছুই নির্মাণ করেন না, পরে নির্মাণ করিয়া দিলে, তাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন। এই পর্যন্ত আসিয়া কামধাতু শেষ হইয়া গেল, অর্থাৎ, এইখানে আসিয়া বোধিচিত্তের আর-কোনো ভোগের আকাঙ্ক্ষা রহিল না।

এইখান হইতে রূপলোকের আরম্ভ। কাম নাই, রূপ আছে, আর আছে উৎসাহ। সে উৎসাহে ধ্যান, প্রণিধি ও সমাধিবলে বোধিচিত্ত ক্রমশই উঠিতে লাগিলেন। রূপধাতুতে, প্রধানত চারিটি লোক ; অবশিষ্ট লোকগুলি এই চারিটিরই অধীন। এই চারিটি লোক লাভ করিতে হইলে, বৌদ্ধদের চারিটি ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়। প্রথম ধ্যানে বিতর্ক ও বিবেক থাকে। দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্কের লোপ হইয়া যায়, প্রীতি ও

সুখে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তৃতীয় ধ্যানে প্রীতি লোপ হইয়া যায়, কেবল- মাত্র সুখ থাকে। চতুর্থ ধ্যানে সুখও লোপ হইয়া যায়, তখন বোধিচিত্ত রূপ অর্থাৎ শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে চান।

রূপ ও শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বোধিচিত্ত আরো অগ্রসর হইতে থাকেন। এবার তিনি রূপলোক ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। রূপলোক ছাড়াইয়া অরূপলোকে উঠিয়াছেন। তখন তিনি আপনাকে, সমস্ত বস্তু, এমন-কি নিরেট জিনিসটি পর্যন্ত আকাশ মাত্র দেখেন, অর্থাৎ সকলই তাঁহার নিকট অনন্ত ও উন্মুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর আত্মচিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ ধারণা হয় যে কিছুই কিছু নয়। এই যে অনন্ত দেখিতেছি, ইহা কিছুই নয় ইহারো উপর বোধিসত্ত্ব অগ্রসর হইলে তখন তাঁহার চিন্তা হইল এই যে কিছুই নয়, ইহার কোনো সংজ্ঞা আছে কিনা। যদি সংজ্ঞা থাকে তবে সংজ্ঞীও আছে। কিন্তু সংজ্ঞী তো নাই, সে তো অকিঞ্চন। সুতরাং সংজ্ঞাও নাই, সংজ্ঞীও নাই। ইহার পর বোধিচিত্ত সেই মোচার আগায় উঠিলেন। এই যে স্তূপ ইহাই "ত্রৈধাতুক লোক", তিনি এখন ইহার মাথার উপর। তাঁহার চারিদিকে অনন্তশূন্য, আর তাঁহার উঠিবার জায়গা নাই। তিনি সেইখান হইতে অনন্তশূন্যে ঝাঁপ দিলেন। যেমন নুনের কণা জলে মিশিয়া যায়, তাহার কিছুই থাকে না। সেইরূপ বোধিচিত্তও আপনাকে হারাইয়া অনন্তশূন্যে মিশিয়া গেলেন। যেমন সমুদ্রের জলে একটু লোনা আস্বাদ রহিয়া গেল, তেমনি অনন্তশূন্যে বুদ্ধের একটু প্রভাব রহিয়া গেল। তাঁহার প্রণীত ধর্ম ও বিনয় অনন্তকালের জন্য ত্রৈধাতুকলোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

নির্বাণ বলিতে "নাই" 'নাই'-ই বুঝায়। প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা এই 'নাই' 'নাই' লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। নির্বাণ হইয়া গেল, একটা অনির্বচনীয় অবস্থা উদয় হইল। ইহাতেই প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু পরে অনেকে ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেবল শূন্য হওয়াই চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। তাঁহারা উহার সঙ্গে আর-একটা জিনিস আনিয়া ফেলিলেন ; উহার নাম 'করুণা'। ইহা যেমন তেমন করুণা নয়, সর্বজীবে করুণা, সর্বভূতে করুণা। রূপধাতু ত্যাগ করিয়া অরূপধাতুতে আসিয়া যেমন সকল পদার্থকেই আকাশের ন্যায় অনন্ত দেখিয়াছিলেন, এখন সেইরূপ করুণাকেও অনন্ত দেখিতে লাগিলেন। শুদ্ধ 'শূন্যতা' লইয়া যে নির্বাণ, প্রাণশূন্য, নিশ্চল, নিস্পন্দ, কতকটা পাথরের মতো, কতকটা শুকনা কাঠের মতো হইয়াছিল ; করুণার স্পর্শে, তাহাতে যেন জীবন সঞ্চার হইল ; নির্জীবে জীবন আসিল, উদ্দেশ্যশূন্যে উদ্দেশ্য আসিল, সত্য সত্যই শুষ্কতরু যেন মুঞ্জরিয়া উঠিল। যাঁহারা অর্হৎ হওয়াই, অর্থাৎ কোনোরূপে আপনাদের মুক্ত করাই, জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন, সমস্ত জগৎ যাঁহাদের চক্ষে থাকিলেও হইত, না থাকিলেও হইত, জগতের পক্ষে যাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, সেই বৌদ্ধরা এখন হইতে আপনার উদ্ধারটা

আর তত বড়ো বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না, জগৎ উদ্ধার তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল। আমার আমিত্বটুকু লোপ করিব, আমি মুক্ত হইব, আর আমার চারিদিকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত-কোটি জীব বদ্ধ থাকিবে, একি আমার সহ্য হয়। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর সংসারের সকল গণ্ডি পার হইয়া ধ্যান-ধারণাদি বোধিসত্ত্বের যা-কিছু কাজ, সব সাঙ্গ করিয়া, এমন-কি ধর্মস্তূপের আগায় উঠিয়া শূন্যতা ও করুণাসাগরে যখন ঝাঁপ দিতে যান, এমন সময় তিনি চারিদিকে কোলাহল শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহার আমিত্ব চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার আয়তন আকাশের মতো অনন্ত হইয়াছে, তাঁহার করুণাও আকাশের মতো অনন্ত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব দুঃখে আর্তনাদ করিতেছে ; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের কোলাহল"। তাহারা উত্তর করিল, "আপনি করুণার অবতার আপনি যদি নির্বাণ লাভ করেন, তবে আমাদের কে উদ্ধার করিবে?" তখন অবলোকিতেশ্বর প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যতক্ষণ জগতের একটিমাত্র প্রাণী বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্বাণ লইব না।"

খৃস্টের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতে বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষে এই মত লইয়াই চলিত। ইহাকেই তখনকার লোকে মহাযান বলিত। তাহারা মনে করিত এত বড়ো মত আর হইতে পারে না। যখন বোধিসত্ত্বেরা করুণায় অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহারা জীবের উদ্ধারের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বুদ্ধদেব যে পঞ্চশীল দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাঙিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আর্যদেব 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণে' বলিয়া গিয়াছেন, " যে জগৎ উদ্ধারের জন্য কোমর বাঁধিয়াছে, তাহার যদি কোনো দোষ হয়, সে দোষ একেবারে ধর্তব্যই নয়।।"

এই বৌদ্ধধর্মের চরম উন্নতি। মহাযানের দর্শন যেমন গভীর, ধর্মমত যেমন বিশুদ্ধ, করুণা যেমন প্রবল, এমন আর-কোনো ধর্মে দেখা যায় না। বুদ্ধদেবের সময় হইতে প্রায় হাজার বৎসর অনেক লোকে অনেক তপস্যা ও সাধনা করিয়া এই মতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তখন বড়ো বড়ো রাজ্য ছিল, নানারূপ ধনাগমের পথ ছিল, কৃষি-বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট বিস্তার হইতেছিল, বিদ্যার যথেষ্ট আদর ছিল, ধর্মেরও যথেষ্ট আদর ছিল। তাই এত লোকে এত শত বৎসর ধরিয়া একই বিষয়ে চিন্তা করিয়া এতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

চাণক্য শ্লোকে বলে, "ধন উপায় করা বড়ো সহজ, কিন্তু ধন রাখা বড়ো কঠিন।" জ্ঞানেরও তাই, জ্ঞান উপার্জন সহজ, কিন্তু জ্ঞানটি রক্ষা করা বড়ো কঠিন। মহাযানেরও এই জ্ঞান বেশিদিন রক্ষা হয় নাই। দেশ ক্রমে ছোটো ছোটো রাজ্যে ভাগ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য লোপ হইয়া আসিল, লোকেও দেখিল যে বহুকাল চিন্তা করিয়া বহুকাল যোগসাধনা করিয়া মহাযান হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব, সুতরাং একটা সহজমত বাহির করিতে হইবে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রাজার দত্ত বৃত্তিতে বঞ্চিত হইয়া যজমানদিগের উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন ; তাঁহাদের আর চিন্তা করিবার সময়ও রহিল না,

সে স্বাধীনতাও রহিল না।

কিন্তু নির্বাণের কথা বলিতে গিয়া আমরা অনেক বাহিরের কথা বলিয়া ফেলিলাম। বোধ হয় এগুলি না বলিলে হইত না। মহাযানের নির্বাণ 'শূন্যতা' ও 'করুণা'য় মিশামিশি। এ নির্বাণের একদিকে 'করুণা' আর একদিকে 'শূন্যতা', করুণা সকলেই বুঝিতে পারে কিন্তু যে সকল যজমানের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বেশি নির্ভর করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগকে শূন্যতা বুঝানো বড়োই কঠিন। তাঁহারা শূন্যতার বদলে আর একটি শব্দ ব্যবহার করিতেন— সেটি "নিরাত্মা"। নিরাত্মা শব্দটি সংস্কৃত ব্যাকরণে ঠিক সাধা যায় না, কিন্তু এসময় বৌদ্ধেরা সংস্কৃত ব্যাকরণের গণ্ডির মধ্যে থাকিতে চাহিতেন না। তাঁহারা যজমানদিগকে বুঝাইলেন যে, বোধিসত্ত্ব যখন স্তূপের মাথায় দাঁড়াইয়া আছেন, তখন তাঁহারা চারিদিকে অনন্ত শূন্য দেখিতেছেন। এই শূন্যকে তাঁহারা বলিলেন 'নিরাত্মা', শুধু নিরাত্মা বলিয়া তৃপ্ত হইলেন না, বলিলেন "নিরাত্মাদেবী", অর্থাৎ নিরাত্মা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। বোধিসত্ত্ব নিরাত্মাদেবীর কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। পুরুষ মেয়ের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে যাহা হয়, যজমানেরা সেকথা অনায়াসেই বুঝিতে পারিল ; কেন-না সেটা বুঝিতে তো কাহাকেও বিশেষ প্রয়াস করিতে হয় না। এখন নির্বাণের অর্থ কী দাঁড়াইল, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আর ঠিক ঐ সময়েই, যজমানেরা বেশ বুঝিল, মানুষের মন কত নরম হয়, কত করুণায় অভিভূত হয়। সে কথাও তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইল না। সুতরাং নির্বাণ যে শূন্যতা ও করুণার মিশামিশি, তাহাই রহিয়া গেল, অথচ বুঝিতে কত সহজ হইল। এ নির্বাণেও সেই অনির্বচনীয় ভাব ও সেই অনন্ত ভাব, দিকেও অনন্ত, দেশেও অনন্ত, কালেও অনন্ত।

'নারায়ণ', পৌষ, ১২৩১

নির্বাণ কয় রকম?

থেরাবাদী বুদ্ধেরা ও প্রত্যেক-বুদ্ধেরা মনে করিতেন, মানুষ যদি সদুপদেশ পাইয়া, অথবা, নিজে মনে মনে গড়িয়া লইয়া চারিটি আর্যসত্যে বিশ্বাস করে, আট রকম নিয়ম মানিয়া চলে, তাহা হইলে বহুকাল অভ্যাসের পর, তাহারা স্রোতে পড়িয়া যায়। এইরূপ যাহারা স্রোতে পড়িয়া যায়, তাহাদের সোতাপন্ন বলে। স্রোতে পড়িলে যেমন সে আর উজান যাইতে পারে না, ভাটিয়াই যায়, সেইরূপ সোতাপন্ন নির্বাণের দিকেই যাইতে থাকেন, সংসারের দিকে তিনি আর-কখনো ফিরিয়া আসেন না। তাঁহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইলেও তিনি আর উজান বহেন না।।

সোতাপন্ন আরো কিছুদিন নিয়ম পালন করিলে, তিনি "সকৃদাগামী" হয়েন, অর্থাৎ, তিনি আর-একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব এই 'সকৃদাগামী" অবস্থাতে

তুষিতভবনে (তুষিতভবনে) বাস করিতেছিলেন। তিনি আর-একবার মাত্র পৃথিবীতে আসিলেন ও নির্বাণ পাইয়া গেলেন।

সকৃদাগামী আরো কিছুদিন নিয়ম পালন করিলে, তিনি যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ান, তাহাকে "অনাগামী" অবস্থা বলে। এ অবস্থায় আসিলে আর ফিরিতে হয় না। ইহার পরের অবস্থার নাম অর্হৎ। অর্হৎ যদিও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকেন, তবুও তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি যে নির্বাণ পাইয়া থাকেন, তাহার নাম "স্বউপাদী সেস নিব্বাণ" বা স্ব-উপাধি শেষ নির্বাণ। ইহা নির্বাণ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে পুনর্জন্মের কিছু কিছু "উপাদান" এখনো শেষ আছে ; অথবা সকল কর্ম এখনো ক্ষয় হয় নাই। আরো সূক্ষ্ম করিয়া বলিতে গেলে— কর্ম হইতে যে সংস্কার জন্মে, তাহার কিছু কিছু এখনো রহিয়া গিয়াছে।

এইরূপ জীবন্মুক্ত অবস্থায় অর্হৎ কিছুদিন থাকিলে, তাঁহার কর্মের ক্ষয়ই হয়, সঞ্চয় হয় না। ক্রমে সব কর্ম ক্ষয় হইয়া গেলে তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলেই তিনি "নিরুপাদি সেস নিব্বাণ ধাতু"তে প্রবেশ করেন— অর্থাৎ তখন তাঁহার কর্মও থাকে না, কর্ম হইতে উৎপন্ন সংস্কারও থাকে না। তিনি নির্বাণে প্রবেশ করেন, সব ফুরাইয়া যায়।

মহাযানীরা বলেন, এই যে হীনযানীদের নির্বাণ, ইহা নীরস, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, এবং ইহাতে অতি সংকীর্ণ মনের পরিচয় দেয়। হীনযানীরা ও প্রত্যেকযানীরা জগতের জন্য একেবারে 'কেয়ার' করেন না। তাঁহাদের কাছে জগৎ থাকা না-থাকা দুই-ই সমান। নির্বাণ পাইয়াও তাঁহারা কাঠের বা পাথরের মতো হইয়া যান। ও নির্বাণ, যাঁহারা বুদ্ধিমান, যাঁহাদের শরীরে দয়ামায়া আছে, যাঁহাদের হৃদয় আছে, যাঁহারা শুধু আপনার সুখের জন্য বাস করেন না, যাঁহারা পরের জন্য ভাবিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের কিছুতেই ভালো লাগিবে না। তাঁহারা নির্বাণের অন্যরূপ অর্থ করিয়া লইবেন।

মহাযানীরা মনে করেন যে, নির্বাণকে নিষেধমুখে অর্থাৎ 'না', 'না' করিয়া দেখিলে চলিবে না। উহাকে বিধিমুখে অর্থাৎ 'হাঁ'-র দিক হইতেই দেখিতে হইবে। আত্মার নাশের নাম নির্বাণ, জ্ঞানের নাশের নাম নির্বাণ, বুদ্ধির নাশের নাম নির্বাণ—এই যে হীনযানীরা 'না'র দিক হইতে উহাকে দেখিয়া থাকেন, উহা বুদ্ধের মনের কথা হইতে পারে না। তিনি 'চতুরার্য্যসত্য' ও আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ বা আটটি সুপথ ধরিয়া চলার নামই নির্বাণ। তাঁহার মতে মনুষ্য হৃদয়ের যত আশা আকাঙ্ক্ষা, সব শান্তি করিয়া দেওয়ার নাম নির্বাণ নহে ; সেই-সকল আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে দেওয়ার নামই নির্বাণ। কিন্তু সে আশা বা আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত থাকিলে চলিবে না, তাহার উর্ধ্বে অবস্থিতি করিতে হইবে।

দেখান গেল যে, মহাযান নির্বাণ 'না'র দিক হইতে নয়, 'হাঁ'র দিক হইতে বুঝিতে

হইবে। নিরালম্ব নির্বাণে বোধিচিত্ত যে কেবল ক্লেশ পরম্পরা হইতে মুক্ত হন, এরূপ নয়, কুদৃষ্টি হইতেও মুক্ত হন। তখন বোধিচিত্ত ধর্মকায়ের পবিত্র মূর্তি দেখিতে পাইবেন। দুটি জিনিস তখন তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে— ১. সর্বভূতে করুণা, ও ২. সর্বব্যাপী জ্ঞান। যিনি এইরূপে 'সম্যক্ সম্বোধি' লাভ করিয়াছেন, তিনি সংসারের উপরে উঠিয়াছেন, নির্বাণেও তখন তাঁহার একান্ত আস্থা নাই। তখন তাঁহার উদ্দেশ্য হইয়াছে সর্বজীবের পরিত্রাণ ও তাহার জন্য তিনি আপনাকে বারংবার বদ্ধ করিতেও কাতর হন না। তাঁহার সর্বব্যাপী-প্রজ্ঞাবলে তিনি পদার্থের সত্যাসত্য দেখিতে পান। তাঁহার জীবন তখন উৎসাহে পরিপূর্ণ, উহা সম্পূর্ণরূপে কর্মময় হইয়া গিয়াছে। কারণ, তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে বলিতেছে, "সমস্ত প্রাণীকে মুক্ত করো ও চরমানন্দে ভাসাইয়া দাও।" তিনি নির্বাণেও তৃপ্তি লাভ করেন না, নির্বাণেও তিনি বসতি করিতে পারেন না, তাঁহার কী ভব, কী নির্বাণ কোনোই আলম্বন নাই, এইজন্য তাঁহার নির্বাণের নাম নিরালম্ব নির্বাণ।।

মহাযানীদের আর-একরকম মুক্তি আছে। এ মুক্তি ভব ও নির্বাণের অতীত। ইহা সম্পূর্ণরূপে ধর্মকায়ের সহিত এক। আমরা যাহাকে তত্ত্ব বলি, সাধারণ লোকে যাহাকে তথ্য বলে, মহাযানীরা তাহাকে তথতা বলে। ধর্মের যে তথতা তাহার নাম ধর্মকায়। যিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি তথাগত হইয়াছেন, অর্থাৎ পরমসত্যে আগত হইয়াছেন।

সে পরম সত্যটি কী? জগতে আমরা যাহা-কিছু দেখিতে পাই, তাহার তলায় যে নিগূঢ় সত্যটুকু রহিয়াছে, তাহারই নাম ধর্মকায়। ধর্মকায় হইতেই নানাবিধ বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। ইহা হইতেই সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায়। ধর্মকায় মহাযানীদের নিজস্ব, কারণ হীনযানীরা জগতের আদিকারণ নির্ণয় করিতেই যান নাই। তাঁহাদের মতে ধর্মকায় বলিতে বুদ্ধের ধর্ম ও তাঁহার শরীর বুঝাইত। অনেকে মনে করেন, ধর্মকায় বলিতে বেদান্তের পরমাত্মা বুঝায়, কিন্তু সেকথা সত্য নয়। নির্গুণ পরমাত্মা অস্তিত্ব মাত্র। ধর্মকায়ের ইচ্ছা আছে, বিবেকশক্তি আছে, অর্থাৎ ইঁহার করুণা আছে ও বোধি আছে। সকল সজীব পদার্থই এই ধর্মকায়ের প্রকাশমাত্র।

নির্বাণ বলিতে চৈতন্যের নাশ বুঝায় না, চিন্তার নিরোধও বুঝায় না।। নির্বাণে নিরোধ করে কী? কেবল অহংভাবেরই ইহাতে নিরোধ করে। ইহাতে বলিয়া দেয় যে, অহং বলিয়া যে একটা পদার্থ কল্পনা করা হয়, তাহা অলীক ও এই অলীক কল্পনা হইতে আরো যত ভাব উঠে, সে সবও অলীক। এতটুকু তো গেল কেবল 'নিষেধমুখে' অর্থাৎ 'না'র দিক হইতে। বিধিমুখে অর্থাৎ 'হাঁ'র দিক হইতেও ইহার একটা অর্থ আছে। সেটি করুণা—সর্বভূতে দয়া। এই দুইটা জিনিস লইয়াই নির্বাণ সম্পূর্ণ হয়। হৃদয় যখন অহংভাব হইতে মুক্ত হইল, অমনি, যে হৃদয় এতক্ষণ সংকীর্ণ

ও অলস ছিল; তাহা আনন্দে উৎফুল্ল হইল, নূতন জীবনের ভাব দেখাইতে লাগিল, যেন কারাগার ছাড়িয়া বন্দি বাহির হইয়া পড়িল। এখন সমস্ত জগৎই তাহার, এবং সেও সমস্ত জগতেরই। সুতরাং একটি প্রাণীও যতক্ষণ নির্বাণ পাইতে বাকি থাকিবে, ততক্ষণ তাঁহার নির্বাণ পাইয়া লাভ কী? নিজের জন্যই হউক বা পরের জন্য হউক, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।

একজন বোধিসত্ত্ব বলিতেছেন, 'অবিদ্যা হইতে বাসনার উৎপত্তি এবং সেই বাসনা হইতে আবার পীড়ার উৎপত্তি। সমস্ত সজীব পদার্থ পীড়িত সুতরাং আমিও পীড়িত। যখন সমস্ত সজীব পদার্থ আরোগ্য লাভ করিবে, তখন আমিও আরোগ্য লাভ করিব। কিসের জন্য বোধিসত্ত্ব জন্ম ও মৃত্যু যন্ত্রণা স্বীকার করেন? কেবল জীবের জন্য। জন্ম ও মৃত্যু থাকিলেই পীড়া থাকে। যখন জীবের পীড়ার উপশম হয়, বোধিসত্ত্ব রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন। যখন পিতামাতার একমাত্র সন্তান পীড়িত হয়, তখন পিতামাতারও পীড়া উপস্থিত হয়। সে সন্তান নীরোগ হইলে পিতামাতাও নীরোগ হন। বোধিসত্ত্বেরও ঠিক সেইরূপ। তিনি সমস্ত জীবগণকে সন্তানের মতো ভালোবাসেন। তাহারা পীড়িত হইলেই তিনি পীড়িত হন, তাহারা নীরোগ হইলেই তিনি নীরোগ হন। তুমি কি শুনিতে চাও কেন বোধিসত্ত্ব এরূপ পীড়িত হন? তিনি মহাকরুণায় আচ্ছন্ন, তাই তিনি পীড়িত হন।''

'নারায়ণ', মাঘ, ১৩২১

কোথা হইতে আসিল?

১.

বৌদ্ধধর্মের আদি কী? একথা লইয়া বহুকাল হইতে বাদবিসংবাদ চলিয়া আসিতেছে। এ বিষয়েও নানা মুনির নানা মত ; এখনো কিছুই ঠিক হয় নাই। যাঁহার যেমন পড়াশুনা, যাঁহার যে শাস্ত্রে কৃতিত্ব, যিনি যে শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করেন, তিনিই আপনার মনের মতো একটা আদি ঠিক করিয়া লন এবং সেই মতই প্রচার করেন। অনেকে আবার দুই-চারি জনের মত লইয়া একটা সামঞ্জস্য করিতে গিয়াছেন। এইরূপে মত বহু-সংখ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের মতো লোকে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না, যতই আলোচনা করে ততই ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া ঘুরিতে থাকে। তাই সেই মতগুলির একবার চর্চা করা আবশ্যক হইয়াছে।

প্রথম মত এই যে, বুদ্ধদেব যজ্ঞে হাজার হাজার পশুবধ হয় দেখিয়া দয়ায় গলিয়া যান, ও যাহাতে পশুবধ নিবারণ হয়, তাহারই জন্য অহিংসা পরমধর্ম—এই মত প্রচার করেন। বাস্তবিক তখন যজ্ঞে যে বিস্তর পশু বধ হইত সে বিষয়ে তো সন্দেহ নাই। 'ঋগ্বেদে' অশ্বমেধ যজ্ঞের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে একটি ঘোড়া ও একটি ভেড়া

মারার কথা আছে। কিন্তু 'যজুর্বেদে'র ব্রাহ্মণে ঐ একটি ভেড়ার জায়গায় এক হাজার ভেড়া বধের কথা আছে। তাহার পর সোমযাগ তো পশুবধ ভিন্ন হইতেই পারিত না। সোমযাগ যে কত রকম ছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সুতরাং কত পশু যে মারা হইত তাহারো ইয়ত্তা নাই। তাই দেখিয়া পশুবধ নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব এই ধর্ম প্রচার করেন। এ মত বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, এবং এখনো আছে। রামচন্দ্র কবিভারতী—যিনি বঙ্গদেশ হইতে লঙ্কাদ্বীপে গিয়া তথাকার রাজার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন হন এবং বৌদ্ধাগম চক্রবর্তী এই উপাধি পান—তিনি নিজে প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বুদ্ধদেব যে বেদনিন্দা করিতেন একথা তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন—বুদ্ধদেব শুদ্ধ সেই-সকল শ্রুতির নিন্দা করিয়াছেন যাহাতে পশুবধের কথা আছে। সমস্ত বেদের নিন্দা তিনি একেবারেই করেন নাই।

জয়দেবও বুদ্ধ অবতারের স্তব করিতে গিয়া বলিলেন—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।।" (শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ ১/১৩)

অর্থাৎ তিনি মাত্র যজ্ঞবিধির শ্রুতিগুলির নিন্দা করিয়াছেন, অন্য শ্রুতির নিন্দা করেন নাই।

দ্বিতীয় মত এই যে, বুদ্ধদেবের পূর্বে উপনিষদের অদ্বৈত মত চলিয়া আসিতেছিল, বুদ্ধদেব সেই মতই আশ্রয় করিয়া ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার একটি নামই অদ্বয়বাদী। তাঁহার নির্বাণ ও উপনিষদের অদ্বয়বাদে বিশেষ কিছু তফাত নাই। তবে 'বিদ্বন্মোদত-রঙ্গিণী'র গ্রন্থকার চিরঞ্জীব শর্মা যেমন বলিয়াছেন, "তুমি বল, আছে আছে আমি বলি নাই।" তোমার আমার এই কথার ভেদ মাত্র, বাস্তবিক ভেদ কিছুই নাই। এই জন্যই শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদকে রামানুজের দল—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং
প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবতৎ।"

বলিয়া গালি দিয়াছেন। তবে এ গালিতেও ঐ মতে একটু তফাত আছে। রামানুজীরা বলেন, শংকর বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন, আর ও মতে বলে, উপনিষদের প্রাচীন অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধদেব অদ্বয়বাদী হইয়াছেন।

তৃতীয় মত এই যে, বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যমতের পরিণাম। সাংখ্যমত বুদ্ধদেবের অনেক পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল, সে বিষয় সন্দেহ নাই। সাংখ্যমতে যেমন দর্শন সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি গণিয়া সংখ্যা করিয়া রাখে, বুদ্ধমতেও তাই। সাংখ্যের অষ্ট বিকৃতি, তিন প্রমাণ, পঞ্চ ভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, অষ্ট সিদ্ধি ইত্যাদি বুদ্ধেরও সেইরূপ পঞ্চ স্কন্ধ, চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গমার্গ প্রভৃতি। সাংখ্যদর্শন যেমন ত্রিতাপনাশের জন্যই রচিত হইয়াছিল, বুদ্ধদর্শনও তেমনি ত্রিতাপনাশের জন্যই রচিত হয়াছিল। সেই

ত্রিতাপ নাশ করিতে গিয়া সাংখ্যগণ বলিয়াছিল, আত্মাকে কেবল, অর্থাৎ অন্য বস্তুর সহিত সম্পর্কশূন্য করিয়া দিতে পারিলেই ত্রিতাপ নাশ হয়। বুদ্ধ বলিলেন, না, সে হইতেই পারে না, কারণ আত্মা থাকিলেই তাহা 'কেবল' হইয়া থাকিতে পারে না, অতএব আত্মাই নাই বলিতে হইবে।

অনেকে মনে করেন, ব্রাহ্মণেরা সে সময়ে বড়ো অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ভূদেব বলিয়া মনে করিতেন। অন্য যে কেহই হউক না, তাঁহাকে ব্রাহ্মণের পদানত হইয়াই থাকিতে হইবে। বুদ্ধদেব এত অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি আপামর সকলকেই মুক্তির উপদেশ দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার দ্বেষই ধর্মপ্রচারের কারণ। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এ-কথা একেবারেই স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে কিছুমাত্র দ্বেষভাব ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি চন্দ্রকীর্তির টীকার সহিত আর্যদেবের 'চতুঃশতিকা'র কিয়দংশ ছাপা হইয়াছে, তাহাতে আচার্য সংঘসেন একজন বালকের সেবায় অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তাহাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লইবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। তখন সে বলিল, "আর কিছুদিন যাউক, আমি দীক্ষা লইব।" মাস খানেক পরে সে আসিয়া বলিল, "আচার্য, আমি এখন 'দীক্ষিত'।" আচার্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে তোমার দীক্ষা হইল?" সে বলিল, "এখন ব্রাহ্মণ দেখিলেই আমার ইচ্ছা হয় যে আমি তাহাকে মারিয়া ফেলি, সুতরাং আমি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত।"

আবার একদল আছেন তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব শাক্যবংশে জন্মিয়াছিলেন। শাক্য শব্দ শক শব্দ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং তিনিও শক ছিলেন। শকেদেরই ধর্ম তিনি প্রচার করেন। শকেরা কোনো কালে হিমালয়ের উচ্চ শিখর উত্তীর্ণ হইয়া কপিলবাস্তুতে বাস করিয়াছিল, তাহারা স্বগোত্রে বিবাহ করিত, সুতরাং তাহারা কিছুতেই আর্য হইতে পারে না। অনেক শকজাতীয় রাজারাও আপনাদিগকে শাক্যবংশের লোক বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং বুদ্ধদেবের জ্ঞাতি বলিয়া গৌরব করিতেন।

কোনো কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন যে, বুদ্ধদেবের গল্পটি সত্য নয়। উহা ইতিহাস নহে, উহা সূর্যসম্বন্ধীয় একটি প্রাচীন কল্পিত আখ্যায়িকা মাত্র। শালগাছে ভর করিয়া মা দাঁড়াইলেন ও মায়ের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বুদ্ধদেব জন্মাইলেন, ইহা পূর্বদিকে সূর্য উদয় ভিন্ন আর-কিছুই নহে। আবার দুইটি শালগাছের মাঝখানে গালে হাত দিয়া বুদ্ধদেব নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, ইহাও সূর্যের অস্তগমন ভিন্ন আর-কিছুই নহে। যাঁহারা এই আখ্যায়িকা সাজাইয়াছেন, তাঁহাদের সুবিধিরচনায় বাহাদুরি খুব আছে।

যাঁহারা ভারতবর্ষের যাহা-কিছু সবই গ্রিকদিগের কাছ হইতে লওয়া মনে করেন, তাঁহারাও বুদ্ধদেব গ্রিকদিগের কাছ হইতে কিছু লইয়াছেন, একথা বলিতে পারেন না।

কেন-না যখন তাঁহার জন্ম হয়, অথবা যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখনও পর্যন্ত গ্রিকজাতি ভারতবর্ষের দিকে কেহ আসেনই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের নিজস্ব কিছু থাকিতে পারে, একথা তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব ও মার আর-কেহই নহে, জোরোয়াস্টারের মতের অহুরমজদা ও আহরিমান মাত্র। জোরোয়াস্টারের মতে যেমন ভালো ও মন্দের লড়াইয়ে শেষ ভালোরই জয় হইল, মন্দ হারিয়া গেল, এমতেও তেমনি বুদ্ধ জিতিলেন ও মার হারিয়া গেলেন। জিহোবা ও শয়তান যদি ভালো ও মন্দের লড়াই হয়, তবে বুদ্ধ ও মার না হইবেন কেন?

যেখানে প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়, এখন সেইখানে থাড়ু নামে এক জাতি বাস করে। উহারা বিশেষ সভ্য নহে। পূর্বে উহাদিগকে চেরো বলিত এখন থেড়ো হইয়া গিয়াছে। ছোটোনাগপুরের অনেক অসভ্য জাতিই বলে যে তাহারা চেরোদের সন্তান, রোটাস্‌গড়ের দিক হইতে অথবা তাহারো উত্তর হইতে তাহারা ছোটোনাগপুরে আসিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে বঙ্গ, বগধ ও চের নামে তিন জাতি আর্যদিগের শত্রু ছিল। উহাদের মধ্যে চেররাই এখনকার থেড়ো, উহাদের ধর্মই বুদ্ধদেব সংস্কার করিয়া উত্তর ভারতের অনেক সুসভ্য দেশে প্রচার করেন। এও একটা মত আছে।

এই-সকল মতের প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল কত রকমের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে তাহা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ বিষয়ে বিচার করিতে গেলে প্রথম দেখিতে হইবে বুদ্ধদেব আর্য কিনা। তিনি যে আর্য নন একথা বলিবে কিরূপে? তিনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মান। ইক্ষ্বাকুবংশ বেদেও প্রসিদ্ধ। তাঁহারো গোত্র আছে, গোতম গোত্রের কপিলমুনি শাক্যবংশের আদিগুরু। গোতমের নাম হইতেই শাক্যসিংহকে গৌতম বলিয়া ডাকা হয়। তখন গুরুর গোত্র লইয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর্য জাতির গোত্র হইত, প্রমাণ অশ্বঘোষের উক্তি—

"একপিত্রোর্যথাভ্রাত্রোঃ পৃথক্ গুরুপরিগ্রহাৎ।
রামএবাভবৎ গার্গো বাসুভদ্রোপি গৌতমঃ।।"

এক বাপের দুই ছেলে; রাম ও বাসুভদ্র। পৃথক্ পৃথক্ গুরু স্বীকার করায় রাম হইলেন গার্গ্য এবং বাসুভদ্র হইলেন গৌতম। সুতরাং বুদ্ধদেবের পূর্বপুরুষগণ অন্য জাতীয় লোক হইয়া গুরুর গোত্র গ্রহণ করিয়া গৌতম হওয়া বিচিত্র নহে। শাক্যগণ ইক্ষ্বাকু বলিয়া গর্ব করিতেন। কিন্তু এটা তো ঠিক তাঁহাদিগকে ইক্ষ্বাকুরাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং বৈমাত্র ভাইয়ের উপকারের জন্যই তাড়ানো হয়। পাটরানীর ছেলেকে তো তাড়ানো শক্ত, সুতরাং তাঁহারা অন্য রানীর ছেলেই হইবেন। রাজারা তখন অনেক বিবাহ করিতেন এবং বিবাহে জাতি-বিচার বড়ো একটা করিতেন না। সুতরাং ভরতবংশ যেমন পাকা আর্য, শাক্য যে তেমন পাকা এরূপ বোধ হয় না।

আর্যাবর্তও সে সময়ে যে উভয় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহাও বোধ হয় না। আর্য ও বঙ্গ-বগধ জাতির সন্ধিস্থলে শাক্যবংশীয় রাজধানী ছিল। এইরূপ নানা কারণে শাক্যেরা যে পাকা আর্য ছিলেন, সে বিষয়ে যেন একটু সন্দেহ হয়।

তারপর যাগযজ্ঞে পশুহিংসা দেখিয়া বুদ্ধদেবের অহিংসা ধর্মের উদ্রেক হয়, এটা তো বুদ্ধের কোনো জীবন-চরিতে বলে না। 'ললিত-বিস্তরে' বলে না, 'মহাবস্তু-অবদানে' বলে না, 'বুদ্ধচরিতে' বলে না, পালি গ্রন্থেও বলে না। তবে সেটার উপর বিশেষ ভরও দেওয়া যায় না। ঐটাই যদি প্রধান কারণ হইত, তাহা হইলে তাঁহার এত জীবনী, একখানি-না-একখানিতে একথাটা থাকিত যে বুদ্ধ পশুহত্যা দেখিলেন, তিনি করুণায় গলিয়া গেলেন ও যাহাতে পশুহত্যা নিবারণ হয়, তাহারই জন্য ধর্ম প্রচার করিতে বসিলেন। অহিংসা যে পরম ধর্ম, তাঁহার পূর্বেও লোকে জানিত। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত পঁহুছিতেন ও ভিক্ষু-আশ্রম গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা তো হিংসা করিতেন না। জৈনেরা বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব হইতে অহিংসাধর্ম পালন করিয়া আসিতেছিল। অতএব ওকথাটা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না।

উপনিষদের অদ্বৈতবাদ হইতে বুদ্ধদেবের ধর্মের উৎপত্তি, একথা স্বীকার করা কঠিন। কারণ উপনিষদ্, বিশেষ তাহার অদ্বৈতবাদ, বুদ্ধদেবের সময়ে হইয়াছিল কি? ব্রাহ্মণগুলি যজ্ঞ করিবার জন্য লেখা হয়। প্রাচীন উপনিষদ্গুলি, যথা 'ছান্দোগ্য', 'বৃহদারণ্যক', ব্রাহ্মণের অংশ, যজ্ঞেই উহার ব্যবহার হইত। যাজ্ঞিকেরা এখনো উহা যজ্ঞের অংশ বলিয়াই ব্যবহার করেন। শংকরাচার্যের মত ব্যাখ্যা তাঁহারা করেন না। সেকালে যে-কোনো সার কথা গুরুর কাছ হইতে শিখিতে হইত, তাহারই নাম উপনিষদ্ ছিল। অর্থশাস্ত্রের উপনিষদ্ ছিল, কামশাস্ত্রের উপনিষদ্ ছিল। বৌদ্ধেরাও উপনিষদ্ শব্দ বেশ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

মোক্ষস্যোপনিষৎ সৌম্য বৈরাগ্যমিতিগৃহ্যতাম্।
বৈরাগ্যস্যাপি সংবেগঃ সংবিদো জ্ঞানদর্শনম্॥
জ্ঞানস্যোপনিষচ্চৈব সমাধিরুপধার্য্যতাম্।
সমাধেরপ্যুপনিষৎ সুখং শারীরমানসম্॥
প্রস্রব্ধিঃ কায়মনসোঃ সুখোস্যোপনিষৎ পরা।
প্রস্রব্ধেরপ্যুপনিষৎ প্রীতিরপ্যবগম্যতাম্॥
তথা প্রীতেরুপনিষৎ প্রামোদ্যং পরমং মতম্।
প্রামোদ্যস্যাপ্যহৃল্লেখঃ কুকৃতেষ্বকৃতেষু চ॥
অবিলেখস্য মনসঃ শীলন্তু পানিষচ্ছুচি।

মোক্ষের মূল বৈরাগ্য; বৈরাগ্যের মূল আগ্রহ; আগ্রহের মূল জ্ঞান-দর্শন; জ্ঞানের মূল সমাধি; সমাধির মূল শরীর ও মনের সুখ; সুখের মূল শরীর ও মনের শান্তি;

শান্তির মূল প্রীতি; প্রীতির মূল স্ফূর্তি; স্ফূর্তির মূল কুকার্য করিয়া অথবা কর্তব্য কর্ম না করিয়া হৃদয়ে ব্যথা না থাকা। ব্যথা না থাকার মূল বিশুদ্ধ শীল।

আর উপনিষৎ বলিয়া একটি দর্শনের মত আমরা সর্ব প্রথম 'হর্ষ-চরিতে' দেখিতে পাই। 'হর্ষচরিতে' হর্ষ যখন দিবাকরের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তথায় নানা সম্প্রদায়ের ছাত্র পাঠ করিতেছে দেখিতে পাইলেন; তাহার এক সম্প্রদায় ঔপনিষদ। কালিদাসও তাঁহার 'বিক্রমোর্ব্বশী'তে বলিয়াছেন, "বেদান্তষু যমাহুরেক পুরুষম্"— এখানেও বেদান্ত শব্দের অর্থ উপনিষৎ। সুতরাং কালিদাস ও হর্ষরাজার সময়েই উপনিষদ্ একটা দার্শনিক মতের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, কিন্তু সে তো বুদ্ধের বহুকাল পরে। উপনিষদের যে এত প্রাদুর্ভাব এখন দেখা যাইতেছে, ইহা তো শংকরাচার্যের পর হইতেই হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, উপনিষদের অদ্বৈতবাদ হইতে বৌদ্ধধর্ম, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। আরো কথা, বৌদ্ধধর্মটাই কি গোড়ায় অদ্বৈতবাদ ছিল? সেটা মহাযানীরাই না ফুটাইয়া তুলিয়াছে?

শকজাতি হইতে শাক্যজাতির উদ্ভব, একথাটাও ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ শকেরা তো শুঙ্গরাজাদের সময় খৃ.পূ. দ্বিতীয় শতে ভারতবর্ষে আসে। তাহাও আবার সুদূর পশ্চিমে পাঞ্জাবের কোলে। হিমালয় অতিক্রম করিয়া শকেদের আসা কোথাও দেখা যায় না। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসই নাই, তবে কোনো কথা শুনা যায় নাই বলিয়া তাহা একেবারে মিথ্যা, এরূপ জোর করিয়া বলা যাইবে কিরূপে? কিন্তু আমরা শাক্য শব্দের আর-এক প্রকার ব্যুৎপত্তি পাইয়াছি। তাহাতে সকল কথার সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। অশ্বঘোষ বলিয়াছেন, শাক নামে এক রকম গাছ আছে। সেই গাছে ঘেরা জায়গায় বাস করেন বলিয়া বুদ্ধদেবের পূর্বপুরুষদের শাক্য বলিত। এ কথাটা বেশ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। নেপালের তরায়ে এখনো শাকিয়া শালের গাছই অধিক। শাক গাছ শাকিয়া শাল হইলে, শাক্য শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য হিমালয় ও তিব্বত পার হইয়া শকজাতির দেশে যাইবার প্রয়োজন নাই।

বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা অশ্বঘোষ এক প্রকার বলিয়াই গিয়াছেন। বুদ্ধদেবের গুরু অড়ার কালাম ও উদ্রেক দু' জনেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন। দু' জনেই বলিয়াছিলেন, 'কেবল' অর্থাৎ জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য হইতে পারিলেই মুক্তি হয়। বুদ্ধ তাঁহাদের মত না মানিয়া বলিয়াছিলেন, 'কেবল' হইলেও অস্তিত্ব তো রহিল; অস্তিত্ব রহিলে নিঃসম্পর্ক হইবার জো নাই। একথা পূর্বেই বলিয়াছি।

যদি বৌদ্ধধর্ম সাংখ্য হইতেই উৎপন্ন হয়, তবে তো উহা আর্য-ধর্ম হইতেই উৎপন্ন হইল। আমার সেই কথাতেই সন্দেহ। সাংখ্যমত কি বৈদিক আর্যগণের মত? শংকরাচার্য তো উহাকে বৌদ্ধাদি মতের ন্যায় অবৈদিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি

এত যত্ন করিয়া ও মত খণ্ডন করেন কেন? মন্বাদিভিঃ কৈশ্চিৎ শিষ্টৈঃ পরিগৃহীতত্বাৎ। মনু প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্ট উহাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া। সাংখ্যমত কপিলের মত চিরকাল প্রবাদ। কপিলের বাড়ি পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ বঙ্গ-বগধ-চেরদিগের দেশে। গঙ্গাসাগর যাইতে কপিল-আশ্রম আছে, কবতক্ষের ধারে কপিল মুনির গ্রাম। কপিলবাস্তুও কপিল মুনির বাস্তু। কারণ অশ্বঘোষ বলিয়াছেন, গোতমঃ কপিলো নাম মুনিধর্ম্মভৃতাং বয়ঃ। তাঁহারই বাস্তুতে কপিলবাস্তু নগর। বাস্তবিকই কপিলকে কেহ ঋষি বলে না। তাঁহার নাম করিতে গেলেই বলে আদিবিদ্বান্। বাল্মীকি যেমন আদিকবি, তিনিও তেমনি আদিবিদ্বান্। 'শ্বেতাশ্বতরে' তাঁহাকে 'পরমর্ষি' বলা হইয়াছে।। কিন্তু ভাব ভাষা ও মত দেখিলে এখানিকে নিতান্ত অল্পদিনের পুস্তক বলিয়া বোধ হয়।

কৌটিল্য তিনটি মাত্র দর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত; কৌটিল্য ২৩০০ বৎসর পূর্বের লোক। তাঁহার সময় অন্য দর্শন হয়ই নাই, হইলে তাঁহার মতো সার্বভৌম পণ্ডিতের তাহা অবিদিত থাকিত না। সেই তিনটির মধ্যে লোকায়ত মত, লোকে আয়ত অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়া ঐ নাম পাইয়াছে, উহার আদি নাই, ও মত সর্বত্র সকলেরই মত। খাও দাও সুখে থাকো—এ মতআবার কে প্রচার করিতে যাইবে? সকলেই জানে, সকলেই বুঝে ও সকলেই সেই মতে কার্য করে, সুতরাং উহার কথা ছাড়িয়া দিলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই। যোগমত সাংখ্য-দর্শনেরই রূপান্তর মাত্র। দুই-ই দ্বৈতবাদী।

সাংখ্য ও যোগের যে-সকল পুস্তক আছে সকলগুলিই নূতন। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাই তাহাদের মধ্যে পুরানো। ঈশ্বরকৃষ্ণ খৃস্টীয় পাঁচ শতের লোক। কিন্তু তাঁহার পূর্বেও সাংখ্যমতের পুস্তক ছিল; মাঠর ভাষ্যের কথা অনেক জায়গায় শুনিতে পাওয়া যায়। পঞ্চশিখের দু-চারিটি বচন যোগভাষ্যকার ধরিয়াছেন। আসুরির একটি কবিতা একজন জৈন টীকাকার তুলিয়াছেন। মহাভারতে আসুরির নাম নাই, পঞ্চশিখের নাম আছে। তিনি জনক রাজার সভায় মিথিলায় উপস্থিত ছিলেন। কপিলের নিজের কোনো বচন এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যে ২২টি সূত্র কপিলসূত্র বলিয়া চলিতেছে, তাহাও বিশেষ প্রাচীন নহে, ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা দেখিয়া লেখা বোধ হয়। কিন্তু অশ্বঘোষের লেখা ও কৌটিল্যের উক্তি দেখিয়া সাংখ্য যে খুব প্রাচীন তাহা বেশ অনুভব হয়।

সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে আদিবিদ্বান্ কপিলের নামও নাই গন্ধও নাই। আমাদের এখানকার ব্যবহারেও সাংখ্যমতের বড়ো বড়ো লোকগুলি মানুষ। ঋষিও নন মুনিও নন। আমরা যে নিত্য তর্পণ করিয়া থাকি তাহাতে—

সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢুঃ পঞ্চশিখস্তথা।

বলিয়া যাঁহাদের তর্পণ করি, রঘুনন্দন বলেন তাঁহারা মনুষ্য। এই কবিতায় যাঁহাদের নাম আছে, তাঁহারা সকলেই সাংখ্যমতের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য।

উপরের লেখা হইতে তিনটি কথা বুঝা যায়, যে সাংখ্যমত সকলের চেয়ে পুরানো, উহা মানুষের করা এবং পূর্ব-দেশের মানুষের করা। উহা বৈদিক আর্যদের মত নহে, বঙ্গ, বগধ বা চেরজাতির কোনো আদিবিদ্বানের মত। যাঁহারা পুত্র পশু প্রভৃতি লাভের জন্য, পুষ্টি-তুষ্টির জন্য বড়ো জোর স্বর্গকামনায়, যাগযজ্ঞ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিতাপনাশের জন্য "আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নির্লেপ নির্বিকার" ইত্যাদি মত উদ্ভব হওয়া কঠিন। ইহা অনায়াসেই মনে হইতে পারে, যে এই মত অন্যত্র উদ্ভুত হইয়া ক্রমে কোনো কোনো আর্য পণ্ডিত কর্তৃক পরিগৃহীত হওয়ায় আর্যগণের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। হেমাদ্রি বেশিদিনের লোক নহেন, তাঁহার সময় খৃস্টীয় তেরো শতে, তিনি বলিতেছেন যে, যে ব্রাহ্মণ সাংখ্য মত ভালো জানেন, তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায় পংক্তি-পাবন, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ কাপিল সে পংক্তিবাহ্য। ইহাতেও অনুমান হয়, কপিলের কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মত ব্রাহ্মণগণ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেলেন। আর কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মত একেবারেই গ্রহণ করেন নাই।

যদি সাংখ্য হইতেই বুদ্ধমতের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে বৈদিক আর্যমত হইতে উহার উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না। বৌদ্ধধর্মে আরো অনেক জিনিস আছে যাহা আর্যধর্মের খুব বিরোধী। আর্যগণ তিন আশ্রম পালন না করিয়া ভিক্ষু আশ্রম গ্রহণ করিতেন না। আপস্তম্ব প্রভৃতি সকল সূত্রকারেরই মত এই যে, ব্রহ্মচারী হইয়া গৃহস্থ, তাহার পর বানপ্রস্থ ও তাহার পর ভিক্ষু হইবে। কিন্তু বুদ্ধ উপদেশ দিতেন যে, যখনই সংসারে বিরাগ উপস্থিত হইবে, তখনই সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইতে পারিবে। এমন-কি অতি শিশুকেও ভিক্ষু করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কয়েকটি নাবালককে ভিক্ষু করায় কপিলাবস্তুতে বড়ো গোলমাল উপস্থিত হয়। তাহাতে বুদ্ধদেবের পিতা বুদ্ধকে বুঝাইয়া বন্দোবস্ত করিয়া দেন যে, নাবালককে শিষ্য করিতে হইলে তাহার পিতামাতার অনুমতি লইতে হইবে। ক্রমে বৌদ্ধ কর্মবাচায় দেখিতে পাওয়া যায়, একুশ বৎসরের পূর্বে কাহাকেও দীক্ষা দেওয়া হইত না। যে-কেহ দীক্ষা লইতে আসিত, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করা হইত, তোমার বয়স একুশ বৎসর হইয়াছে তো? বহুকাল পরে শংকরাচার্য এই মত প্রকাশ করেন যে, "যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"। এটি 'জাবালোপনিষদে'র বচন। সম্ভবত শংকরাচার্যের পূর্বেই এই উপনিষৎ রচিত হইয়াছিল। উহা কোনো ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত নহে, সুতরাং বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী হওয়া সম্ভব নহে।

বৌদ্ধভিক্ষুর বেশ হইতেও দেখা যায় উহা আর্যবিরোধী বেশ। আর্যগণ উষ্ণীষ ও উপানহ ভিন্ন চলিতেন না। মাথায় পাগড়ি ও পায়ে জুতা সবারই থাকিত। কিন্তু বৌদ্ধগণ বাঙালির মতো খালি মাথায় থাকিতেন এবং উপানহ ব্যবহার করিতেন না।

এই-সকল নানা কারণে বোধ হয় যে, পূর্বাঞ্চলে বঙ্গ, বগধ ও চের নামে যে তিনটি সভ্য জাতি বাস করিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে আর্যগণের মেলামেশায় বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। যে জায়গায় আর্যগণের পশ্চিমসীমা ও ঐ জাতিসকলের পূর্বসীমা, সেইখানেই বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি। উহা পূর্বাঞ্চলে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, পশ্চিমাঞ্চলে উহার প্রার্দুভাব কখনোই এত অধিক হয় নাই। পাঞ্চাল, কুরুক্ষেত্র ও মৎস্যদেশে যে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল, ইহার প্রমাণ বড়ো একটা পাওয়া যায় না।

২.

পূর্বের 'নারায়ণে' বৌদ্ধধর্ম কোথা হইতে আসিল তাহার কতকটা আভাস দিয়াছি। বঙ্গ-বগধ-চের জাতির আচার-ব্যবহার ও ধর্ম লইয়া বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ঠিক হউক আর নাই হউক, বৌদ্ধধর্মের মতামত আচার-ব্যবহার অনেকটা পূর্বদিক হইতে আসিয়াছে। কিন্তু অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে বঙ্গ-বগধ-চের জাতির কথা অল্প লোকেই জানে। অতি অল্পদিন হইল 'ঐতরেয় আরণ্যকে'র একটি ব্রাহ্মণে উহাদের নাম পাওয়া গিয়াছে। এখনো অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিতেছেন, ওখানটার অর্থবোধই হয় না। সায়ন বঙ্গ-বগধ-চের শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তবে ওকথার উপর জোর দেওয়া যায় কি? সায়নের কথা ধরি না; সায়ন বেদ রচনার দুই-তিন হাজার বৎসর পরে উহার অর্থ করিতে বসিয়াছিলেন। দু-চারটা মানুষের নাম ও দেশের নামের তিনি যে অন্য অর্থ করিয়া দিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এস্থলে তাঁহার অর্থ গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহারা নিজেও ইহার অর্থ কী স্থির নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা ইহাতে বেশ দেখিতে পাইতেছি যে বঙ্গ শব্দের মানেতে কোনো গোল নাই। সায়নের অর্থ বনংগতা, এ অর্থ আমরা লইতে পারি না। বগধ যে মগধ তাহাতেও আমাদের সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। তামিল জাতির একটা শাখাকে যে চের বলিত তাহারো সন্দেহ নাই। এখনো দক্ষিণ দেশে তামিল বা দ্রাবিড়ীয় জাতির মধ্যে কেরল নামে একটি প্রবল জাতি আছে। কেরলদিগের প্রাচীন নাম চের। চেরো বলিয়া একটি জাতিকে ছোটনাগপুরের সমস্ত জাতিই আপনাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া মনে করেন। কপিলবাস্তুর নিকটে এখনো যে থাড়ু জাতি আছে তাহারাও চেরো বা চের জাতির একটা ধারা।

এই-সকলের সঙ্গে যদি আর-একটা কথা ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আরো একটু সুবিধা হয়। সকলেই জানেন যে আরণ্যকগুলি ব্রাহ্মণগুলিরই শেষ অংশ। ব্রাহ্মণ যে প্রকারের বই, আরণ্যকও সেই প্রকারেরই বই। ব্রাহ্মণে যাহা বলা হয় নাই, আরণ্যকে তাহাই বলা হইয়াছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র শেষ অংশে ইন্দ্র-দেবতার মন্ত্রে অভিষেক হওয়ায় যে-সকল রাজা বড়ো হইয়াছিলেন, বিশেষ অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন,

তাহাদের একটি সুদীর্ঘ তালিকা আছে, যে ঋষি অভিষেকের পুরোহিত ছিলেন তাঁহার প্রশংসা আছে, আর যে রাজা অভিষেক লইয়াছিলেন তিনি কতবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহারো উল্লেখ আছে। এই তালিকার শেষ ভাগে লেখা আছে যে ভরতরাজা ইন্দ্র অভিষেক লইয়া ১৩৩টা অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ৭৮টা যমুনার পশ্চিমে মরুষ্ণ দেশে, আর ৫৫টা গঙ্গার পূর্বে জলবৃষ্টির দেশে। যমুনার পশ্চিমে যতদূর যাইবে মরু দেশ আর উষ্ণ দেশ। কতদূর ভরতের অধিকার ছিল বলা যায় না। ৭৮টা অশ্বমেধের জন্য কতখানি দেশ লওয়া আবশ্যক আমরা জানি না। তবে এ পর্যন্ত বলিতে পারি যে বেলুচিস্তান উহার মধ্যে ছিল না। থাকিলে ভরতের নাম অনুসারে উহাও ভারতবর্ষ বলিয়া গণ্য হইত; তবেই যমুনার পশ্চিম হইতে সিন্ধু দেশের পশ্চিম-সীমা পর্যন্ত ভূভাগ জয় করিয়া তিনি ৭৮টা অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। তাই যদি হইল তবে ৫৫টা অশ্বমেধের জন্য গঙ্গার পূর্বে কতটা জমি তাঁহাকে অধিকার করিতে হইয়াছিল? 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' অন্তর্বেদির নাম একেবারেই করে না, বলে যমুনার পশ্চিমে ও গঙ্গার পূর্বে। এখন ৫৫টা অশ্বমেধের জন্য কতটা দেশের দরকার। আমার বোধ হয়, এলাহাবাদ হইতে ঠিক উত্তরমুখে রেখা টানিলে ঐ রেখা ও গঙ্গার পূর্ব-পারের মধ্যে যত দেশ পড়ে তাহাই ৫৫টা অশ্বমেধের পক্ষে যথেষ্ট।

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' ভারতবর্ষ অথবা আর্যভূমির অথবা আর্যজাতির বসতি বিস্তারের এই সীমা নির্ধারণ করিয়া দিলে, তাহার পরই 'ঐতরেয় আরণ্যক' বলিলেন যে বঙ্গ -বগধ-চেরজাতি পক্ষীবিশেষ; উহাদের ধর্ম নাই, উহারা নরকগামী হইবে। ইহার মোটামোটি অর্থ এই হইল যে, আর্যগণ এলাহাবাদ পর্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাহার ওদিকেই বঙ্গ-বগধ-চেরজাতি। ইহারা আর্যগণের শত্রু। আর্যগণের বসতি বিস্তারে বাধা দিত তাই আর্যগণ ইহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। যাহাদিগকে তাঁহারা দেখিতে পারিতেন না, তাহাদিগকে মানুষ না বলিয়া পশু পক্ষী রাক্ষস বলা তাঁহাদের রোগ ছিল। তামিলগণ তাঁহাদের কাছে বানর। কর্ণাটগণ হয়তো ভালুক, লঙ্কার লোক রাক্ষস। সেইরূপ বাংলার লোক পাখি।

বুদ্ধদেব কিন্তু সেই পাখির দেশেই জন্মান। তাঁহারো পূর্বে কনকমুনি কপিলবাস্তুরই নিকটে জন্মাইয়া বোধি লাভ করেন। এই অঞ্চলেই জৈনধর্ম প্রচারক মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান বৈশালী, পাটনার উত্তর-পশ্চিম, গঙ্গার উত্তর-পারে। ইনি আবার জৈনযতি হইয়া বারো বৎসর কাল পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া আসেন। বৈশালীর লোক মনে করিল, মহাবীর নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বারো বৎসর পরে তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া কেবলী হইয়া ফিরিলেন। তাঁহারো পূর্বে পার্শ্বনাথ কাশীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার পরিত্যাগের পর পূর্ব অঞ্চলে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া সমেতগিরি অর্থাৎ পরেশনাথ পাহাড়ে বাস করিয়া তথায়ই দেহরক্ষা করেন। আর আর তীর্থংকরদের

অনেকেই পূর্ব অঞ্চলের লোক। ২৪ জন তীর্থংকরের বৃত্তান্ত পড়িলে একথা আরো প্রমাণ বলিয়া বোধ হইবে।

পশিচমাঞ্চলে যখন আর্যগণ যাজযজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত, দেশ দখল করিতে ব্যস্ত, শ্রৌতসূত্র রচনায় ব্যস্ত, শূদ্রগণকে আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখার বন্দোবস্ত লইয়া ব্যস্ত, তখন পূর্বাঞ্চলে বঙ্গ-বগধ-চেরগণ পরকাল লইয়া ব্যস্ত, কিসে জন্মজরামরণের হাত এড়ানো যায় তাহাই লইয়া ব্যস্ত। পশ্চিমাঞ্চলে যেমন ঋষির পর ঋষি শ্রৌতসূত্র রচনা করিতেছিলেন ; পূর্ব অঞ্চলে তেমনি তীর্থংকরের পর তীর্থংকর, বুদ্ধের পর বুদ্ধ পরকালে কিসে সুখে থাকা যায় তাহারই উপায় দেখিতেছিলেন।

শাক্যমুনি শেষ বুদ্ধ, মহাবীর শেষ তীর্থংকর। দু' জনেই এক সময়ের লোক। দু' জনেই খৃস্টের পূর্বে ছয় শতের লোক। সুতরাং দীপংকর প্রভৃতি ২৪ জন বুদ্ধ আর ঋভষদেবাদি ২৪ জন তীর্থংকর তাঁহাদের অনেক পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে শাক্যসিংহের পূর্বে যে ২৩ জন বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা মানুষ নন—বৌদ্ধেরা আপনাদের ধর্মটা পুরানো, তাই দেখাইবার জন্যই ২৪ টা নাম করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু শাক্যসিংহের পূর্ববর্তী কনকমুনির খাম্বা পাওয়া গিয়াছে, যেখানে তাঁহার নির্বাণ লাভ হয় তাহা স্থির হইয়াছে ; তাঁহাকে মানুষ নয় বলা এখন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনকার পালি বৌদ্ধেরা বলে চারি যুগে আট জন মানুষ-বুদ্ধ। বিপশ্যী ও শিখী সত্যযুগে, কাশ্যপ ও বিশ্বভূ ত্রেতাযুগে, ক্রকুচ্ছন্দ ও কনকমুনি দ্বাপরে, এবং শাক্যসিংহ ও মৈত্রেয় কলিযুগে। অপর ১৭ জনকে তাঁহারা মানুষ বলুন আর নাই বলুন, শাক্যমুনি ও তাঁহার পূর্বেকার ছয় জনকে তাঁহারা মানুষ বলেন। তীর্থংকরদের মধ্যেও, অনেকে মনে করেন যে শেষ দুই জন মাত্র সত্যসত্য মানুষ, বাকিগুলি মনগড়া মাত্র। তাহা হইলেও আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, বুদ্ধ ও মহাবীরের পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে পরকাল লইয়া অনেক দিন হইতে নাড়াচাড়া হইতেছিল।

বুদ্ধদেবের সময়ে ছয়টি ধর্ম প্রচার হইয়াছিল, তাহাদের নাম যথা, আজীবক—ইহা গোশালা মংখালি পুত্রের ধর্ম, নিগ্রন্থ—ইহা মহাবীরের ধর্ম, পূর্ণ কাশ্যপ একজন ধর্মপ্রবর্তক, অজিত কেশকম্বল একজন, সঙ্গয় একজন ও পোকুদ কত্ত্যায়ন একজন।

এগুলিও ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলেই উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সেইখানেই ইহাদের শ্রীবৃদ্ধিও হইয়াছিল। ভারতবর্ষের পূর্বাংশে লোক যে কেবল ধর্ম লইয়াই থাকিত, এরূপ নহে; এখানে অন্যান্য বিষয়েও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ডাক্তার হর্নলি [A. F. R. Hoernle] বলেন যে অস্ত্রচিকিৎসা পূর্বাঞ্চলেই আরম্ভ হইয়াছিল। হস্তিশাস্ত্র এই দেশেই রচনা হয়। ন্যায়শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, সাংখ্যশাস্ত্র, ইহাদের উৎপত্তিও পূর্ব-ভারতে ; সুতরাং পূর্ব-ভারত যে এককালে একটি সুসভ্য দেশ ছিল, ইহা অনায়াসেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আর্যগণ যখন সেই সুসভ্য দেশ আক্রমণ করিয়া তাহার রাজ্য সমাজ আচার

ব্যবহার রীতিনীতি সব ভাঙিয়া তাহাদিগকে আর্য সভ্যতা দান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় উঠিতে লাগিল এবং সেই-সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে তাহাদের পূর্ব-সমাজ, পূর্ব-আচার ও পূর্ব-ব্যবহার বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাই এত ধর্ম হইল, শেষে সব ধর্ম উঠিয়া গিয়া এক বৌদ্ধধর্মই পূর্ব-ভারতে থাকিয়া পূর্ব-ভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষী দিতে লাগিল।

বৌদ্ধদিগের অনেক আচার-ব্যবহার আর্যগণের মধ্যে নাই। বৌদ্ধেরা সব মাথা কামায়—কোথাও এক গাছি কেশ রাখে না। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে মাথার মাঝখানে একটা শিখা রাখা নিতান্ত দরকার। একথা যে আমরাই বলিতেছি এমন নহে, যে-সকল মুসলমানেরা প্রথম বেহার দখল করেন তাঁহাদেরও আশ্চর্য বোধ হইয়াছিল। তাঁহারা বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম আছে জানিতেন না। একটা বৌদ্ধ-বিহার জয় করিয়া তাঁহারা দেখিলেন সেখানে বহু-সংখ্যক ব্রাহ্মণ রহিয়াছে, তাহাদের সব মাথা কামানো। সব মাথা কামানো হিন্দুর হইতেই পারে না ; তবে ইদানীং কোনো কোনো সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শিখা ত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের শিখাচ্ছেদের ন্যায় অবমাননা আর নাই। সেইজন্য ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ কোনো গুরুতর দুষ্কর্ম করিলে তাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবে। তাহার সম্পত্তি তাহার সঙ্গে দিবে, কেবল তাহার শিখাটি ছেদন করিয়া লইবে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সকলেরই শিখাচ্ছেদ করিতেই হইত।

আহার বৌদ্ধেরা বারোটার আগে করিবে। বারোটার এক মিনিট পরে আহার করিতে পারিবে না। আহার তাহাদের কিছুই অখাদ্য নহে। যদি তাহাদের আহারের উদ্দেশে মারা না হয়, অন্য কারণে কোনো জন্তু মারা হয়, তাহারা সে জন্তুর মাংস অনায়াসে খাইতে পারে। রাত্রে তাহারা রস খাইতে পারে, জল খাইতে পারে, কিন্তু শক্ত জিনিস খাইতে পারে না। তাহারা পেয় খাইতে পারে কিন্তু চর্ব চোষ্য লেহ্য খাইতে পারে না। এই তো তাহাদের নিয়ম। এটি কিন্তু আর্য নিয়মের বিরোধী। আর্যগণ এক সূর্যে দুইবার খাইতেন না। সুতরাং দিনে একবার ও রাত্রে একবার। তাঁহাদের কল্যবর্ত বা প্রাতরাশের কথা আমরা সর্বদা শুনিতে পাই। একবার খাইয়া আর্যগণ চব্বিশ ঘণ্টা থাকিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের ক্ষুধা সতেজ ছিল।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সোনা রূপা ছুঁইতে পারিতেন না। পূর্ব-ভারতে উহাদের ছোঁয়ার দরকার ছিল না। কারণ সোনা রূপার টাকা এদেশে অতি কমই ব্যবহার হইত। এদেশে কড়ির ব্যবহার অধিক চিল, সোনা রূপা ব্যবহার না করিলেও চলিত।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ উচ্চাসন মহাসন ত্যাগ করিতেন। হিন্দুস্থানে পাঞ্জাবে এমন-কি ভারতবর্ষের সব দেশেই খাটিয়ার উপর শোয়। মাটিতে শুইতে তাহাদের বড়োই কষ্ট হয়, পারতপক্ষে তাহারা মাটিতে শোয় না। কিন্তু বাংলায় তাহার বিপরীত। অধিকাংশ

লোকই ভূমিতে শয্যা পাতিয়া শোয়। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হইলে খাট চৌকি তক্তাপোষ ব্যবহার করে।

বৌদ্ধমতে মদ খাওয়া একেবারে নিষেধ। গৃহস্থ যাহারা পঞ্চশীল মাত্র গ্রহণ করিবে তাহারাও মদ খাইতে পারিবে না, একথা আর্যগণের পক্ষে খাটে না। তাঁহারা সোম পান করিতেন। সৌত্রামণিযাগে তাঁহারা সুরাপান করিতেন। পুরাণে বলে, পূর্বে সকলেই সুরাপান করিতেন, কিন্তু শুক্রাচার্য শাপ দেওয়ায় মদ খাওয়া মহাপাতকের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু বৈধ মদ্য সকল সময়েই চলিত, যথা পশুযাগে সোম, সৌত্রামণিতে সুরা।

এইরূপে দেখা যায় যে বৌদ্ধধর্ম ও আর্যধর্মে অনেক কাজের কথায়ই প্রভেদ। তখন বৌদ্ধধর্ম কোথা হইতে আসিল বলিতে গেলে, আর্যধর্ম হইতে আসিল একথা বলা যায় না, আর-কোনো দিক হইতে আসিয়াছে। এত প্রাচীনকালে আর কোন্ দিক হইতে আসিবে, সুতরাং পূর্ব দিক হইতেই আসিয়াছে। আচ্ছা যদি তাহাই হইল, তবে বুদ্ধদেব কী নূতন কথা বাহির করিয়াছেন? তাঁহার ধর্মের স্থূল কথাগুলি, বিষয়গুলি যদি প্রাচীন ধর্ম বা প্রাচীন সমাজ হইতে লওয়া, তবে তাঁহার নূতনত্ব কী? বুদ্ধদেবের পূর্বেও লোকে সংসার ত্যাগ করিত, ভিক্ষু হইত ; যেমন পার্শ্বনাথের দল, কনকমুনির দল। সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়া থাকিতে গেলেই অহিংসা, অস্তেয় প্রভৃতি শীল গ্রহণ করিতে হয়, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে খুব সাবধান হইতে হয়। প্রাচীন ভিক্ষুরাও তাহাই করিত। কিন্তু বুদ্ধদেব যে বিহার ও সংঘারামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের। ভিক্ষুদিগের শাসনের জন্য যে-সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের। এইরূপ অনেকগুলি ভিক্ষু একত্র থাকিলে তাহাদের মধ্যে কোনোরূপ গোলযোগ যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা তাঁহার নিজের। যে-সকল সুন্দর সুন্দর গল্প করিয়া তিনি সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন, সেগুলি প্রাচীন ভারতে চলিত থাকিলেও, যে আকারে তাহাদিগকে এখন দেখিতে পাওয়া যায় সে আকারটি তাঁহার দেওয়া। তিনি রাজার ছেলে, রাজা হইবার সবশিক্ষা তাঁহার হইয়াছিল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াও রাজার প্রধান যে গুণ, দশ জনকে লইয়া সুন্দররূপে কাজ চালানো, তাহা ছাড়েন নাই। ভিক্ষুসংঘের পরম উন্নতির জন্য, তাঁহার যেসব রাজগুণ ছিল, সব প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিকও তাঁহার সংঘ যেমন প্রবল হইয়াছিল এমন আর-কাহারো হয় নাই। তিনি যে শুদ্ধ ভিক্ষুদের বন্দোবস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে। তিনি গৃহস্থ বৌদ্ধদিগের জন্যও বেশ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের পঞ্চশীল ও অষ্টশীল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিন্তু যাহাতে বুদ্ধের ধর্ম এত বড়ো, যাহাতে বুদ্ধের নাম এত বড়ো, যাহার জন্য বুদ্ধের সংসারে এত সম্মান, যাহার জন্য সকল ধর্ম অপেক্ষা তাঁহার ধর্ম এত উদার, সেটি তাঁহার মধ্যমা প্রতিপৎ অর্থাৎ "মাঝামাঝি চলো, বাড়াবাড়ি করিও না।" তিনি

নৈরঞ্জনার ধারে ছয় বৎসর তপস্যা করিয়া যে জ্ঞান প্রাপ্ত হন, যাহা পাইয়া তিনি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া প্রচার করেন, যে জ্ঞান পাওয়ায় ইন্দ্র ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন, যাহা পাওয়ায় মার একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে, সে এই মধ্যমা প্রতিপৎ। মাঝামাঝি চলো। অহিংসা ধর্ম পালন করিতে হইবে বলিয়া, একেবারে মুখে কাপড় বাঁধিয়া চলো যেন কোনো কীট মুখে না ঢুকিতে পারে। রাত্রে প্রদীপ জ্বালিও না, পাছে তাহাতে কীট পতঙ্গ পড়ে। মলত্যাগ করিয়া তাহা কাঠি দিয়া নাড়িয়া দিও যেন পোকামাকড় তাহার মধ্যে শুকাইয়া না যায়। রাস্তায় চলিবার সময় এক গাছা ঝাঁটা হাতে করিয়া যাইও যেন তোমার পায়ের চাপনে কোনো পোকামাকড় মারা না যায়। এ-সকল বাড়াবাড়ি নয় কি? বুদ্ধদেব এতদূর বাড়াবাড়ি করিতে বলেন না। তিনি বলেন ইচ্ছা করিয়া কোনো জীবহত্যা করিও না। তাহা হইলেই অহিংসা ধর্ম পালন হইবে। তিনি বলেন অত্যন্ত ভোগাসক্তি ভালো নয় ; কেবল ভালো খাব, ভালো পরব, তারি চেষ্টা করা, সেটা ভালো নয়, আবার ক্রমাগত উপবাস করিব, পঞ্চতপা করিব, চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া দিন কাটাইয়া দিব, ইহাও ভালো নয়। তিনি নিজে যথেষ্ট কঠোর ব্রত করিয়াছিলেন, যথেষ্ট উপবাস করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে বুঝিয়াছিলেন যে উহাতে কোনো লাভ নাই, শরীরের কষ্টই সার ; তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে এগুলা করা ভালো নয়। ভোগও করিবে না, কঠোরও করিবে না, তবে করিবে কী? অশ্বঘোষ বুদ্ধের মুখে বলাইয়াছেন, "আহারঃ প্রাণযাত্রায়ৈ ন ভোগায় ন দৃপ্তয়ে।" এই যে মধ্যমা প্রতিপৎ এইটিই বৌদ্ধধর্মের মজ্জা, সার, নিগূঢ় কথা, উপনিষৎ। বুদ্ধদেব যতদিন জীবিত ছিলেন, সর্ব বিষয়ে মধ্যমা প্রতিপৎ অবলম্বন করিয়াই চলিতেন, শিষ্যদিগকে শিখাইতেন। দুটা বিরোধী জিনিস উপস্থিত হইলে, সে দুটার বিরোধ মিটাইয়া দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

'নারায়ণ', ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২১

হীনযান ও মহাযান

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, হীনযান ও মহাযানে প্রভেদ কী? হীনযান কাহাকে বলে, মহাযানই বা কাহাকে বলে? কেনই বা হীনযানকে 'হীন' বলে, আর মহাযানকে 'মহা' বলে? আগে যাহা যাহা লিখিয়াছি তাহাতে অনেক জায়গায়ই এই তফাৎ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এবার যতদূর পারি পরিষ্কার করিয়া সেই তফাতই দেখাইব।

হীনযান বলিয়া কোনো যান নাই। মহাযানেরা আগেকার বৌদ্ধদের হীনযান বলিত। যেহেতু তাহারা 'মহা', সুতরাং তাহাদের আগেকার যাহারা, তাহারা 'হীন' অর্থাৎ ছোটো। আগে কিন্তু দুটি যান ছিল— ১. প্রত্যেকবুদ্ধযান বা প্রত্যেকযান আর ২. শ্রাবকযান। বুদ্ধদেবও প্রত্যেকবুদ্ধযান স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যখন

পৃথিবীতে কোনো বুদ্ধ উপস্থিত নাই, তাঁহার মুখ হইতে ধর্মকথা শুনিবার কোনো সুবিধা নাই, তখনো লোকে আপনার চেষ্টায়, আপনার যত্নে ও আপনার উদ্যমে জন্মজরামরণাদির হাত হইতে অব্যাহত পাইতে পারে। হিন্দুদের ঋষিরা এইরূপে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এইরূপে যাহারা নিজের যত্নে, বুদ্ধের সাহায্য না পাইয়া, উদ্ধার হয়, তাহাদিগকে প্রত্যেকবুদ্ধ বলে ; তাহাদের যে যান তাহার নাম প্রত্যেকবুদ্ধযান। এই প্রত্যেকবুদ্ধেরা আপনিই উদ্ধার হইতে পারে, আর-কাহাকেও উদ্ধার করিবার শক্তি ইহাদের নাই।

বুদ্ধের মুখে ধর্মকথা শুনিয়া যাহারা ধর্মজ্ঞান লাভ করে, তাহাদের নাম 'শ্রাবক'। বুদ্ধের পরামর্শ লইয়া অনেক শ্রাবক উদ্ধার হইয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে 'শ্রাবক' হন, তাহার পর 'ভিক্ষু' হন, বিহারে বাস করেন। অনেক দিন বিহারে থাকিতে থাকিতে 'স্রোতাপন্ন' হন. 'সকৃতাগামী' হন, 'অনাগামী' হন, পরে 'অর্হৎ' হইয়া যান। ইঁহারাও জন্মজরামরণাদি হইতে অব্যাহতি পান, কিন্তু ইঁহারাও কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারেন না। ইঁহাদের যে যান, তাহার নাম 'শ্রাবকযান'। বুদ্ধ নির্বাণ পাইলে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য হইতে যাঁহারা ধর্মকথা শোনেন, তাঁহারা পর-পর জন্মে ধার্মিক বৌদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু আবার না যতদিন বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব হয়, ততদিন তাঁহাদের মুক্তি পাইবার উপায় নাই। এমনও অনেক জায়গায় শোনা যায় যে, একজন বুদ্ধের শ্রাবক অনেক জন্মের পর আর-একজন বুদ্ধের কাছে উদ্ধার হইলেন।

মহাযানের লোকেরা বলিত 'প্রত্যেক' ও 'শ্রাবক' এই দুই যানই হীন, কারণ ইহারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্বার্থপর। আপনার উদ্ধার হইলেই হইল, ইহারা জগতের কথা ভাবে না, ইহাদের কাছে যেন জগৎ নাই, তাই মহাযানেরা ইহাদিগকে 'হীন' বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। আপনাদিগকে মহাযান বলে, যেহেতু তাহারা আপনার উদ্ধারের জন্য তত ভাবে না, জগৎ উদ্ধারই তাহাদের মহাব্রত। পূর্বেই বলিয়াছি 'অবলোকিতেশ্বর' উদ্ধার হন-হন, মহাশূন্যে বিলীন হন-হন, এমন সময়ে জগতের সমস্ত প্রাণী তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনি নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে কে আমাদের উদ্ধার করিবে? তাই শুনিয়া 'অবলোকিতেশ্বর' প্রতিজ্ঞা করিলেন, একটিও প্রাণী যতক্ষণ বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্বাণে প্রবেশ করিব না। এই যে করুণা, সর্বভূতে দয়া, ইহাই মহাযানকে 'মহা' করিয়া তুলিয়াছে, আর ইহারই তুলনায় অপর দুই যানই হীন হইয়া গিয়াছে।

হীনযান অর্হত্ব পাইলেই খুশি, মহাযান তাহাতে খুশি নয়—তাহারা বুদ্ধত্ব চায়। এ দুয়ে তফাত কী? অর্হৎও নির্বাণ পাইলেন, বুদ্ধও নির্বাণ পাইলেন। উভয়েই জন্মজরামরণের হাত হইতে উদ্ধার পাইলেন। উভয়েরই বোধিজ্ঞান লাভ হইল। তবে ইঁহাদের মধ্যে প্রভেদ কী? অর্হতেরা হীনযান হইলেন, আর বুদ্ধ মহাযান হইলেন কেন? বুদ্ধ যখন বোধগয়ায় অশ্বত্থ গাছের তলায় সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিলেন এবং

তৎক্ষণাৎ নির্বাণ লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন, সেই সময় ব্রহ্মা ও ইন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি এখন নির্বাণ লাভ করিলে মগধের গতি কী হইবে? মগধ যে অধর্মের ভারে ডুবিতে বসিয়াছে। তাঁহাদের কথায় বুদ্ধ স্বীকার করিলেন যে তিনি মগধের উদ্ধারের জন্য বহুকাল বাঁচিয়ে থাকিবেন। তাই তিনি কাহারো মতে পঁয়তাল্লিশ, কাহারো মতে একচল্লিশ বৎসর ধর্মপ্রচার করেন ও আশি বৎসর বয়সে নির্বাণ লাভ করেন। তিনি পরের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন—তাই তিনি 'বুদ্ধ', আর তাঁহার শিষ্যেরা নিজেরাই উদ্ধার হইতেন—তাই তাঁহারা 'অর্হৎ'।

যখন মহাযান প্রচার হইতে লাগিল, তখন শ্রাবকযানেরা বলিল, এ কী? বুদ্ধ তো এ ধর্ম প্রচার করেন নাই, এরূপ ব্যাখ্যা তিনি করেন নাই। পালিতে তাঁহার যে-সকল উপদেশ আছে, তাহাতেও তো এ সকল কথা বলে না। এ একটা নূতন মত প্রচার হইতেছে, ইহা বুদ্ধের মত নহে। তখন মহাযানেরা বলিল, বুদ্ধ ঠিকই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তোমরা বুঝ নাই। বুদ্ধদেব নিজে কী করিয়াছিলেন? তিনি তো মগধের উদ্ধারের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। তোমরা তো তাহা কর নাই, সুতরাং তোমরা তাঁহার কথার মর্ম বুঝ নাই। তোমরা বুদ্ধের অক্ষরার্থ গ্রহণ করিয়াছ, তাঁহার কথার সোজাসুজি মানে করিয়া লইয়াছ, তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পার নাই। তাই তিনি পরের উদ্ধারের জন্য যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাই তোমরা আপনার উদ্ধারের পথ বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছ। ইহাতে শ্রাবকযান উত্তর করিল, বা! তা কি কখনো হয়—'পরার্থে' কি উপদেশ হয়? উপদেশটা 'স্বার্থে'ই হয়, সেটা 'পরার্থে' গিয়াই দাঁড়ায়। আমি তোমার উদ্ধারের জন্য উপদেশ দিলাম, তুমি উদ্ধার হইলে। আমার এ উপদেশটা কি 'স্বার্থে' উপদেশ হইল? আমি তো তোমায় উদ্ধার করিয়া দিলাম, 'পরার্থে'ই উপদেশ দিলাম। এইরূপে রামের 'স্বার্থ', হরির 'স্বার্থ', শ্যামের 'স্বার্থ' হইতে হইতে সেই 'স্বার্থ'ই তো 'পরার্থ' হইয়া দাঁড়াইল। তবে তুমি আর 'পরার্থ' 'পরার্থ' বলিয়া একটা কী জাঁক করিতেছ? মহাযান বলিলেন, আমরা উহাকে 'পরার্থ' বলিতেছি না। তোমার উপদেশ যদি তোমার শিষ্যের স্বার্থের জন্যই হয়, সেটা 'স্বার্থোপদেশ' হইল। তুমি তো আর তোমার শিষ্যকে পরের উদ্ধারের জন্য উপদেশ দিতেছ না। তুমি সকলকেই উপদেশ দিতেছ, বাপু আপনার আপনার পথ দেখো। তুমি তো আর তাহাকে বলিয়া দিতেছ না, বাপু জগৎ উদ্ধার করো। তুমি সম্বোধি পাইলে বটে, কিন্তু 'অনুত্তরসম্বোধি' তুমি কী করিয়া পাইলে? যাহার চেয়ে আর বড়ো সম্বোধি নাই, সেই সর্বোচ্চ সম্বোধি তুমি পাইলে কই?

আর-এক কথা—তুমি তো বাপু আপনার লইয়াই ব্যস্ত; তোমার শিষ্যেরাও আপনার লইয়া ব্যস্ত; তাহার শিষ্যেরাও আপনার লইয়াই ব্যস্ত। তোমরা তো সকলেই অর্হৎ হইতে চলিলে, তোমাদের ভিতর বুদ্ধ হইবে কে? তোমাদের শ্রাবকযান তো কিছুতেই

বুদ্ধ হইবার উপায় হইতে পারে না। কারণ তোমরা চাহ অর্হৎ হইতে ; তোমরা বুদ্ধ হইবার উপায় জান না; তোমরা দুগ্ধ খাইতে চাও কিন্তু গোরুর বাঁট চেন না। শুনিয়াছ গোরু দুহিলেই দুধ হয়, তাই শিং ধরিয়া টানিতেছ—তাহাতে দুধ পাইবে কিরূপে? তোমরা 'স্বার্থোপদেশ' দিতেছ, তোমরা 'পরার্থোপদেশ' জান না— কেমন করিয়া বুদ্ধ হইবে? তোমরা মহাযানের মর্ম জান না, তোমরা হীনযানই থাকিবে।

তোমরা অর্হৎ হইতে চাও, 'বোধিসত্ত্ব' কাহাকে বলে তাহা তোমরা জান না। তোমরা জান বুদ্ধ এককালে বোধিসত্ত্ব ছিলেন, আর মৈত্রেয় একজন বোধিসত্ত্ব আছেন, তিনি একদিন বুদ্ধ হইবেন। তোমরা বোধিসত্ত্ব হইতে চাও না। বোধিসত্ত্ব হইতে গেলে, তাহাকে বুদ্ধ কী উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা তোমরা জান না, পড় না, হয় তো কেয়ারও কর না। কিন্তু বোধিসত্ত্ব হইবার উপদেশও তো বুদ্ধদেব দিয়া গিয়াছেন। কারণ বোধিসত্ত্ব না হইলে তো একেবারে বুদ্ধ হইবার জো নাই। একথা তো তিনিও বলিয়া গিয়াছেন। সে উপদেশের 'আশয়' অতি উচ্চ ; তাহার উপদশেও অতি উচ্চ; তাঁহার জন্য শিক্ষা অতি উচ্চ ; তাহার জন্য সাধনা অতি উচ্চ ; অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ ; তাহার জন্য যে-সকল সামগ্রী আবশ্যক, তাহা অতি দুর্লভ ; তাহার জন্য কত জন্ম যে সাধনা করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তোমাদের কী? তোমাদের আকাঙ্ক্ষা অতি অল্প, উপদেশ সহজ, সাধনা সহজ, সামগ্রী অল্প ও সুলভ। আর কালের কথা বলিতে চাও—তোমরা তো তিন জন্মেই আপনার কার্যসিদ্ধি করিয়া লইতে পার। এই-সকল কারণেই আমরা তোমাদের 'হীন' বলি। এখন বুঝিয়া দেখো দেখি, তোমরা 'হীন' কিনা? আর আমাদের আকাঙ্ক্ষা কত বড়ো, আমরা বুদ্ধ হইব ; আমাদের উপদেশ কত বড়ো, আমরা জগৎ উদ্ধার করিবার উপদেশ দিই; আমাদের সাধনা কত উচ্চ, আমরা একাই জগৎ উদ্ধার করিব, এই আমাদের সাধনা ; আমাদের সামগ্রী ব্রহ্মাণ্ডময়, আর আমরা যত জন্মই যাউক না, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হইলে কিছুতেই বিরত হইব না। দেখো দেখি, আমাদের যান মহাযান কিনা? দেখো দেখি, তোমাতে আমাতে কত তফাত?

শ্রাবকযান বলিতেছেন— তোমার বুদ্ধবচনের উপর বড়োই আদর দেখিতেছি, কিন্তু বুদ্ধবচন হইতে গেলে 'সূত্রে' তো থাকা চাই, 'বিনয়ে' তো থাকা চাই, 'অভিধর্মে'ও তো থাকা চাই। এই লইয়াই তো 'ত্রিপিটক'। ত্রিপিটকের বাহিরে তো বুদ্ধবচন নাই। তোমাদের এসব কোথায়? তোমরা তো বলিয়া বেড়াও কোনো ধর্মেরই 'সত্তা' নাই— 'স্বভাব' নাই। তোমাদের মতে তো সবই অভাব—সবই শূন্য। এ-সকল বুদ্ধবচন হইল কিরূপে? তাহার উত্তরে মহাযান বলিতেছেন—কেন আমাদের তো শত শত সূত্র রহিয়াছে। এক প্রজ্ঞাপারমিতাই তো সকল সূত্রের রাজা, তাহার পর আরো কত সূত্র আছে। বিনয়ের কথা বলিতে চাও—বোধিসত্ত্বের বিনয়—সে অতি বড়ো। বিনয়ের

উদ্দেশ্য তো ক্লেশনাশ, সমস্ত বিকল্পই ক্লেশ। এই যা-কিছু চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি—সমস্তই 'বিকল্প'। যখন 'পরমার্থ সত্য' জানিতে পারিব, সমস্ত বিকল্প নাশ হইয়া যাইবে। যখন নির্বিকল্প হইয়া যাইব, তখনই আমাদের বিনয়ের চূড়ান্ত হইবে। আমাদের 'বিনয়' ছোটোখাটো কথা লইয়া ব্যস্ত থাকে না ; আমাদের বিনয়ের উদারতা ও গভীরতা তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধির অতীত। আর অভিধর্মের কথা বলিতেছ—অভিধর্ম তো ধর্ম লইয়া। আমাদের ধর্ম 'অনুত্তরসম্যক্‌সম্বোধি' প্রাপ্তি। সুতরাং আমাদেরও 'সূত্র'ও আছে, 'বিনয়'ও আছে, 'অভিধর্ম'ও আছে।

শ্রাবকযানে সর্বপ্রথম 'ত্রিশরণ'গমন, তাহার পর 'পঞ্চশীল'গ্রহণ। এ দুটি জিনিস গৃহস্থরাও করিত, ভিক্ষুরাও করিত। ইহার পর 'অষ্টশীল'গ্রহণ অর্থাৎ ঐ পাঁচের উপর আরো তিন, স্রক্‌চন্দনাদি ত্যাগ, রূঢ়বাক্যপ্রয়োগ ত্যাগ, গীতবাদিত্রাদি ত্যাগ। অর্থাৎ ফুলের মালা গলায় দিবে না, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য মাখিবে না, মোটামুটি বিলাসদ্রব্য সব ত্যাগ করিবে। কাহাকেও রূঢ় কথা কহিবে না, কাহাকেও গালাগালি দিবে না, অর্থাৎ জিহ্বা সংযম করিবে এবং গান বাজনা প্রভৃতি করিয়া সময়ক্ষেপ করিবে না। এই যে তিনটি শীল, ইহা খুব উচ্চ ভক্ত গৃহস্থের জন্য। গৃহস্থ ইহার উপর আর যাইতে পারিবে না। ইহার উপর আর দুটি শীল দিলে দশ শীল হয়। সে দুটি উচ্চাসন-মহাসন-ত্যাগ ও কাঞ্চনত্যাগ অর্থাৎ পয়সা কড়ি হাতে করিবে না। এ দুটি শীল শুধু ভিক্ষুদিগের জন্য, গৃহস্থের ইহাতে অধিকার নাই। এ দশ শীল ছাড়া শ্রাবকযানের আর-একটা বড়ো জিনিস 'পোষধ'ব্রত, অর্থাৎ উপোস করা। দুই অষ্টমীতে, দুই চতুর্দশীতে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপোস করিয়া কেবল ধর্মকথা শুনিবে। সেইদিন গৃহস্থ ও ভিক্ষু সবাই বিহারে আসিয়া ধর্মচর্চা করিবে।

মহাযানে আমরা ত্রিশরণগমনের কথা খুব পাই। শীলরক্ষার কথাও পাই। কিন্তু 'পোষধ'ব্রতের কথা বড়ো একটা পাই না। শীলরক্ষাটা শ্রাবকেরা যত বড়ো বলিয়া মনে করেন, বোধিসত্ত্বেরা তত বড়ো বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ধর্ম আর-একরূপ ; তাঁহারা 'শরণ'-গমনের পরই কিসে বোধিলাভের জন্য একান্ত আগ্রহ জন্মে, তাহারই চেষ্টা করেন—ইহারই নাম 'চিত্তোৎপাদ' বা ' বোধিচিত্তোৎপাদ'। 'বোধি-চিত্তোৎপাদে'র পর আর-দুইটি কথা শুনিতে পাই—'পাপদেশনা' ও 'পুণ্যানুমোদনা', অর্থাৎ পাপ কাহাকে বলে তাহার উপদেশ ও পুণ্যের প্রতি আসক্তি। ইহার পর তাঁদের 'ষট্‌পারমিতা'। পারমিতা শব্দের অর্থ লইয়া বড়ো গোলযোগ আছে ; অনেকে ইহার অর্থ করেন 'পারং ইতা' অর্থাৎ যে পারে গিয়াছে অর্থাৎ যে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয়, এরূপ ব্যাখ্যা করিলে ব্যাকরণ থাকে না। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' ব্যাকরণদুষ্ট নহে, যেহেতু 'পারমিতা'ও স্ত্রীলিঙ্গ, 'প্রজ্ঞা'ও স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু 'শীলপারমিতা' কী করিয়া হইবে? 'শীল,' ক্লীবলিঙ্গ, 'পারমিতা' স্ত্রীলিঙ্গ। শীলপারমিতা শব্দটি

ব্যাকরণদুষ্ট হইল। যদি বলো বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা ব্যাকরণের বন্ধনের মধ্যে যাইতে চাহেন না, তাহা হইলে এ ব্যাখ্যা চলিতে পারে। কিন্তু আর এক ব্যাখ্যাও আছে—মিশ্রভাষায় পরমস্য ভাবঃ—'পারম্যং' শব্দটি 'পারমি' হইয়া যায়। বৌদ্ধ-সংস্কৃতেও 'পারমি' শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। তাহার উপর ভাবে 'তা' করিলে, পারমিতা হয়। অর্থ হয়—পরমের ভাব, সর্বোৎকৃষ্টের ভাব। তাহা হইলে দানপারমিতা, শীলপারমিতা, প্রজ্ঞাপারমিতার অর্থ হয়—সর্বোৎকৃষ্ট দানের ভাব, সর্বোৎকৃষ্ট শীলের ভাব ইত্যাদি। ইহাতেও একটু দোষ হয়, উপরি উপরি দু বার ভাব প্রত্যয় হয়—তাহা রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এরূপ প্রয়োগ দু-চারটা দেখা যায়। বোধিসত্ত্বগণ শীলরক্ষার জন্য বড়ো ব্যস্ত হইতেন না, অথবা সেটা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধই হইয়া যাইত। তাঁহারা শীলের চরম উৎকর্ষ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেন। এই জায়গায় মহাযান ও হীনযানে বড়োই তফাত দেখা যায়। হীনযানে 'বিরত' হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা হইত, "আমি প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইব, মিথ্যা কথা হইতে বিরত হইব।" বোধিসত্ত্বেরা যেন আপনা আপনিই তাহাতে বিরত ছিলেন—তাঁহারা সেই শীলের কিরূপে চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা করিতেন। হীনযানের শিক্ষা নিষেধমুখে, মহাযানের উপদেশ বিধিমুখে। হীনযানের যেন জীবনীশক্তি কম, নাই বলিলেই যেন হয়। এটা করিও না, ওটা করিও না—চুপ করিয়া থাকো। মহাযানের এই জীবনীশক্তি বড়ো বেশি। তাঁহাদের একটি পারমিতার নামই 'বীর্য', অর্থাৎ বীরত্ব অর্থাৎ উৎসাহ। শীলরক্ষা করিয়া যাইব, ক্রমে এমন হইয়া উঠিবে যে আমি শীলরক্ষায় সকলের উপর উঠিব এবং অন্যে যাহাতে শীলরক্ষা করিতে বা জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিব। হীনযানে 'বীর্য' শব্দটিই নাই। মহাযানে উহা একটি পারমিতার মধ্যে। শুধু সামান্য উৎসাহ নহে ; এমন উৎসাহ যে উহা হইতে আর বেশি কল্পনা করা যায় না।

শ্রাবকযানে চারিটি ধ্যানের কথা খুব শুনা যায়। চারিটি ধ্যানের নাম পাওয়া যায় না। একটিতে বিতর্ক থাকে, আর-একটিতে থাকে না। একটিতে প্রীতি থাকে আর-একটিতে থাকে না। একটিতে সুখ থাকে আর-একটিতে থাকে না। যাহাতে সুখও থাকে না সেইটিই চরম ধ্যান। তাহার পর ভিক্ষু ক্রমে 'স্রোতাপন্ন', 'সকৃতাগামী' ও 'অনাগামী' হইয়া পরে অর্হৎ হন। মহাযানে ধ্যানের কথা আছে, এ চারিটি ধ্যানের কথাও আছে, কিন্তু ইহা ছাড়াও অসংখ্য ধ্যান ও সমাধির কথাও আছে। ধ্যান ও সমাধি লইয়া তাঁহাদের অনেক পুস্তক আছে। স্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ এ-সকল শব্দ মহাযানে পাওয়া যায় না। ইহার বদলে পাওয়া যায় 'দশ বোধিসত্ত্ব ভূমি' অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব যেমন ধ্যান, ধারণা, দান, শীল, ক্ষান্ত ইত্যাদিতে ক্রমে দক্ষ হইতে থাকেন, তাঁহার মনোবৃত্তি সকলও সেইরূপ ক্রমে উচ্চে উঠিতে থাকে। মানুষের মনোবৃত্তি অনন্ত। প্রথম ভূমিতে কতকগুলি থাকে, কতকগুলি ত্যাগ করা হয় এবং

কতকগুলি প্রবল হইয়া উঠে। দ্বিতীয় ভূমিতে আবার কতকগুলি আসে, প্রথমের কতকগুলি, হয় একেবারে চলিয়া যায়, নয় তো হীনবীর্য হইয়া পড়ে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বোধিসত্ত্ব দশটি ভূমি অতিক্রম করিলে তবে তিনি নির্বাণপথের যথার্থ পথিক হইতে পারেন। যে করুণার নাম পর্যন্ত শ্রাবকযানে দেখা যায় না, সেটি বোধিসত্ত্বের চিরসহচর, যতই উচ্চ ভূমিতে উঠিবেন ততই করুণা প্রবল হইতে থাকিবে।

পাঁচটি পারমিতায় দক্ষতালাভ করিলে তাহার পর 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। 'প্রজ্ঞাপারমিতা'ই আসল পারমিতা। একজন গ্রন্থকার বলিয়াছেন, প্রজ্ঞাপারমিতা ছাড়িয়া দিলে অন্যান্য পারমিতা-সকল পারমিতা নামই লাভ করিতে পারে না। কিন্তু শুধু প্রজ্ঞাপারমিতাও ঠিক নহে। অপর পাঁচের সহিত প্রজ্ঞাপারমিতা মিলিত হইলে পূর্ণ পারমিতা হয়। প্রজ্ঞাপারমিতার মোট কথা এই যে, সত্য দুই প্রকার—সাংবৃত সত্য ও পরমার্থ সত্য। সাংবৃত সত্য—ব্যবহারিক সত্য। আমরা চারি দিকে যে-সকল জিনিস দেখিতে পাই সেগুলিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া না লইলে ব্যবহার চলে না ; তাই সেগুলিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু বিশেষ রূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাহার একটিও সত্য নহে। পরমার্থ সত্য কখনোই অন্যথা হয় না, সে চিরকালই সত্য থাকে, সেটিকে মহাযানেরা শূন্য বলেন।

হীনযান ত্রিশরণগমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহাযানেরও ত্রিশরণগমণের ব্যবস্থা আছে। ত্রিশরণগমণের মন্ত্র দুই যানেই এক, তবে মহাযানে ত্রিরত্ন, বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ নহে, ধর্ম বুদ্ধ ও সংঘ। বুদ্ধকে প্রথম স্থান হইতে নামাইয়া দ্বিতীয় স্থানে দিবার অর্থ এই যে, মহাযান বুদ্ধ হইতে ধর্মকে প্রধান বলিয়া মনে করেন। মহাযানে শাক্যমুনির অবস্থা একটু শোচনীয়—তিনি একটি 'মানুষী'বুদ্ধ। মানুষীবুদ্ধদের মধ্যেও তাঁহার স্থান সাতের দাগে। এখনকার মহাযানেরা বলেন যে, হিন্দুদের ব্যাস যেমন সব জিনিস কলমবন্দি করিয়া গিয়াছেন, আমাদের শাক্যসিংহও তেমনি মাত্র কলমবন্দি করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মত, আমাদের ধর্ম আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা মত চালাইয়াছেন, তাঁহারা 'ধ্যানীবুদ্ধ'। 'অমিতাভ' একজন 'ধ্যানীবুদ্ধ'। মহাযানে তাঁহার প্রভাব খুব অধিক। জাপানে তাঁহার খুব উপাসনা হয়। বৈরোচন আর-একজন বড়ো 'ধ্যানীবুদ্ধ'। ক্রমে মহাযানেরা শেষ অবস্থায় পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধ মানিত। নেপালের স্বয়ম্ভূক্ষেত্রে স্বয়ম্ভূচৈত্যের চারিদিকে এই পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধের মন্দির আছে। সেখানে শাক্যসিংহের স্থান নাই দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কোথায়?" আমার সঙ্গে যে বজ্রাচার্য ছিলেন তিনি আমাকে চৈত্য হইতে কিছু দূরে লইয়া গিয়া, পূর্বে নিচু হইতে পাহাড়ে উঠিবার যে পথ ছিল, তাহারই উপরে শাক্যসিংহের প্রতিমা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "তিনি এইখানে আছেন, তিনি পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের একপ্রকার দ্বারপাল। আমরা তাঁহাকে মানি, যেহেতু তিনি আমাদের সব জিনিস কলমবন্দি করিয়া দিয়াছেন।"

বুদ্ধ অপেক্ষা ধর্ম মহাযানে বড়ো। স্তূপ বা চৈত্যই ধর্ম। সেই চৈত্যের গায়ে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মন্দির, সুতরাং ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধের কী সম্পর্ক তাহা এইখানেই বুঝা গেল। নেপালের মহাযানদিগের মধ্যে সংঘ বলিতে গেলে এক বিহারে যতগুলি ভিক্ষু থাকে তাহাদিগকে বুঝায় ; কিন্তু উহারা বলে সংঘ ক্রমে বোধিসত্ত্বে পরিণত হইয়াছে।

পূর্বে যাহা ধর্ম বুদ্ধ ও সংঘ ছিল, মহাযান খুব বাড়িয়া উঠিলে তাহাই হইল প্রজ্ঞা উপায় ও বোধিসত্ত্ব। ধর্ম হইলেন প্রজ্ঞা, একথা বুঝানো কঠিন নহে। কারণ বৌদ্ধেরা, বিশেষ মহাযানেরা, ঘোর জ্ঞানবাদী। তাহারা ভাবে জ্ঞানই মুক্তি। ধর্ম যদি জ্ঞান হইলেন, তবে বুদ্ধ কী হইলেন? তিনি হইলেন—উপায়। তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া, তাঁহার উপদেশ লইয়া, বাস্তবিক তাঁহাকে উপায় করিয়া, আমরা জ্ঞান পাইতে পারি। প্রজ্ঞা ও উপায় যখন ধর্ম ও বুদ্ধের স্থান অধিকার করিলেন, তখন বিহারবাসী ভিক্ষুরা তো আর সংঘ হইতে পারেন না, তখন সংঘ আর-একটা কিছু উঁচু জিনিস হওয়া চাই। তখন সংঘ হইলেন—বোধিসত্ত্ব।

এইরূপে আমরা হীনযান ও মহমাযান যতই তুলনা করি, ততই দেখিতে পাই, ততই আমাদের মনে হয়, যে হীনযান ধর্মনীতি ও সমাজনীতি লইয়া ব্যস্ত, আর মহাযান দার্শনিক মত লইয়া ব্যস্ত ও পারমিতা লইয়া ব্যস্ত। স্বভাবচরিত্র বিশুদ্ধ হইলে, মানুষ পৃথিবীর বস্তু ছাড়িয়া কোনো উচ্চতর বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিলে নিশ্চয়ই বড়ো হয়। হীনযান মানুষকে সেইরূপ বড়ো করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মহাযান তাহাতে তৃপ্ত হইতেন না। তাঁহারা মানুষকে সর্বময় সর্বনিয়ন্তা করিবার চেষ্টা করিতেন। দর্শনে তাঁহারা শূন্যবাদী, নীতিতে তাঁহারা করুণাবাদী। তাই তাঁহারা আপনাদিগকে বড়ো বা 'মহা' মনে করিতেন ও শ্রাবক ও প্রত্যেকযানকে 'হীন' বা ছোটো মনে করিতেন।

'নারায়ণ', আষাঢ়, ১৩২২

মহাযান কোথা হইতে আসিল?

অনেকেই মনে করেন যে নাগার্জুনই মহাযান মত চালাইয়া দেন। তাঁহার 'মাধ্যমকবৃত্তি' মহাযানের প্রথম গ্রন্থ। তিনিই পাতাল হইতে 'প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র' উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহারই শিষ্য আর্যদেব এই মত চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। চীনেরা বলে, "আর্যদেব অধ্যাত্মবিদ্যার চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন।" এই দুইজনই মহাযানের আদিগুরু। কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে বোধ হইবে নাগার্জুনের পূর্ব হইতেই মহাযান মত চলিতেছিল। নাগার্জুনের দুই পুরুষ পূর্বে অশ্বঘোষ 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র' নামে এক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ' মহাযান মতে ভরপুর। 'শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র' তর্জমা করিতে করিতে জাপানি পন্ডিত সুজুকি বলিয়াছেন অশ্বঘোষেরও পূর্বে মহাযান মত চলিত। 'লঙ্কাবতার' প্রভৃতি তিনখানি মহাযানসূত্র

অশ্বঘোষের পূর্বেও চলিত ছিল; সুতরাং মহাযানের আদি ঠিক বলিয়া উঠা কঠিন। বৌদ্ধেরা বলে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। স্থবিরেরা, বুদ্ধদেব যেরূপ বিনয়ের বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে একচুল তফাত হইতে চাহিত না, কিন্তু যাহাদের বয়স অল্প, তাহারা অনেক বিষয়ে স্থবিরদিগের মতে চলিত না। বুদ্ধদেবের কঠিন শাসন ছিল। বারোটার পর কেহ আহার করিবে না। তাহারা বলিত এক-আধ ঘন্টা পরে খাইলে দোষ কী? বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগের কিছুই সঞ্চয় করিতে দিতেন না। তাহারা বলিত শিংয়ের ভিতর যদি একটু লুন সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়, তাহাতে কী দোষ হইতে পারে। এইরূপে দশটি বিষয় লইয়া স্থবিরদিগের সহিত তাহাদের মতের অনৈক্য হয়। এইরূপ অনৈক্য হওয়াতে যাঁহারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁহারা একটি সভা করিয়া এ-সকল বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে চান। বৈশালীতে এক মহাসভা হয়। এই সভায় কিছুই মীমাংসা হইল না, কিন্তু অধিকাংশ বৌদ্ধ স্থবিরের দল হইতে পৃথক হইয়া পড়িল। বৌদ্ধদিগের মধ্যে দুই দল হইল, স্থবিরবাদ বা থেরাবাদ ও মহাসাংঘিক। একে তো মহাসাংঘিকদিগের দলে লোক অধিক ছিল, তার পর আবার তাহাদের বয়স অল্প, উহারা মহা-উৎসাহে আপনাদের মত প্রচার করিতে লাগিল। উহারা প্রথম হইতেই লোকোত্তরবাদী হইল। অর্থাৎ বুদ্ধদেব সামান্য মানুষ ছিলেন না, তিনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেও জগৎব্যাপ্ত হইয়া আছেন, যখন তাঁহার মত চলিতেছে, যখন তাঁহার মতে লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীতে আপনার জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, আপনাদিগের আচার-ব্যবহার স্থির করিয়া লইতেছে, তখন তিনি শুধু মরিলে কী হইল? তাঁহার একটা অলৌকিক অনির্বচনীয় অস্তিত্ব আছেই। লোকোত্তরবাদীরা যতই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দার্শনিক মত বাহির করিতে লাগিল, স্থবিরবাদীরা ততই বিনয় সম্বন্ধে বেশি কড়া হইতে লাগিল। দুই দলে যে আর-কখনো মিল হইবে, তাহার আর সম্ভাবনা রহিল না। অশোকরাজার সময়ে পাটলিপুত্রে যে মহাসভা হয়, তাহাতে মহাসাংঘিকেরা কেহই স্থান পায় নাই। সকল বৌদ্ধেরা সে সভাকে সভা বলিতেই প্রস্তুত নহে। মহাসাংঘিক ও মহাযানদিগের মতে সে সভার কোনো অস্তিত্বই নাই। অশোকরাজা স্থবিরবাদীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সময়ে এই মতই অনেক স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। তিনি সিংহলে বৌদ্ধধর্মের অধিক পরিমাণে প্রচার করেন, সুতরাং সিংহলে স্থবিরবাদ চলিয়া যায় ও এখনো চলিতেছে। মগধ ও বাংলায় এই মতেরই লোক অধিক ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যভাগে অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি স্থানে এবং পাঞ্জাবে মহাসাংঘিকেরাই প্রবল হইয়া উঠে। ক্রমে এই দুই দলই নানা শাখায় ভাগ হইয়া যায়। স্থবিরবাদের প্রধানত দুই শাখা হয়—'মহীশাসক' ও 'বজ্জিপুত্তক'। মহীশাসকেরা আবার দুই ভাগ হয়—'সর্বত্থবাদী' ও 'ধর্মগুপ্তিক'।

সর্বত্থবাদ ক্রমে 'কশ্যপীয়,' 'সংকান্তিক' ও 'সুত্তবাদ' হইয়া যায়। 'বজ্জিপুত্তক'দের চারি শাখা হয়—'ধম্মত্থানীয়', 'ছন্দাগারিক', 'ভদ্দজানিক' ও 'সম্মতীয়'।

মহাসাংঘিকদিগের দুই দল হল—'গোকুলিক' ও 'একব্যোহারিক'। গোকুলিকদিগের আবার তিন শাখা হয়—'পন্নখিবাদ', 'বাহুলিক' ও 'চেতিয়বাদ'। এতদ্ভিন্ন দেশভেদেও অনেকগুলি শাখা হয়—'হেমবন্ত', 'রাজগিরীয়', 'সিদ্ধত্থক', 'পূর্বশেলিয়', 'অপরশেলিয়', 'বাজিরীয়'। কিন্তু কী লইয়া যে এই-সকল শাখাভেদ হয় তাহা আমরা এখনো জানিতে পারি নাই।

এই-সকল ভিন্ন শাখার মধ্যেও পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ ছিল। বিবাদ বিসংবাদ হইলেই লোকে দুর্বল হইয়া পড়ে। এইরূপ দুর্বল অবস্থাতেই সামবেদী সুঙ্গগোত্রের ব্রাহ্মণেরা অশোকের রাজ্য ধ্বংস করিয়া নূতন রাজ্যস্থাপন করিলেন। তাঁহারা বৈদিক আচারের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথমেই পাটলিপুত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া অশোকের উপর তাঁহাদের যে রাগ ছিল, সে রাগ তুলিলেন। এই বংশের প্রথম রাজা পুষ্যমিত্র, ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি তিন-চারি বার বৌদ্ধদিগকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখনো বৌদ্ধ পুষ্যমিত্রের নাম মুখে আনে না, এবং তাঁহার নাম শুনিলে গালি দেয়। অশোকরাজা ব্রাহ্মণবিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজ্যময় পশুবধ করিয়া যজ্ঞ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতার হ্রাস করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; সুতরাং অশোকের দলের উপরই পুষ্যমিত্রের রাগ যে বেশি ছিল, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। তাহা হইলেই বুঝা যায় স্থবিরবাদীরাই পুষ্যমিত্রের কোপে পড়িয়াছিলেন এবং তাহাদেরই উপর তাঁহার অত্যাচার অধিক হইয়াছিল। বিশেষ আবার তাঁহারাই পুষ্যমিত্রের রাজধানীর নিকট বাস করিতেন। মহাসাংঘিকেরা অনেকে তাঁহার রাজ্যে বাস করিতেন, কিন্তু অধিকাংশই তাঁহার রাজ্যের বাহিরে পাঞ্জাব প্রভৃতি যবনদিগের রাজ্যে পড়িয়াছিলেন। একে তো নানা শাখা হওয়ায় বৌদ্ধেরা আপনা-আপনিই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, পুষ্যমিত্রের নির্যাতনে তাহাদের দুর্বলতা আরো বাড়িয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে শক, যবন ও পহ্লব প্রভৃতি জাতির রাজত্ব হইল। মহাসাংঘিকেরা সেখানে যাইয়া বিদেশীয় রাজগণকে আপনাদের মতে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্যও হইল। কিন্তু এরূপ কৃতকার্য হইতে প্রায় দুই শত বৎসর লাগিয়াছিল। নির্যাতন হইলেই আপনার ঘর একটু বাঁধিয়া উঠে। অনেক বৌদ্ধগণ আপনার শাখার অস্তিত্ব ভুলিয়া বৌদ্ধধর্মেরই যাহাতে রক্ষা হয় তাহারই চেষ্টা করিতে থাকে। মহাসাংঘিকেরা কনিষ্ক রাজার সময় জলন্দরে একটি মহাসভা করে। সে সভায় স্থবিরবাদীরা বড়ো স্থান পায় নাই। ঐ সভায় তাহারা আপনাদের ধর্মপুস্তক ও তাহার টীকা ও আপনাদের ধর্মমত স্থির করিয়া লন। অনেকে

বলেন, এইখানে মহাযান-মতাবলম্বীরা উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প ছিল বলিয়া তাহারা বড়ো একটা মাথা তুলিতে পারে নাই। কিন্তু একথা বিশ্বাস হয় না কারণ, কনিষ্করাজার গুরু অশ্বঘোষ নিজেই মহাযানমতের পোষক ছিলেন। আমার বোধ হয় এই সভারই মহাসাংঘিকেরা মহাযানরূপে পরিণত হয়, কারণ মহাসাংঘিক ও মহাযানে অনেক বিষয়ে মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহাসাংঘিকেরা দশভূমি মানিত, ইহারাও দশভূমি মানিত। মহাসাংঘিকেরা উচ্চ দার্শনিক মতের পক্ষপাতী ছিল, মহাযানেরাও তাহাই ছিল। তবে মহাসাংঘিকদিগের মধ্যে বোধিসত্ত্ববাদ তত প্রবল হয় নাই, করুণাবাদের তো নামও শুনিতে পাওয়া যায় না।

আমার মনে হয় মহাসাংঘিকেরাই ক্রমে ক্রমে মহাযান হইয়া দাঁড়ান, কিন্তু 'মহাসাংঘিক' হইতে মহাযান মতে উপস্থিত হইতে তিন শত বৎসর লাগিয়াছিল। এ সম্বন্ধে ঠিক কথা বলিবার জো নাই, কারণ মহাসাংঘিকদিগের একখানি মাত্র পুস্তক পাওয়া গিয়াছে ও প্রকাশিত হইয়াছে; সেখানি 'মহাবস্তু অবদান'। বইখানিতে লেখা আছে—"আর্য্যমহাসাঙ্ঘিকানাং লোকোত্তরবাদিনাং পাঠেন"—অর্থাৎ লোকোত্তরবাদী মহাসাংঘিকদিগের এই পুস্তক। এইখানি যে কী ভাষায় লেখা, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। যে ভাষায় 'ললিতবিস্তরে'র অধ্যায়ের শেষের গাথাগুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। যে ভাষায় 'সদ্ধর্ম্মপুন্ডরীকে'র গাথাগুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। যে ভাষায় 'শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গুণরত্নসঞ্চয় গাথা' লেখা, এও সেই ভাষায়। মথুরার ছোট ছোট শিলালেখগুলি যে ভাষায় লেখা, এও সেই ভাষায়। যে ভাষায় নাসিক, কার্লি প্রভৃতি গুহায় সাতকর্ণি রাজাদের শিলালেখগুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। ইহা কতক কতক সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে চলে, কতক কতক সে ব্যাকরণ একেবারে মানে না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র উহার নাম দিয়াছেন গাথাভাষা। সিনার সাহেব [E. Senart] এ ভাষার নাম দিয়াছেন মিক্সড্ সংস্কৃত (mixed Sanskrit)। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন ভারনাকুলারইজড্ সংস্কৃত (vernacularised Sanskrit)। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন স্যান্স্কৃটাইজড্ ভারনাকুলার (Sanskritized vernacular) — যেমন আমাদের পন্ডিতি বাংলা। 'কাব্যাদর্শ'কার ভারতবর্ষে চারি ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র; কিন্তু তিনি মিশ্র ভাষার উদাহারণ দিয়াছেন—"মিশ্রন্তু নাটকাদিকং"। তাঁহার এ উদাহরণটি ঠিক হয় নাই, কারণ তিনি ভাষার উদাহরণ দিতে গিয়ে সাহিত্যের উদাহরণ দিয়াছেন। আমার বোধ হয়, তিনি যখন লিখিয়াছিলেন, তখন একটি প্রাচীন কারিকায় ভাষাগুলির নাম পাইয়াছিলেন, সেই কারিকাটি তুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সময় মিশ্রভাষা চলিত না, তাই "মিশ্রন্তু নাটকাদিকং" বলিয়া একটা যা তা উদাহরণ দিয়া গিয়াছেন। 'মহাবস্তু অবদানে'র ভাষা বাস্তবিকই মিশ্রভাষা। এ ভাষায় "বাস্তু" "বস্তু" হইয়া যায়, তাই যেখানে অশ্বঘোষ

কপিলবাস্তু লিখিয়াছেন, সেখানে 'মহাবস্তু অবদানে' "কপিলবস্তু" লেখা আছে। এরূপ সংস্কৃতকে বাঁকাইয়া ফেলা বাংলায় বিরল নহে, যেমন আমাদের বাংলা ভাষায় "সমভিব্যাহার" শব্দ 'সমিভ্যার" হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা আমাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের বিশেষ করিয়া এই ভাষাটির আলোচনা করা উচিত।

মহাসাংঘিক হইতে কেমন করিয়া মহাযান হইল, তাহা জানার এই একখানি বৈ আর পুস্তক নাই। কনিষ্কের সময় যে-সকল পুস্তক লেখা হইয়াছিল, তাহার একখানিও এখনো পাওয়া যায় নাই। চীনে তাহার কয়েকখানা পুস্তকের তর্জমা আছে। শুনিয়াছি সক্‌ডিয়ানায় মহাসাংঘিকদিগের এক শাখার মত চলিত, শুনিয়াছি মধ্য-এশিয়ায় মহাসাংঘিক মতদিগের আর এক শাখার মত চলিত, কিন্তু তাহারো কোনো পুস্তক এ পর্যন্ত চক্ষে পড়ে নাই। 'মহাবস্তু অবদানের'র পর এবং নাগার্জুনের পূর্বে যত পুস্তক রচনা হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা 'লঙ্কাবতার সূত্র' দেখিতে পাই, আর অশ্বঘোষের তিন-চারিখানি পুস্তক দেখিতে পাই। ইহাতেই দেখা যায় যে মহাযানের মূল মতগুলি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। 'মহাবস্তু অবদানে' দশভূমির কথা আছে, বুদ্ধত্ব লাভেরও কথা আছে, কিন্তু বোধিসত্ত্ববাদ নাই। 'লঙ্কাবতারে' বোধিসত্ত্ববাদ সামান্যভাবে আছে। অশ্বঘোষের 'সৌন্দরানন্দে' আছে, "তোমার নিজের উদ্ধার হইলেই নিশ্চিন্ত থাকিও না, পরকেও উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবে। তোমার কৃত্য সমাপ্ত হইয়াছে, তুমি অপরকে উদ্ধার করো" ইত্যাদি। এ-সকলেই আমরা মহাযান মতের মূল দেখিতে পাইতেছি। 'লঙ্কাবতারে' কথা তুলিয়াছে "তথাগত" কি অবিনশ্বর?

অনেকে মনে করেন, হিন্দু ও বৌদ্ধদিগকে মিলাইবার জন্য নাগার্জুন মহাযানমতের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, বুদ্ধদেবের পর কোনো মহাপ্রতিভাশালী ব্যক্তি 'ভগবদ্গীতা' রচনা করেন। 'ভগবদ্গীতা'র মত মহাসাংঘিকদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাযান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই, বরং ইহার বিরুদ্ধ মতের অনেক প্রমাণ আছে। একথাটি বুঝাইতে গেলে একটু বাজে কথার দরকার এবং সে বাজে কথা কহার দরুন কেহ যেন কিছু মনে না করেন।

নেপালিরা বলে ধর্ম দুই প্রকার হইতে পারে। খাঁটি ধর্ম দু-রকম ছাড়া তিন রকম হইতে পারে না। সেই দুই প্রকার ধর্ম—১. দেবভাজু ২. গুভাজু। হয় দেবতাকে ভজনা করো, না হয় গুরুকে ভজনা করো। ব্রাহ্মণেরা দেবভাজু, বৌদ্ধেরা গুভাজু, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিছুতেই মিশিতে পারে না। বৌদ্ধধর্মের শ্রাবকযান ও প্রত্যেকযান দুই-ই গুভাজু, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। মহাযানও সম্পূর্ণরূপে গুভাজু, তাহারা বুদ্ধকেই মানে, বুদ্ধই তাহাদের গুরু, বুদ্ধকেই তাহারা মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করে, কোনো দেবতাকেই তাহারা উপাসনা করে না, তবে তাহাদিগকে হিন্দু ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য বলিয়া কেমন করিয়া মনে করিব? বরঞ্চ হীনযানে সময়ে সময়ে

ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করিতে বলে, কিন্তু মহাযানে সেটুকু বড়ো দেখা যায় না। একজন আচার্য তাঁহার এক সেবককে ভিক্ষু করিবার জন্য বড়োই চেষ্টা করিতেন। সেবক বলিত, "মহাশয়, আমার এখনো সময় হয় নাই।" কিছুদিন পরে সে আসিয়া বলিল, "আচার্য মহাশয়, আমার আর ভিক্ষু হইবার দরকার নাই, আমি একেবারে বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছি।" আচার্য বলিলেন, "কিসে এমন হইল?" সে বলিল, "এখন ব্রাহ্মণ দেখিলেই ইচ্ছা হয় ইহাকে খুন করিয়া ফেলি।" আচার্য বলিলেন, "তবে ঠিকই হইয়াছে।" ইহার উপরেও কি বলিব যে, মহাযান হিন্দু ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য মাত্র। তবে এক কথা—একদেশে যদি দুই-তিন ধর্মের লোক থাকে, তবে তাহাদের আচার ব্যবহার ক্রমে কতকটা এক হইয়া যায়। আমাদের দেখাদেখি ভদ্রঘরের মুসলমানের মেয়েরা বিধবা হইলে আর বিবাহ করিতে চায় না, মুসলমানের দেখাদেখি আমরাও পীরের শিরনি দিই। ফিরিঙ্গিরা কালীর কাছে মানত করে। এই মানতের দৌলতে কলিকাতার বহুবাজার স্ট্রিটে ফিরিঙ্গি-কালীর মন্দিরে মার্বেলের মেজে হইয়া গিয়াছে। এ-সকল গৃহস্থের মধ্যে চলিতে পারে; কিন্তু যাহারা ধর্মের কর্তা তাদের ভিতর এসব করিলে চলে না। তাহাদের আপন-আপন ধর্মের মত ঠিক মানিয়া চলিতে হয়, নহিলে গৃহস্থেরা তাহাকে মানিবে কেন?—তাহার কথাই বা শুনিবে কেন?

মহাযানের কিন্তু বাহাদুরি আছে। যতদিন মহাসাংঘিক ছিল, ততদিন তাহাদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ ছিল, আর পরস্পর বেশ রেষারেষিও ছিল, কিন্তু মহাযানের পর সেটা আর বড়ো দেখা যায় না। সবাই আপনাকে মহাযান বলিয়া পরিচয় দিতেই ব্যগ্র হয়। শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ মহাযানের দুইটা প্রকাণ্ড দার্শনিক মত, কিন্তু উভয়ই মহাযান এবং মহাযান বলিয়া উভয়েই স্পর্ধা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে অন্য কোনো বিষয় লইয়া দলাদলি আছে তাহা বোধ হয় না। আর মহাযান হইতে এই যে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানা যানের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারাও সকলে আপনাদিগকে মহাযান বলিয়াই স্পর্ধা করিয়া থাকে। এরূপ হইবার কারণ কী? আমার বোধ হয় মহাযানধর্মের উদারতাই ইহার কারণ। জগৎ উদ্ধারই আমাদের উদ্দেশ্য। যে যে-প্রকারই করুক না কেন, তাহাতে আমাদের বৃদ্ধি বৈ ক্ষতি নাই। সুতরাং আমাদের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ কেন? জগৎ একটা প্রকাণ্ড বস্তু, একা কিছু উদ্ধার করা যায় না। সুতরাং তুমি যাহা করিলে, সেও আমার কার্য, আমি যাহা করিলাম, সেও তোমার কার্য। তাহা লইয়া তোমায় আমায় ঝগড়া হইবে কেন?

মহাযান কোথা হইতে আসিল ইহার উত্তর এই যে, মহাসাংঘিকেরাই ক্রমে মহাযান হইয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত উহার কোনো বিশেষ সম্বন্ধ নাই; ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য করিবার জন্য মহাযানের সৃষ্টি হয় নাই; মহাযানের উদ্দেশ্য মহৎ, উহা সকল ধর্মকেই আপনার ক্রোড়ে টানিয়া লইতে পারে।

'নারায়ণ', শ্রাবণ, ১৩২২

মহাযানমতে নির্বাণ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া ধ্যান, ধারণা, সমাধি করিয়া "দশভূমি" অতিক্রম পূর্বক শূন্যের উপর শূন্য, তার উপর শূন্য পার হইয়া, তবে নির্বাণ-পদ লাভ হয়। এত তো লোকে করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং একটা সহজ পথ চাই। সে সহজ পথ কোথা হইতে আসে?

মহাযানে তো "সাংবৃত সত্য" বা সংসারকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে এবং 'পরমার্থ সত্য'কে শূন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। নির্বাণ ও শূন্য একই। মাধ্যমিকেরা শূন্যকে "চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত" বলিয়াছে—অতএব উহা "অস্তি"ও নয়, "নাস্তি"ও নয়, "তদুভয়"ও নয়, "অনুভয়"ও নয়। তবে উহা কী?—অনির্বচনীয় রূপ। কিন্তু উহার ধারণা ভাবরূপে হয়, অভাবরূপে নয়—ইংরাজিতে বলিতে গেলে Positive, Negative রূপে নয়। যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদীরা বলেন যে, ঐ অবস্থায় শূন্য বিজ্ঞানমাত্র। ইহাও "ভাব"। সহজবাদীরা বলিলেন, তোমাদের সংসারও যেমন মিথ্যা, নির্বাণও তেমনই মিথ্যা। মানুষ সকলেই নিত্যমুক্ত, পাপ পুণ্য বলিয়া কোনো জিনিসই নাই।

সহজধর্মের অনেক বই বাংলায় লেখা। হওয়াই উচিত। যদি নির্বাণটাকে সহজই করিতে হয়, তবে উহাকে সংস্কৃত দিয়া কঠিন করা কেন? বাংলায় বলিলে উহা তো আরো সহজ হইবে। তাই তাঁহারা বাংলাতেই সহজধর্ম প্রচার করেন। সরহপাদ বাংলায় বলিলেন—

অপনে রচি রচি ভব নির্বাণা
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা।
অম্ভে ন জাণহু অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসণ হোই।।
জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো।।
জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা।
সো করউ রস রসানেরে কখা।।   [বৌ-গা-দো, পৃ. ৩৮]

লোকে বৃথা আপনা-আপনি সংসার ও নির্বাণ মনে মনে রচনা করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিয়া ফেলে। আমি অচিন্ত্যযোগী—আমি জানি না জন্ম মরণ ও ভব কিরূপ? জন্মও যেরূপ, মরণও সেইরূপ, জীয়ন্তে ও মরণে কোনোই বিশেষ নাই। জন্ম ও মরণে যাহার শঙ্কা, সেই রস ও রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করুক।

ভাদেপাদের কথা এই—

এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ।
এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহেঁ।।
এবেঁ চিঅরাঅ মঁকু ণঠা।
গণসমুদে টলিআ পইঠা।।
পেখমি দহদিহ সর্ব্বই শূন।
চিঅ বিহুন্নে পাপ না পুন্ন।।
বাজুলে দিল মোহকখু ভণিআ।
মই অহারিল গঅণত পণিআঁ।।
ভাদে ভণই অভাগে লইআ।
চিঅরাঅ মই অহার কএলা।। [পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪]

এতকাল আমি আমার মোহেতেই ছিলাম। এখন আমি সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ পাইয়া ঠিক বুঝিতে পারিলাম। এখন বুঝিলাম আমার চিত্তরাজ একেবারেই নাই। তিনি টলিয়া গগন-সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছেন। আমি দেখিতেছি দশ দিক সকলই শূন্য। চিত্তই যখন নাই, তখন পাপও নাই, পুণ্যও নাই। আমার বজ্রগুরু আমার মোহের কুঠারি ভাঙিয়া দিয়াছেন। আমি গগনে পড়িয়া হারাইয়া গিয়াছি। ভাদেপাদ বলিতেছেন, ভাগ তো নাই, আমি আমার চিত্তরাজকে আহার করিয়া ফেলিয়াছি, অর্থাৎ, তাহাকে "নিঃস্বভাব" করিয়াছি।

এই দুইটি গান হইতে আমরা কী বুঝিতে পারিতেছি? যখন সবই শূন্য—তখন উৎপত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই, ভঙ্গও নাই; জন্মও নাই, মরণও নাই, সংসারও নাই। "চিত্ত" 'চিত্ত' বলিয়া যে পদার্থ আছে বল, তাহাও তো শূন্যসমুদ্রে পড়িয়া মিশাইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে পাপও নাই, পুণ্যও নাই। সকল জিনিসই যখন নিঃস্বভাব, তখন আমার চিত্তেরই যে স্বভাব থাকিবে, তাহারই বা অর্থ কী? আমি যতদিন নিজে জন্ম-মরণ-সংসারের ভাবনা ভাবিতেছিলাম, ততদিন আমি মোহে বা ধোকায় পড়িয়াছিলাম। ঠিক গুরুর কাছে ঠিক উপদেশ পাইয়া, আমি বুঝিলাম আমার চিত্তরাজ নাই। আমি চিত্তরাজকে 'আহার' করিয়া ফেলিলাম।

যোগাচারমতে যেমন—কিছুই থাকে না, বিজ্ঞানমাত্র থাকে; সহজমতে তেমনই কিছুই থাকে না, আনন্দমাত্র থাকে। এই আনন্দকে তাঁহারা সুখ বলেন, কখনো বা মহাসুখ বলেন। সে সুখ স্ত্রীপুরুষসংযোগজনিত সুখ। ইঁহাদের মতে চারিটি শূন্য আছে—নিচের শূন্য কয়টি কিছুই নয়, আলোকমাত্র; চতুর্থ শূন্যের নাম প্রভাস্বর। সে শূন্য আপনি উজ্জ্বল। সেই শূন্যে চিত্তরাজ গিয়া উঠিলেন, তাহার পর নিরাত্মাদেবীর সহিত মহাসুখে মগ্ন হইয়া "নিঃস্বভাব" হইয়া গেলেন।

সহজযানের মূল কথা—সদ্‌গুরুর উপদেশ।

এই যানের কথা—

ন বিনা বজ্রগুরুণা সর্ব্বক্লেশপ্রহাণকম্।
নির্ব্বাণঞ্চ পদং শান্তমবৈবর্ত্তিকমাপ্নুয়াৎ।। ('শ্রীসমাজতন্ত্র')

বজ্রগুরু ব্যতিরেকে নির্বাণপদ পাওয়া যায় না। যে নির্বাণে সকল ক্লেশের নাশ হয়, শান্তি যে নির্বাণের চরম ফল, যে নির্বাণে আর "বিবর্ত" থাকে না, অর্থাৎ, কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না, সে পদ গুরুর কৃপা ভিন্ন পাওয়া যায় না।

গুরুর কথা শুনিলে, তাঁহার হিত উপদেশ পাইলে, তুমি ইচ্ছা করো আর না-ই করো, তুমি নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ করিবে। ('বজ্রজাপ')

গুরুর প্রসাদেই পরম সুখলাভ হয়, সে সুখ নিজেই বুঝিতে পারা যায়, পরেও আমাকে বুঝাইতে পারে না, আমিও পরকে বুঝাইতে পারি না। সে সুখে তন্ময়তা লাভ হয়, অর্থাৎ সুখ ভিন্ন জগতের অন্য কোনো পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, সে সুখ গুরু হইতেই উদয় হয়। অনেক পুণ্য থাকিলে, গুরুর অনেক উপাসনা করিলে, সে সুখ লাভ হইয়া থাকে।('সরহপাদপ্রবন্ধ')

সে গুরুকে আমরা বজ্রগুরু বলি কেন? বজ্র বলিতে শূন্যতা বুঝায়। 'যোগরত্নমালা'য় লিখে—

দৃঢ় সারমশৌষীর্য্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্।
অদাহী অবিনাশী চ শূন্যতা বজ্র উচ্যতে।।

শূন্যতাই বজ্র। উহা ছেদা করা যায় না, ভেদ করা যায় না, দগ্ধ করা যায় না, বিনাশ করা যায় না, উহাকে ছেঁদা করাও যায় না—উহা অতি দৃঢ় ও সারবান্। যে গুরু এই শূন্যতাবজ্রের উপদেশ দেন, তিনিই বজ্রগুরু।

গুরুর উপদেশে যাহা লাভ হয়, সে লাভ শতসহস্র সমাধিতে হয় না। আমাদের এই যে সহজযান ইহাতে গুরুর উপদেশই লইতে হয়, ইন্দ্রিয় নিরোধের চেষ্টা করা বৃথা, পাপ পরিহারের চেষ্টা বৃথা, কঠোর ব্রত ধারণের চেষ্টা বৃথা, কঠিন কঠিন নিয়মপালন করাও বৃথা।

'শ্রীসমাজতন্ত্রে' বলিতেছেন—

দুষ্করৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈর্মূর্ত্তিঃ শুষ্যতি দুঃখিতা।
দুঃখাদ্বি ক্ষিপ্যতে চিত্তং বিক্ষেপাৎ সিদ্ধিরন্যথা।।

যদি তুমি কঠোর নিয়ম পালন কর, তাহা হইলে তোমার শরীর শুষ্ক হইবে, ও তোমার নানারূপ দুঃখ উপস্থিত হইবে। দুঃখ উপস্থিত হইলে মন স্থির থাকিবে না, মনস্থির না থাকিলে কখনোই সিদ্ধিলাভ হয় না।

'হেবজ্রতন্ত্রে'ও বলিতেছে—

রাগেণ বধ্যতে লোকো রাগেণৈব বিমুচ্যতে।
বিপরীতভাবনা হ্যেষা ন জ্ঞাতা বুদ্ধতীর্থিকৈঃ।।

বিষয়ের আসক্তিতেই লোকে বদ্ধ হয়, আবার সেই আসক্তিতেই লোকে মুক্ত হয়। আসক্তির এই যে বিপরীত ফলদানের ক্ষমতা বুদ্ধতীর্থিকেরা এটা জানিত না, অর্থাৎ, অন্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের লোকেরা ইহা জানে না, আমরা, সহজপন্থীরাই কেবল জানি।

আবার 'শ্রীসমাজ' বলিতেছেন—

পঞ্চকামান্ পরিত্যজ্য তপোভির্নৈব পীড়য়েৎ।
সুখেন সাধয়েদ্বোধিং যোগতন্ত্রানুসারতঃ।।

পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়, বিষয়কেই ভোগ বলে, বিষয়কেই কাম বলে। সেই পাঁচটি ভোগ ত্যাগ করিয়া তপস্যার দ্বারা আপনাকে পীড়া দেবে না। যোগতন্ত্রানুসারে সুখভোগ করিতে করিতে বোধির সাধনা করিবে।

সরহপাদ বলিতেছেন—

তনুতরচিত্তাঙ্কুরকো বিষয়রসৈর্যদি না সিচ্যতে শুদ্ধৈঃ।
গগনব্যাপী ফলদঃ কল্পতরুত্বং কথং লভতে।।

যখন চিত্ত অল্পে অল্পে বোধির দিকে যায়, তখন সেই চিত্তরূপ ছোটো অঙ্কুরটির গোড়ায় বিষয়রস যদি না সেক কর, কেমন করিয়া সেই অঙ্কুর কল্পতরু হইবে, কেমন করিয়া সে আকাশ ছাইয়া ফেলিবে, কেমন করিয়া সে সকলের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবে?

এই সকল সহজপন্থীর শাস্ত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে যে, যদি তোমার বোধিলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে পঞ্চকাম উপভোগ করো।

পঞ্চকাম উপভোগ তো সকলেই করে। তাহার জন্য আবার শাস্ত্র কেন, তাহার জন্য আবার ধর্ম কেন? সে তো সকলে আপনা হইতেই করে? তাহার জন্য আবার গুরু কেন? একটু আছে। মানুষমাত্রেই পঞ্চকামোপভোগ করে। কিন্তু তাহাতে তাহারা পাপপুণ্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু যখন বজ্রগুরু বুঝাইয়া দেন যে, সবই শূন্য, কিছুরই স্বভাব নাই, তখনই সহজিয়ারা পঞ্চকামোপভোগ করে ও পাপপুণ্যে লিপ্ত হয় না। তাই দারিকপাদ বলিলেন—

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণবখানে।
অপইঠানমহাসুহলীণে দুলখ পরমনিবাণেঁ।।
দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দিজানী।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তরমাণী।। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩)

অরে বালযোগি, তোমার মন্ত্রেই বা কী? তন্ত্রেই বা কী? ধ্যানেই বা কী? ব্যাখ্যানেই বা কী? তোমার যখন মহাসুখলীলায় প্রতিষ্ঠা নাই, তখন নির্বাণ তোমার পক্ষে দুর্লভ। তুমি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরমার্থ সত্যের সহিত মহাসুখলীলাকে এক করিয়া পঞ্চকাম উপভোগ করো। দারিক এই উপায়েই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার আত্মপর বোধ নাই।

তিনি এই সঙ্গেই আবার বলিতেছেন—

রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা
লুইপাঅপএ দারিক দ্বাদশভুঅণেঁ লধা।। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩)

আর যত রাজা আছেন, তাঁহারা সকলেই বিষয়ের মোহে বদ্ধ। কিন্তু নিজগুরু লুইপাদের প্রসাদে দ্বাদশভুবন অতিক্রম করিয়া দারিক পরমসুখ লাভ করিয়াছেন।

মহাসুখ লাভ করিলে সহজিয়াদের কী অনির্বচনীয় অবস্থা হয়, সে সম্বন্ধে আগমে এই কথা বলে—

ইন্দ্রিয়াণি স্বপন্তীব মনোঽন্তর্বিশতীব চ।
নষ্টচেষ্ট ইবাভাতি কায়ঃ সৎসুখমূর্চ্ছিতঃ ।।

শরীর যখন সৎসুখে মূর্ছিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়সকল যেন ঘুমাইয়াই পড়ে, মন মনের ভিতর ঢুকিয়া যায়। শরীরের কোনোরূপ চেষ্টা থাকে না।

এই যে পঞ্চকামোপভোগ—ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি? সে বিষয়ে 'অনুত্তরসন্ধি'তে এই কথাটি দেখা যায়—

সর্ব্বাসাং খলু মায়ানাং স্ত্রীমায়ৈব বিশিষ্যতে।
জ্ঞানত্রয়প্রভেদোয়ং স্ফুটমত্রৈব লক্ষ্যতে।।

সকল মায়ার মধ্যে স্ত্রীমায়াই বড়ো। ইহাতেই তিনটি জ্ঞানের যে প্রভেদ, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। তিনটি জ্ঞান—প্রথম তিনটি শূন্য। সে তিনটি যে কিছুই নয়, তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝা যায় এবং বিরমানন্দ রূপ যে চতুর্থ শূন্য তাহা পাইতে পারা যায়। এই চতুর্থ শূন্যের নাম প্রভাস্বর। ইহাতেই নিরাত্মাদেবীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া চিত্ত মহাসুখে লীন হয়।

সবরপাদ বলিতেছেন—

তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ী তাএলা।।
ফিটেলি অন্ধারি রে অকাশ ফুলিআ।।
কঙ্গুরি না পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা
অণুদিণ শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা।। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫)

তৃতীয় বাড়ির (সন্ধ্যাভাষায় বাড়ি বলিতে শূন্য বুঝাইল) পাশে জ্যোৎস্না বাড়ি বা জ্যোৎস্না শূন্য। সেখানে জ্ঞানচন্দ্র সর্বদা উদিত। সেখান হইতে সকল অন্ধকার, সকল দুঃখ পলাইয়াছে। সেখানে আকাশপুষ্প সত্যসত্যই ফুটিয়া আছে। সেখানে কাঁকুড় পাকিল না (সন্ধ্যাভাষায় কাঁকুড় শব্দের অর্থ সর্বব্যাপী সুখ; পাকিল না, অর্থাৎ শেষ হইল না। অর্থাৎ সুখ রহিল)। শবর ও শবরী (বোধিচিত্ত ও নিরাত্মা দেবী) উন্মত্ত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। শবরে জ্ঞান-চৈতন্য কিছুই রহিল না। তিনি অনুক্ষণ মহাসুখে ডুবিয়া রহিলেন।

এই যে মত ইহা সাধারণ লোককে যে একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, সে বিষয়ে

কোনো সন্দেহ নাই। লোকে যাহা চায়, সহজিয়ারা তাহাই দিল, কেবল বলিল গুরুর কাছে উপদেশ লও। শুধু কথায় বলিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল না। তাহারা নানা রাগ রাগিণীতে এই-সকল গান গাহিয়া বেড়াইত, এবং দেশের লোককে একেবারে মাতাইয়া তুলিত। তাহারা কী কী যন্ত্র ব্যবহার করিত, জানা যায় না। তাহাদের খোল করতাল ছিল কিনা, বলিতে পারা যায় না। তবে একতারা ছিল বলিয়া জানা যায়—প্রমাণ—বীণাপাদ বলিতেছেন—

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দান্ডী বাকি কিঅত অবধূতী।।
বাজই অলো সহি হেরুঅবীণা
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা।।(পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০)

সূর্য হইলেন লাউয়ের বস্—অর্থাৎ পাকা লাউয়ের শক্ত খোলা, তাহাতে চাঁদ, তাঁত বা তন্ত্রী লাগিল, অণহা অর্থাৎ অনাহতকে দন্ড করা হইল ও অবধূতী বাকি অর্থাৎ বাজনাওয়ালা হইল। হে সখি ঐ শুন হেরুকের বীণা বাজিতেছে। আর সেই তন্ত্রীধ্বনিতে শুনিয়া (শূন্যতা) ও করুণা বিলাস করিতেছে।

এই যে বীণাধ্বনি ইহা একরকম Music of the sphere-এর মতো, অথবা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির মতো। মিউসিকে যে বীণা ধ্বনিতে, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ভরিয়া যায়, হেরুকের বীণা ধ্বনিতেও ত্রৈধাতুকময় সমস্ত ব্রহ্মান্ড ভরিয়া গেল।

তাহারা পটহ বা ঢোল বাজাইত—

বেটিল হাক পড়হ চৌদীশ (ভুসুকুর গান) (পূর্বোক্ত, পৃ. ১২)

তাহারা ডমরু ব্যবহার করিত, মাদলও বাজাইত—

অনহা ডমরু বাজএ বীরনাদে (কৃষ্ণাচার্য) (পূর্বোক্ত, পৃ. ২১)
ভবনির্ব্বাণে পড়হ মাদলা
মণ পবণ বেণি করন্ড কশালা (কৃষ্ণাচার্য) (পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩)

তাহাদের দুন্দুভি ছিল।

জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ
কাহ্নু ডোম্বী বিবাহে চলিআ (কৃষ্ণাচার্য) (পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩)

তাঁহারা যে-সকল বিবাহে গান গাহিতেন, তাহার অনেকগুলি রাগ এখনও সংকীর্তনে চলিতেছে।

যথা—রাগ পটমঞ্জরী, রাগ বরাড়ী, রাগ গুঞ্জরী, রাগ শীবরী, রাগ কামোদ, রাগ মল্লারি, রাগ দেশাখ, রাগ ভৈরবী, রাগ মালসী, রাগ গবুড়া, রাগ রামক্রী, রাগ বঙ্গাল ইত্যাদি।

পদকর্তারা সন্ধ্যাভাষায় গান করিতেন। সন্ধ্যাভাষা অর্থাৎ আলোআঁধারি ভাষা।

উপরে কথায় কথায় একরূপ মানে হয়, অথচ ভিতরে অন্যরূপ গূঢ় অর্থ থাকে। ইহাকে রূপক বলিতে চাও, বলো। কিন্তু রূপকে দুই অর্থই প্রকাশ থাকে। বোধিচিত্ত ও নিরাত্মা দেবীর মিলনকে কখনো বিবাহ্ বলিতেছেন, কখনো তরুলতা সাজাইতেছেন, কখনো হরিণ-হরিণীর ক্রীড়া বলিতেছেন, কখনো দুধ-দোহা বলিতেছেন, কখনো বা শুঁড়িনীর মদ বেচার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখনো বা নদীর উপর সাঁকো গড়ার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখনো শূন্য ও করুণার মিলন দেখাইতেছেন, কখনো গঙ্গা-যমুনার মাঝে নৌকার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখনো ইঁদুরের সহিত তুলনা করিতেছেন। এইরূপ নানা রসে, নানা ভাবে, নানা ছন্দে, নানা অলংকারে তাঁহারা সহজ মত নানা দিকে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে যাঁহারা গান লিখেন, তাঁহাদের নাম পদকর্তা এবং তাঁহাদের গানের নাম পদ। বৌদ্ধ-সংকীর্তনে যাঁহারা গান লিখিতেন, তাঁহাদিগকেও পদকর্তা বলিব। তাঁহারা যে গান লিখিতেন, তাহার নাম চর্যাপদ বা গীতিকা। তাঁহারা চর্যাপদ ছাড়া আরো পদ লিখিতেন—যেমন বজ্রপদ বা বজ্রগীতিকা, উপদেশপদ বা উপদেশগীতিকা।

তখন অনেক বড়ো বড়ো লোকেও গীতিকা লিখিতেন। যিনি বঙ্গ দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া, তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই দীপংকর শ্রীজ্ঞান বা অতিশও বাংলায় গীতিকা লিখিতেন। যে রত্নাকর শান্তির নামে আর্যাবর্তের দার্শনিকেরা ভয় পাইতেন, তিনিও গীতিকা লিখিতেন। অনেক বাঙালি বৌদ্ধ তো গীতিকা লিখিতেনই, এতদ্ভিন্ন আসামি, উড়িয়া ও মৈথিলেরাও গীতিকা লিখিতেন। সহজধর্মের গুরুদিগকে সংস্কৃতে বজ্রগুরু বলিত, বাংলায় বাজিল, বজুল ও বজগু বলিত। লোকে মনে করিত ইঁহাদের নানারূপ অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। ইঁহারা দাড়িগোঁপ কামাইতেন, মাথায় বড়ো বড়ো চুল রাখিতেন, আলখেল্লা পরিতেন। এখন যেমন আউলেরা, তাঁহারাও কতকটা তেমনই গান করিয়া বেড়াইতেন। ইঁহাদিগকে সময়ে সময়ে সিদ্ধাচার্য বলিত। তিব্বত দেশে এখনো সিদ্ধাচার্যের পূজা হইয়া থাকে। অনেক সিদ্ধাচার্যের মূর্তি তাঁহাদের দেশে আছে। লুইপাদ সিদ্ধাচার্যদের আদি, তাঁহাকে লোকে সিদ্ধাচার্য বলে। লোকে বলে সর্বসুদ্ধ চুরাশি জন সিদ্ধাচার্য ছিলেন। লুইয়ের বাড়ি বাংলা দেশে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নাই। তিব্বত দেশের সাহিত্যে তাঁহাকে বাঙালি বলিয়া উল্লেখ করা আছে। তিনি মৎস্যের অন্ত্র বা মাছের পোঁটয়া খাইতে ভালবাসিতেন, সেইজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল, মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ় দেশে যাহারা ধর্মঠাকুর মানে, তাহারা অনেকেই লুইকেও মানে এবং লুইয়ের উদ্দেশে পাঁঠা ছাড়িয়া দেয়। লুইয়ের পূজার দিন তাহারা সেই পাঁঠা বলি দেয়। যদি কেহ সেই পাঁঠা চুরি করিয়া খায়, তবে তাহার অত্যন্ত অমঙ্গল হয়। নগেনবাবু (নগেন্দ্রনাথ বসু) বলেন, ময়ূরভঞ্জের যে অংশটুকুকে রাঢ় বলে, সেখানেও লুইয়ের পূজা হইয়া থাকে। লুইয়ের বংশে আরো কেহ কেহ

সিদ্ধাচার্য ছিলেন এবং বাংলায় গান লিখিয়াছিলেন।

এখন বৈষ্ণবদের যেমন আখড়াধারী আছে, সিদ্ধাচার্যেরা যদি তেমনই আখড়াধারী ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়, এবং এখন আখড়াধারীদের যেমন অনেক চেলা থাকে সেইরূপ সিদ্ধাচার্যদেরও অনেক চেলা ছিল যদি মনে করা যায়, তাহা হইলে তখন বাংলায় কিরূপ অবস্থা ছিল, ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তখন ব্রাহ্মণদিগের এত প্রাদুর্ভাব হয় নাই। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে তখন হাজার ঘরও ছিল কিনা খুব সন্দেহ। সুতরাং ব্রাহ্মণধর্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সিদ্ধাচার্যগণ ও তাঁহাদের চেলারা দেশের একরূপ কর্তা ছিলেন। একে তো তাঁহাদের ধর্ম অতি সহজ, মানুষে যাহা চায়, তাই তাঁহারা দিতেন। তাহাও আবার বক্তৃতার ছটায় নয়, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নয়, সংস্কৃতের ব্যাখ্যায় নয়, উপদেশ দিয়া নয়। গানে, নানা সুরে, নানা বাদ্যের সঙ্গে, গান করিয়া তাঁহারা লোকদের বলিয়া দিতেন, "বাপুহে সবই তো শূন্য—সংসারও শূন্য, নির্বাণও শূন্য—তবে যে আমি আমি বলিয়া বেড়াই, এটা কেবল ধোকা মাত্র।

"এই ধোকার পশরা নামাইয়া ফেলো। তখন দেখিবে কিছুই কিছু নয়। সুতরাং আনন্দ করো। আনন্দই শেষ থাকিবে। আদিতেও আনন্দ, মধ্যেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ।"

এই যে আনন্দময় উপদেশ, ইহার ফলে দেশের লোক মাতিয়া উঠিয়াছিল। সে মাতার ফল যে ভালো হয় নাই, তাহা তো আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু যাঁহারা মাতাইয়াছিলেন, তাঁহারা খুব ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন, মানুষের মনের উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতে হয়, তাহা তাঁহারা বেশ ভাল জানিতেন। তাঁহারা গুরুগিরি করিয়া বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু চেলাদের যে কী পরিণাম হইবে, তাহা তাঁহারা একেবারেই ভাবেন নাই। তবে তাঁহারা আমাদের একটা বড়ো উপকার করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা বাংলা ভাষাটিকে সজীব, সতেজ, সরল ও মধুর করিয়া গিয়াছেন এবং বৌদ্ধজগতে তাহাকে একটি উচ্চস্থান দিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য বঙ্গ-বাসী মাত্রেরই ইঁহাদের উপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ইঁহারা যে সহজধর্মের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সে ধর্ম এখনো চলিতেছে, তবে ইহার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। তখন সহজিয়ারা আপনারাই সহজভাবে মত্ত থাকিতেন, এখন সহজিয়ারা দেবতাদের সহজভাবে ভোর হইয়া থাকেন। তখন তাঁহারা নিজেরাই যুগনদ্ধ ক্রীড়া করিতেন, এখন তাঁহারা দেবতাদের যুগনদ্ধ ক্রীড়া দেখিয়াই আনন্দ উপভোগ করেন।

'নারায়ণ', ভাদ্র, ১৩২২

বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত

সহজযানের কথা গত মাসে বলিয়াছি। সহজযানের ফল যে অতি বিষময় হইয়াছিল তাহা বোধহয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যে পঞ্চকামোপভোগ নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে চরিত্র-বিশুদ্ধি বৌদ্ধধর্মের প্রাণ, যে চরিত্র-বিশুদ্ধির জন্য হীনযান হইতেও মহাযানের মহত্ত্ব, যে চরিত্র-বিশুদ্ধির জন্য আর্যদেব 'চরিত্র-বিশুদ্ধি-প্রকরণ' নামে গ্রন্থই রচনা করিয়া গিয়াছেন, সহজযানে সেই চরিত্র-বিশুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া দিল। বৌদ্ধধর্ম সহজ করিতে গিয়া, নির্বাণ সহজ করিতে গিয়া, অদ্বয়বাদ সহজ করিতে গিয়া, সহজযানীরা যে মত প্রচার করিলেন, তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম 'নেড়ানেড়ি'র দলে গিয়া দাঁড়াইল। সহজযানীরা সন্ধ্যাভাষায় গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাভাষার অর্থ আলোআঁধারি ভাষা। কানে শুনিবামাত্র একরকম অর্থ বোধ হয়, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে তাহার গূঢ় অর্থ অতি ভয়ানক। তাঁহারা দেহতত্ত্বের গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড এই দেহের মধ্যেই আছে, তাহাই দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং দেহে আকাশ, কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু, সুমেরু সবই রহিল। যে বোধিচিত্ত মহাযান মতে নির্বাণ পাইবার আশায় ক্রমেই আপনার উন্নতি করিতেছিলেন, দেহতত্ত্বের মধ্যে আসিয়া তাহার যে কী দশা হইল তাহা আর লিখিয়া জানাইব না। জানাইতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। দেশের লোকে এই ইন্দ্রিয়াসক্ত বৌদ্ধদিগকে কী চক্ষে দেখিত তাহা যদি জানিবার ইচ্ছা থাকে, 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র তৃতীয় অঙ্কটি একবার মন দিয়া পড়িয়া দেখিবেন। ঐ নাটকখানি ১০৯০ হইতে ১১০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়। উহাতে বৌদ্ধ ও জৈন যতিদের যে 'কেচ্ছা' দেওয়া আছে, তাহা পড়িলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা তখনো খুব বড়োমানুষ, কাষায় বস্ত্র অথবা ছোবানো কাপড় পরেন; কিন্তু সে রেশমের কাপড়। পুথি পড়েন—সে পুথির পাটায় সোনালি কাজ করা; যে কাপড়ে পুথি বাঁধা থাকে, তাহা রেশমের, তাহার উপর নানা রকম কাজ করা। ভিক্ষুরা তখনো খুব বাবু, বিলাসী ও তাহার উপর অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত।

এই অধঃপাতের একটা দিক। আর-একটা দিক হইতে অধঃপাতের কারণ দেখাই। মহাযান-ধর্ম খুব উঁচু ধর্ম—সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু মহাযান বুঝিতে, আয়ত্ত করিতে ও মহাযানের মতো কর্ম করিতে বহুকাল লাগে, অনেক পরিশ্রম করিতে হয়—অনেক পড়িতে হয়—অনেক ভাবনাচিন্তা করিতে হয়। ততটা সকলে পারিয়া উঠিত না। মহাযানের আচার্যেরা ইহার জন্য একটা সহজ পন্থা বাহির করিয়া দিয়াছিলেন—তাঁহারা বলিয়া দিয়াছিলেন, তোমরা 'ধারণী' মুখস্থ করো—'ধারণী' জপ করো—ধারণীর পুথি পূজা করো। তাহা হইলেই তোমাদের মহাযানের পাঠ, স্বাধ্যায়—যোগ—সকলের ফল হইবে। মনে করো 'প্রজ্ঞাপারমিতা' একখানি বৃহৎ গ্রন্থ—পড়িতে অনেক

দিন লাগে—আয়ত্ত করিতে আরো দিন লাগে—তাহার মতো কাজ করিতে আরো দিন লাগে। আচার্য বলিয়া দিলেন, 'প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়ধারণী'—মুখস্থ করো—তাহা হইলেই তোমার প্রজ্ঞাপারমিতা পাঠের সমস্ত ফল হইবে। এইরূপ যদি "ওঁ নমঃ সমস্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং, ওঁ কীলে কীলে তথাগতোহধ্যবসান্তে বরদে উত্তমোত্তমতথাগতে ভব ক্রীং ফট্ স্বাহা"—এইটি কণ্ঠস্থ করো, তা হইলে 'গন্ডব্যূহসূত্র' পাঠের ফল হইবে।

"ওঁ নমঃ সমস্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং, ওঁ ধুণু ধুণু ক্রীং ফট্ স্বাহা"—এই ধারণী পাঠ করিলে 'সমাধিরাজসূত্র' পাঠের ফল হইবে।

"ওঁ নমঃ সমস্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং, ওঁ মণিধরি বাজ্রণি মহাপ্রতিসরে ক্রীং ক্রীং ফট্ স্বাহা"—এই মন্ত্র পাঠ করিলে 'মহাপ্রতিসরা' পাঠের ফল হইবে।

এইরূপে যে কত ধারণী তৈয়ার হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। এক 'বৃহদ্ধারণী সংগ্রহে' আমরা চারি শত এগারোটি ধারণী পাইয়াছি। ক্রমে ধারণী মুখস্থ করাও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তখন এক অক্ষর—দুই অক্ষর—মন্ত্র হইতে লাগিল। মন্ত্রপাঠ, মন্ত্রজপ, বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল। তখন 'হুং' 'ফট্' 'ক্রীং' 'স্বাহা' এই সকল শব্দের প্রচুর ব্যবহার হইতে লাগিল। বৌদ্ধেরা ইহাতেই আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। যে মহাযান ধর্ম চিন্তাশক্তির চরম সীমায় উঠিয়াছিল মন্ত্রযানে তাহা ক্রমে 'হুং' 'ফট্' 'স্বাহা'য়—দাঁড়াইল। ইহা কি অধঃপাত নহে।

বৌদ্ধধর্মে দেবতার সংস্রব নাই—দেবতার পূজা-আর্চা হীনযানে ছিলই না। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কতদিন পরে বুদ্ধদেবের মূর্তি বিহারে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তাহা লইয়া ইউরোপীয় পন্ডিতগণের এখনো মতভেদ আছে—কেহ বলেন, চারি শত বৎসর পরে, কেহ বলেন, পাঁচ শত বৎসর পরে। ইন্ডিয়ান মিউজিয়মে গেলে গান্ধার-শিল্পের কুঠরিতে প্রথম বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি বুদ্ধের পাঁচ-ছয় শত বৎসর পরে নির্মিত হয়। মহাযানেও শাক্যসিংহের মূর্তি বিহারে বিহারে থাকিত। তাঁহারা উহাকে নির্বাণ লাভের উপায় বলিয়া মনে করিতেন। ক্রমে একটি একটি করিয়া ধ্যানীবুদ্ধ আসিতে লাগিলেন। প্রথম 'অমিতাভ', তারপর 'অক্ষোভ্য', তারপর 'বৈরোচন', তারপর 'রত্নসম্ভব', তারপর 'অমোঘসিদ্ধি' আসিয়া জমিলেন। ইন্ডিয়ান মিউজিয়মের মগধ-কুঠরিতে অনেকগুলি চৈত্য বা স্তূপ আছে। তাহার চারিদিকে চারিটি 'তথাগতের' মূর্তি আছে। প্রথম তথাগত 'বৈরোচন' স্তূপের মধ্যেই থাকিতেন। তাঁহার জন্য স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গি কাটা হইত না। ক্রমে তিনিও আসিয়া অগ্নিকোণে জমিলেন। শাক্যসিংহ তখন একেবারে উপায় হইয়া গিয়াছেন—স্তূপে তাঁহার স্থান নাই—তাঁহার স্থান বিহারের মধ্যস্থলে যে মন্দির—তাহাতে। তখনকার বৌদ্ধেরা বলিতেন, তিনি 'পঞ্চ তথাগতে'র অথবা পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের কলম মাত্র—তিনি পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের মত কলমবন্দি করিয়া

গিয়াছেন। ক্রমে এই পঞ্চ তথাগতের পাঁচটি শক্তি দাঁড়াইল। শক্তিগণের নাম—'লোচনা', 'মামকী', 'তারা', 'পান্ডরা', 'আর্যতারিকা'। বহুকাল অবধি তাঁহারা যন্ত্রে থাকিতেন, তাঁহাদের মূর্তি ছিল না—ক্রমে তাঁহাদেরও মূর্তি হইল। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের পঞ্চ শক্তিতে পাঁচ জন 'বোধিসত্ত্ব' হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে 'মঞ্জুশ্রী' ও 'অবলোকিতেশ্বর' প্রধান। বর্তমান কল্পে অর্থাৎ ভদ্রকল্পে 'অমিতাভ' প্রধান ধ্যানীবুদ্ধ। তাঁহার বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর—প্রধান বোধিসত্ত্ব। অবলোকিতেশ্বর করুণার মূর্তি। তিনি মহোৎসাহে জীব উদ্ধার করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার পূজা খুব আরম্ভ হইল। সেবকের উৎসাহ অনুসারে তাঁহার অনেক হস্ত হইতে লাগিল—অনেক পদ হইতে লাগিল—অনেক মস্তক হইতে লাগিল; তাঁহার পূজা একটা প্রকান্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। তারাদেবীও নানা রূপ ধারণ করিয়া বৌদ্ধদের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর অনেক ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী, ভৈরব, বুদ্ধগণের উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল। এব 'অভিধ্যানাত্তর তন্ত্রে' 'সম্বরবজ্র', 'পীঠপর্ব', 'বজ্রসত্ত্ব' 'পীঠদেবতা', 'ভেরুক' (হেরুক?) 'যোগবীর', 'পীঠমালা', 'বজ্রবীর-ষড়্‌যোগসম্বর', 'অমৃতসঞ্জীবনী', 'যোগিনী', 'কুলডাক', 'যোগিনী যোগ-হৃদয়', 'বুদ্ধকাপালিকযোগ', 'মঞ্জুবজ্র', 'নবাক্ষরালীডাক', 'বজ্রডাক', 'চোমক' প্রভৃতি অনেক ভৈরব ও যোগিনীর পূজাপদ্ধতি আছে। বোধিসত্ত্ব ও যোগিনীগণের ধ্যানকে সাধন বলে। যে পুস্তকে অনেক ধ্যান লেখা আছে তাহাকে 'সাধনমালা' বলে। একখানি 'সাধনমালা'য় দুই শত ছাপ্পান্নটি সাধন আছে। 'বজ্রবারাহী', 'বজ্রযোগিনী', 'কুরুকুল্লা', 'মহাপ্রতিসরা', 'মহামায়ূরী', 'মহাসাহস্র প্রমর্দ্দিনী' প্রভৃতি অনেক যোগিনীর ধ্যান ইহাতে আছে। এই-সকল সাধন লইয়া মূর্তি নির্মাণে বৌদ্ধকারিগরেরা এক সময়ে যথেষ্ট বাহাদুরি দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখন যোগিনী, ডাকিনী, ভৈরবীর পূজা লইয়া ও তাঁহাদের মূর্তি লইয়া বৌদ্ধধর্ম চলিতে লাগিল, তখন আর অধঃপতনের বাকি কী রহিল?

বৌদ্ধধর্মের মধ্যে 'গুহ্যপূজা' আরম্ভ হইল। লুকাইয়া লুকাইয়া পূজা করিব—কাহাকেও দেখিতে দিব না; এ পূজার অর্থ কী? অর্থ এই যে, যে-সকল দেবমূর্তি লোকের সম্মুখে বাহির করা যায় না। ঐ-সকল মূর্তির নাম—উহারা বলিত শম্বর। একে তো অশ্লীল মূর্তি—তাহাতে ভালো কারিগরের হাতের তৈয়ারি—তাহাতে অশ্লীলতার মাত্রা চড়িয়া গিয়াছে। সেই-সকল মূর্তি যখন বুদ্ধদের প্রধান উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল—তখন আর অধঃপাতের বাকি রহিল কী? সে-সকল উপাসনার প্রকার আরো অশ্লীল—সভ্যসমাজে বর্ণনা করা যায় না। একজন ইউরোপীয় পন্ডিত বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের এই-সকল পুথি 'ঘোমটা দেওয়া কামশাস্ত্র'। আমি বলি, তিনি ইহা ঠিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যেখানে কামশাস্ত্রের শেষ হয়, সেইখানে বুদ্ধদিগের গুহ্যপূজা আরম্ভ। অধিক পুথির নাম করিব না। 'গুহ্যসমাজ' বা 'তথাগত গুহ্যক' নামে বৌদ্ধদের একখানি পুথি আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন—

"....but in working it out, theories are indulged in, and practices enjoined which are at once the most revolting and horrible that human depravity could think of, and compared to which the worst specimens of Holiwell Street Literature of the last Century would appear absolutely pure." [S-B-I-M, p.261]

অর্থাৎ এই বড়ো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইঁহারা যে-সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে সকল ক্রিয়াকর্মের উপদেশ দিয়াছেন, যত জঘন্য স্বভাবেরই মানুষ হউক না কেন, তাহা অপেক্ষা ভয়ানক ও ঘৃণিত মত বা ক্রিয়াকর্মের কল্পনাও করিতে পারে না। ইহার সহিত তুলনা করিলে গত শতকে হোলিওয়েল স্ট্রিটে যে-সকল পুথি-পাঁজি বাহির হইত তাহা অতি পবিত্র বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধদেব প্রাণীহিংসার একান্ত বিরোধী ছিলেন, কিন্তু 'তথাগত গুহ্যকে' বলিতেছে—

'হস্তিমাংসং হয়মাংসং শ্বানমাংসং তথোত্তমম্।
ভক্ষয়েদাহারকৃত্যর্থন্ন চান্নস্তু বিভক্ষয়েৎ।।"
"অন্নং বা অথ বা পানং যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষয়েৎ ব্রতী।
বিণ্মূত্রমাংসযোগেন বিধিবৎ পরিকল্পয়েৎ।।"
"সময়চতুষ্টয়ং রক্ষ বুদ্ধজ্ঞানোদধিপ্রভোঃ।
বিন্মূত্রং তু সদা ভক্ষ্যমিদং গুহ্যং মহাদ্ভুতং।।"

এই তো গেল আহারের কথা। গুহ্যসিদ্ধি লাভ করিতে গেলে বিষ্ঠা, মূত্র নিশ্চয়ই খাওয়া চাই—নহিলে কিছুতেই সিদ্ধিলাভ হইবে না। অন্যকথা খুলিয়া বলিতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করা হয়, হয় তো পিনাল কোডের ধারায় পড়িতে হয়। তবে একটা কিছু না বলিলে নয়—তাই একটি নমুনা দিতেছি—

"দ্বাদশাব্দিকাং কন্যাং চন্ডালস্য মহাত্মনঃ।
সেবয়েৎ সাধকো নিত্যং বিজনেষু বিশেষতঃ ।।"

মোটকথা এই যে—

"দুষ্করৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈঃ সেব্যমানো ন সিদ্ধতি।
সর্ব্বকামোপভোগৈশ্চ সেবয়ংশ্চাশু সিদ্ধতি।।"

অর্থাৎ দুষ্কর কঠোর নিয়ম করিয়া সেবা করিলে কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হয় না—সর্বপ্রকার কামোপভোগ করিয়া যদি সেবা করো—তাহা হইলে নিশ্চয় শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হইবে।

বুদ্ধদেবের শীলরক্ষা, উচ্চাসন ও মহাসন ত্যাগ, মালাগন্ধবিলেপনাদি ত্যাগ, নৃত্যগীতবাদিত্রাদি ত্যাগ, প্রভৃতি কঠোর নিয়ম কোনো কাজেরই নয়, কেবল যথেচ্ছাচার করো—যথেচ্ছাচার করো—যথেচ্ছাচার করো। অধঃপাতের আর বাকি কী?

'তথাগত গুহ্যকে'র ন্যায় আরো অনেক পুস্তক আছে। 'চন্ডমহারোষণ তন্ত্র',

'চক্রসম্বর তন্ত্র', 'চতুষ্পীঠ তন্ত্র', উড্ডীষ তন্ত্র', 'সেকোদ্দেশ', 'পরমাদিবুদ্ধোদ্ধৃত কালচক্র', 'কালচক্রগর্ভতন্ত্র', 'সর্ব্ববুদ্ধসমাযোগ ডাকিনীজাল সম্বরতন্ত্র', 'হেবজ্রতন্ত্ররাজ', 'আর্য্যডাকিনীবজ্রপঞ্জরমহাতন্ত্ররাজকল্প', 'মহামুদ্রাতিলক', 'জ্ঞানগর্ভ', 'জ্ঞানতিলক' নামে 'যোগিনীতন্ত্ররাগপরমমহাদ্ভুত', 'তত্ত্বপ্রদীপ', 'বজ্রডাক', 'ডাকার্ণব', 'মহাসম্বরোদয়', 'হেরুকাভ্যুদয়', 'যোগিনীসঞ্চার্য্য', 'সম্পুট-তন্ত্র', 'চতুর্যোগিনী সম্পুট', 'গুহ্যবজ্র', ইত্যাদি। আর কত নাম করিব—কত নাম করিয়া পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি করিব? এ-সকল তন্ত্র 'তথাগত গুহ্যক' হইতে একবিন্দুও ভালো নয়। যখন এইরূপ শত শত পুস্তক আছে—সে-সকল পুস্তক পড়া হইত— সেইরূপ ক্রিয়াকর্ম হইত —তখন আর অধঃপাতের বাকি কী?

এ-সকল গুহ্যতন্ত্র—মূলতন্ত্র—সংগীতি আকারে লেখা। সংগীতির গোড়াতে এইরূপ থাকে, "এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন সময়ে ভগবান শ্রাবস্ত্যাং জেতবনে বিহরতি স্ম, অথবা "রাজগৃহে বেণুবুন্যে, বিহরতি স্ম", অথবা এইরূপ আর কোনো স্থানে "বিহরতি স্ম।" অর্থাৎ আমি শুনিয়াছি একদিন ভগবান্ শ্রাবস্তী নগরে অথবা রাজগৃহে বেণুবনে অথবা আরো এইরূপ কোথাও বেড়াইতেছেন। এই-সকল গুহ্য উপাসনার গ্রন্থগুলিও এইভাবে লেখা, তবে শ্রাবস্ত্যাং বিহরতি স্ম নাই—তাহার বদলে যাহা আছে তাহা কলমের মুখে আসে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে—এই-সকল গুহ্যবিদ্যার পুস্তকের আবার টীকা, টিপ্পনী, পঞ্জিকা, ব্যাখ্যা, বিবরণ, উহার প্রয়োগপদ্ধতিপ্রকরণ আছে। মূল যদি বিশখানি থাকে— টীকা-টিপ্পনীতে তাহা পাঁচ শত হইয়া দাঁড়ায়। একজন ইউরোপীয় লেখক বলিয়া গিয়াছেন—ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ খুঁজিতে গেলে এই-সকল জঘন্য বই ঘাঁটিতে হইবে। ভবিষ্যতে কোন্ হতভাগ্য পন্ডিতের অদৃষ্টে যে সে দুর্ভোগ আছে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সে দুর্ভোগে না ভুগিলেও এত বড়ো জাতিটা—এত বড়ো ধর্মটা—কেন যে অধঃপাতে গেল, তাহা তো বুঝা যায় না। তাই কাহাকেও-না-কাহাকে একদিন সে দুর্ভোগে ভুগিতেই হইবে। কিন্তু যে ভুগিবে সে সত্য সত্যই ভারতের একটা মহা-উপকার সাধন করিয়া যাইবে। সে অন্তত বলিবে—"বাপু! এ পথে আর আসিও না—এ পথে আসিলে অধঃপতন অবধারিত।"

বুদ্ধদেব দেবতা মানিতেন না। মানুষ আপনা হইতেই চরিত্রশুদ্ধি করিয়া ক্রমে লোকে যাহাদের দেবতা বলে তাহাদের অপেক্ষাও উচ্চ যে পরমপদ—যে পদে গেলে জন্ম-জরা-মরণের আর ভয় থাকিবে না—যে পদে গেলে সংসারের কোনো চিন্তা থাকে না—যে পদে গেলে মহাশান্তি লাভ করা যায়—সেই পদে উঠিতে পারিবে। তাঁহার শিষ্যেরা শেষ ডাক, ডাকিনী, যোগিনী, প্রেত, প্রেতিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, কটপূতনা, কঙ্কালিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা করিয়া আপনারাও অধঃপাতে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দেশটাসুদ্ধ অধঃপাতে দিল।

বৌদ্ধধর্মে অনেক দিন হইতেই ঘুণ ধরিয়াছিল। বুদ্ধদেব নিজে যেদিন স্ত্রীলোকদিগকে

দীক্ষা দিয়া ভিক্ষুণী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেইদিন হইতেই তাঁহাকে সংঘের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অনেক কঠোর নিয়ম করিতে হইয়াছিল। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের এক বিহারে থাকিতে দিতেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ-ছয় শত বৎসর পর হইতে ভিক্ষুরা ক্রমে বিবাহ করিতে লাগিল—ক্রমে একদল গৃহস্থ ভিক্ষু হইল। এইখানে হইতেই ঘুণ ধরা আরম্ভ হইল। সমাজে আসল ভিক্ষুদের খাতির অধিক ছিল। গৃহস্থ ভিক্ষুদের আদর তত ছিল না। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুদের নাম ছিল 'আর্য'। আসল ভিক্ষুরা আর্যদের নমস্কার করিতেন না, কিন্তু আর্যরা অনার্য হইলেও আসল ভিক্ষুদের নমস্কার করিতেন। এই গৃহস্থাশ্রমের ভিক্ষুরাই ক্রমে দলে পুরু হইতে লাগিল। কারণ তাহাদের সন্তান-সন্ততি হইত—তাহারা আপনা-আপনি ভিক্ষু হইয়া যাইত। একজন গৃহস্থ গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া যদি ভিক্ষু হইতে যাইত—তাহাকে প্রথম 'ত্রিশরণ' গ্রহণ করিতে হইত—তাহার পর 'পুণ্যানুমোদনা' শিখিতে হইত, 'পাপদেশনা' শিখিতে হইত, 'পঞ্চশীল' গ্রহণ করিতে হইত, 'অষ্টশীল' গ্রহণ করিতে হইত, 'দশশীল' গ্রহণ করিতে হইত, 'পোষধব্রত' ধারণ করিতে হইত—আরো কত কী করিতে হইত—অনেক সময় যাইত। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুর ছেলে—সে একেবারেই ভিক্ষু হইত। যে-সকল জিনিস অন্যকে বহুকালে শিখিতে হইত, সে সে-সকল বাড়িতেই শিখিত—তবে আমাদের যেমন এখন পইতা হয়—একটা সংস্করণ মাত্র—উহাদেরও ঐ রকম 'ত্রিশরণ গমন', 'পঞ্চশীল গ্রহণ', এক-একটা সংস্কারের মতো হইয়া যাইত। আমাদের দেশে যেমন 'জাত-বৈষ্ণব' বলিয়া একটা জাতি হইয়াছে—সেকালেও দেশে তেমনি 'জাত-ভিক্ষু' বলিয়া একটা জাতির মতো হইয়াছিল। উহাদের যত দলপুষ্টি হইতে লাগিল, আসল ভিক্ষুদের অবস্থা তত হীন হইতে লাগিল। গৃহস্থ ভিক্ষুরা কারিগরি করিয়া জীবন নির্বাহ করিত—ভিক্ষাও করিত—কেহ বা রাজমজুর হইত, কেহ বা রাজমিস্ত্রি হইত, কেহ বা চিত্রকর হইত, কেহ বা ভাস্কর হইত, কেহ বা স্যাকরা হইত, কেহ বা ছুতার হইত—অথচ ভিক্ষাও করিত, ধর্মও করিত, পূজা-পাঠও করিত। বৌদ্ধধর্মের পৌরোহিত্যটা ক্রমে নামিয়া আসিয়া কারিগরদের হাতে পড়িল। যে কাজে পরিশ্রম কম—ঘরে বসিয়া করা যায় একটু হাত পাকিলে কাজও ভালো হয়—দু' পয়সা আসেও বেশি, গৃহস্থ ভিক্ষু সেই-সকল কাজ করিত। সুতরাং তাহাদের ধর্ম করিবার সময়ও থাকিত—বড়ো বড়ো উৎসবে দু' চার পয়সা খরচও করিতে পারিত। কিন্তু বেশি লেখাপড়া শেখা, ধ্যান-ধারণা করা, ভাবনাচিন্তা করার সময়ও থাকিত না—প্রবৃত্তিও থাকিত না। তাহা হইলেই মোট দাঁড়াইল এই যে, বৌদ্ধধর্মের পৌরোহিত্যটা মূর্খ কারিগরদের হাতে পড়িয়া গেল। আসল ভিক্ষুরা বিহারে থাকিতেন। বিহারের জমিজমার আয় হইতে কোনোরূপে দিন গুজরান করিতেন। ক্রমে রাজারা প্রায় বিধর্মী হইয়া উঠিলেন। বৌদ্ধ-পন্ডিত হইলে যে রাজসম্মান পাইবেন তাহার উপায় রহিল না। রাজারাও ছোটো ছোটো রাজা—আপনাদের পন্ডিত পোষণ করিয়া আবার যে বিধর্মী বৌদ্ধ-পন্ডিত

প্রতিপালন করিবেন, তাঁহাদের সে সাধ্য ছিল না—থাকিলেও তাঁহাদের পন্ডিতেরা তাহা করিতে দিত না। সুতরাং আসল ভিক্ষুদের এবং তাহাদের বিহারের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে আফ্‌গানিস্তানের উপত্যকা হইতে পাঠানেরা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া এবং মুসলমান ধর্ম প্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাফের বলিয়া তাঁহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য বঙ্গ দেশে আসিয়া পড়িলেন। যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরেরা এখনো আসিতেছেন। ইঁহাদের পূর্বপুরুষেরা ইঁহাদের অপেক্ষা যে বেশি জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তখন বাংলায় তো সেনবংশ রাজা—কিছু বড়ো রাজা মাত্র। আশেপাশে চারিদিকে অনেক ছোট ছোট রাজা ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধও ছিলেন। বল্লালের সময় ব্রাহ্মণদের একটা আদমসুমারি লওয়া হয়। সে সময়ে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র আট শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। আট শত ঘর ব্রাহ্মণে যতটুকু হিন্দু করিয়া লইতে পারে, দেশের ততটুকু হিন্দু ছিল—অবশিষ্ট সবই বৌদ্ধ। বৌদ্ধেরা পুতুল পূজা খুব করিত। সুতরাং মুসলমান আক্রমণের রোকটা বৌদ্ধদের উপরই পড়িয়া গেল। তাঁহারা বৌদ্ধদের বিহারগুলি সব ভাঙিয়া ফেলিলেন। এক ওদন্তপুরী বিহারেই দুই হাজার আসল ভিক্ষু বধ হইল। বিহারটি ভাঙিয়া ফেলা হইল; পাথরের মূর্তিগুলি ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলা হইল; পুথিগুলি পোড়াইয়া দেওয়া হইল। বিক্রমশীল বিহারেরও এই দশাই হইয়াছিল। নালন্দা জগদ্দল প্রভৃতি বড়ো বড়ো বিহারের এই দশা হইল। ওদন্তপুরী বিহারের ঢিবি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে—নালন্দা বিহারেরও ঢিবি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। বিক্রমশীল ও জগদ্দলের এখনো কোনো খোঁজ হয় নাই। আসল ভিক্ষু এই সময় হইতেই একরূপ লোপ হইয়াছে। যাহারা পলাইয়াছিল তাহারা নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়ায় চলিয়া গিয়াছিল, কতক বর্মায় ও সিংহলে গিয়াছিল। সুতরাং বাংলায় বৌদ্ধদের বিদ্যাবুদ্ধি, পুথি-পাঁজির এই পর্যন্ত শেষ।

এক-একবার মনে হয় তিন-চারি শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া যে নিজেও অধঃপাতে গিয়াছিল এবং দেশটাকে সুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের সেই ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধিলাভের চেষ্টা, ভূতপ্রেত পূজা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তিকেই ধর্ম বলিয়া মনে করা ও তাহাই শিখানো—এই সকলের পরিণামে তাহাদিগকে বঙ্গ দেশ চিরকালের জন্য ছাড়িতে হইল। দেশে রহিল—কারিগর পুরোহিত ও তাহাদেরই যজমান। লেখাপড়া বুদ্ধিবিদ্যার নামগন্ধ পর্যন্ত বৌদ্ধদের মধ্যে লোপ পাইল। ইহার পর কী হইল পরে বলা যাইবে।

'নারায়ণ', আশ্বিন, ১৩২২

বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল?

মুসলমানের আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম বাংলা হইতে লোপ হইয়াছে একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু যেখানে মুসলমান যাইতে পারেন নাই, সেখানে বৌদ্ধধর্ম কিছু কিছু ছিল। ইংরাজেরা যেরূপ সমস্ত দেশ একেবারে দখল করেন, মুসলমানেরা সেরূপ পারেন নাই। অনেক স্থানেই যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের ছোটো ছোটো রাজ্য দখল করিতে হইয়াছিল। গিয়াসুদ্দিন বোলবন্ যখন তুগ্রলের বিদ্রোহ দমনের জন্য বাংলায় আসিয়াছিলেন, তখন তিনি ১২৮০ খৃঃ অব্দে সোনারগাঁওয়ের রাজার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন নবদ্বীপ ও গৌড়জয়ের পর পূর্ব-বাংলা জয় করিতে মুসলমানদের প্রায় একশত কুড়ি বৎসর লাগে। সোনারগাঁওয়ের রাজারা যে সব হিন্দু ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। কারণ পূর্ব-বাংলায় অনেক বৌদ্ধ ছিল। আমরা বাংলা অক্ষরে লেখা একখানি 'পঞ্চরক্ষা'র পুথি পাইয়াছি। পুথিখানি ১২১১ শকাব্দায় বা ১২৮৯ খৃঃ অব্দে লেখা। 'পঞ্চরক্ষা'র পুথিখানি বৌদ্ধ, উহাতে পাঁচখানি পুথি আছে। পাঁচখানিই আরম্ভ হয়—

"এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন সময়ে ভগবান্" ইত্যাদি। লেখক বলিতেছেন এ সময়ে পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমসৌগত মধুসেন আমাদের রাজা। মধুসেন যে পূর্ব-বাংলারই রাজা ছিলেন একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না, তবে কুলগ্রন্থে বল্লালের পর মধুসেন বলিয়া একজন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য প্রমাণ না পাইলে আমরা মধুসেনকে বল্লালসেনের বংশধর বলিতে চাহি না। তবে ১২৮৯ খৃস্টাব্দে বাংলা দেশে একজন স্বাধীন বৌদ্ধরাজা ছিলেন একথা বেশ বলা যায়। এবং তাঁহার দেশে যে অনেক বৌদ্ধ বাস করিত সেকথাও বলা যায়।

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি চৌদ্দ শতকের শেষকালে তাঁহার প্রসিদ্ধ স্মৃতির গ্রন্থ-সকল রচনা করেন। এই-সকল গ্রন্থের মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকঃ' খুব চলিত। তিনি একটি বচন তুলিয়াছিলেন যে নগ্ন দেখিলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। নগ্ন শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"নগ্নাঃ বৌদ্ধাদয়ঃ"। বৌদ্ধ না থাকিলে তিনি এরূপ অর্থ করিতে পারিতেন না। আমি একখানি বাংলা অক্ষরে তালপাতায় লেখা 'বোধিচর্য্যাবতারে'র পুথি পাইয়াছি। সেখানি বিক্রম সংবতের ১৪৯২ অব্দে লেখা অর্থাৎ ইংরাজি ১৪৩৬ সালে। 'বোধিচর্য্যাবতার'খানি মহাযানের পুথি-বৌদ্ধদিগের গভীর দর্শনের পুঁথি। পুথিখানি সোহিনচরী প্রদেশে বেণুগ্রামে মহত্তর মাধবমিত্রের পুত্রের জন্য নকল করা হয়। একজন বৌদ্ধভিক্ষু উহা লেখেন আর একজন উহার পাঠ মিলাইয়া দেন। সুতরাং বাংলার অনেক কায়স্থ যে তখনো বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন একথা বেশ বোধ হয়। কেম্ব্রিজে একখানি বাংলা হাতে তালপাতায় লেখা বৌদ্ধধর্মের পুথি আছে। সেখানি

ইংরাজি ১৪৪৬ সালে লেখা। সেখানি মূল কালচক্রতন্ত্রের পুথি। পুথিখানি শাক্যভিক্ষু জ্ঞানশ্রী কোনো বিহারে দান করিয়াছিলেন। লেখক মগধদেশীয় ঝাড়গ্রামনিবাসী করণকায়স্থ শ্রীজয়রাম দত্ত। উহাতে লেখা আছে "পরম ভট্টারক ইত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ" অর্থাৎ জয়রাম দত্ত পূর্বে আরো অনেক পুথি নকল করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মে ঐরূপ আর-একখানি তালপাতার পুথি আছে, সেখানি ১৪৭৯ বিক্রম সংবৎ বা ১৪২৩ খৃঃ অব্দে লেখা। এখানি কাতন্ত্রের উণাদিবৃত্তি। বৌদ্ধ-স্থবির শ্রীবররত্ন মহাশয় আপনার পাঠের জন্য লিখাইয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন কপলিয়া গ্রামের কায়স্থ শ্রীবাগীশ্বর। ব্রিটিশ মিউজিয়মে শ্রীবররত্নের জন্য লেখা আরো অনেকগুলি কাতন্ত্র ব্যাকরণের পুথি আছে। তাহার মধ্যে দুই-একখানি বাংলা ভাষায়ও লেখা আছে। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে তৎকালে বাংলা দেশে বৌদ্ধ বিহার ছিল, বৌদ্ধ স্থবির ছিলেন। তাঁহারা ব্যাকরণশাস্ত্র বিশেষ যত্ন করিয়া পড়িতেন। শ্রীবররত্নের যে-সকল বিশেষণ দেওয়া আছে তাহাতে তিনি যে মহাযানমতাবলম্বী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একটি বিশেষণ এই "শূন্যত্যসর্ব্বকারবরোপেত মহাকরুণী" "সর্ব্বালম্বনবিবর্জ্জিতাদ্বয়বোধিচিত্ত-চিন্তা-মণিপ্রতিরূপক"। সুতরাং পনেরো শতকেও বাংলায় অনেক জায়গায় বৌদ্ধ ছিল এবং বৌদ্ধধর্মের পুথি-পাঁজিও লেখা হইত। এই শতকে রাঢ়ীশ্রেণী মহিন্তা গাঁই বৃহস্পতি নামে একজন বড়ো পন্ডিত গৌড়ের সুলতান, রাজা গণেশও তাঁহার মুসলমান উত্তরাধিকারীগণের নিকট "রায়মুকুট" এই উপাধি পাইয়াছিলেন এবং তিনি একখানি স্মৃতি, অনেকগুলি কাব্যের টীকা ও 'অমরকোষে'র একখানি টীকা লিখিয়া বাংলা দেশে সংস্কৃতশিক্ষার বিশেষ উপকার করিয়া যান। তাঁহার 'অমরকোষের' টীকা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি ঐ টীকায় চৌদ্দ-পনেরোখানি বৌদ্ধ-পুস্তক হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার 'অমরকোষের' টীকার তারিখ ইংরাজি ১৪৩১ সাল। তাহা হইলে তখনো বৌদ্ধ-শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ছিল এবং ব্রাহ্মণেরাও অন্তত শব্দশাস্ত্রের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বৌদ্ধ পুথি পড়িতে বাধ্য হইতেন—একথা বেশ বুঝা যায়।

চৈতন্যদেবের তিরোভাব হয় ইংরাজি ১৫৩৩ সালে। তাহার পর তাঁহার অনেকগুলি জীবনচরিত লেখা হয়। চূড়ামণি দাস একখানি চৈতন্যচরিত লেখেন। তাহাতে লেখা আছে চৈতন্যের জন্ম হইলে সকলেই আনন্দিত হয়, তাহার মধ্যে বৌদ্ধেরাও আনন্দিত হয়। জয়ানন্দ আর-একখানি চৈতন্যচরিত লিখিয়াছিলেন। তিনি পুরীর জগন্নাথদেবকে বৌদ্ধমূর্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ১৬ শতকেও বৌদ্ধেরা বাংলা হইতে একেবারে লোপ পায় নাই।

১৭ শতকে মঙ্গোলিয়া দেশে উর্গা নামক নগরে এক মহাবিহারে তারনাথ নামে একজন প্রসিদ্ধ লামা ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা কিরূপ আছে জানিবার জন্য ১৬০৮ সালে বুদ্ধগুপ্ত নাথ নামে একজন লামাকে পাঠাইয়াছিলেন।

তিনি জগন্নাথ ও তৈলঙ্গ ঘুরিয়া বাংলা দেশে আসেন। তিনি কাশ্রমগ্রাম ও দেবীকোট, হরিভঞ্জ, ফুকবাদ, ফলগ্রু প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। এই-সকল স্থানেই অনেক বৌদ্ধ-পন্ডিত ছিলেন, অনেক বৌদ্ধ পুথি-পাঁজি ছিল, বৌদ্ধধর্মও খুব প্রবল ছিল। হরিভঞ্জ বিহারের ধর্ম-পন্ডিতের নিকট তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নানারূপ শিক্ষালাভ করেন। হেতুগর্ভধন নামে একজন পন্ডিত উপাসিকা তাঁহাকে নানারূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইখানে তিনি অনেক সূত্রের মূলগ্রন্থ দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাংলার বাহিরেও তিনি অনেক স্থানে বৌদ্ধধর্মের উন্নতি দেখিতে পান। কিন্তু সে-সকল কথায় আমাদের কাজ নাই। তাঁহার সময়ে রাঢ়ে ও ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্ম বেশ প্রবল ছিল। তিনি বোধগয়ায় মহাবোধি মন্দিরে ও বজ্রাসনের নিকটে অনেক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি এই অঞ্চলে কোনো বিহারে জনকায় সিদ্ধনায়ক ডাক প্রভৃতি অনেক মন্ডলের চিত্র দেখিয়াছিলেন। তিনি তৈলঙ্গ, বিদ্যানগর, কর্ণাট প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক ঘুরিয়াছিলেন। তিনি শান্তিগুপ্ত নামে একজন সিদ্ধের নিকট দীক্ষিত হইয়া "নাথ" উপাধি পাইয়াছিলেন। সেই অবধি তাঁহার নাম হইয়াছিল "বুদ্ধগুপ্ত নাথ"। যোগিনী দিনকরা ও মহাগুরু গম্ভীরমতির নিকট তিনি অনেক অলৌকিক ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। তিনি মহোত্তর সুধীগর্ভের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। রাজগৃহের গৃধ্রকূট গিরি গুহায় ও প্রয়াগে অনেক বড়ো বড়ো তীর্থস্থান দেখিয়াছিলেন। তিনি খগেন্দিরি পাহাড়ের উপর যোগীদের থাকিবার জন্য এক প্রকান্ড বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

নেপালে ললিতপত্তন নামে এক নগর আছে। উহাকে এখন "পাটন" বলে। এখানকার একজন বজ্রাচার্য ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে তীর্থ করিতে আসিয়া কিছুদিন মহাবোধিমন্দিরের নিকট বাস করেন। তখন তাঁহাকে স্বপ্ন হয়, তিনি যেন মহাবোধি স্তূপের মতো একটি স্তূপ নিজের দেশে নির্মাণ করেন। তিনি তিন বৎসর মহাবোধিতে থাকিয়া একটি চিত্র আঁকিয়া লইয়া যান এবং পাটনে মহাবোধি নামে এক বিহার নির্মাণ করেন। উহার ঠিক মধ্যস্থলে মহাবোধি স্তূপ নির্মাণ করেন। পাটনের সে বিহার ও সে স্তূপ আজও আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বোধগয়ার মন্দির ইংরাজেরা মেরামত করিয়া দিলে যেরূপ হইয়াছে সেটিও ঠিক সেইরূপ! মহাবোধি বিহারের বজ্রাচার্যেরা নেপালের বৌদ্ধদিগের মধ্যে আজিও অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়া আসিতেছেন।

আঠারো শতকের প্রথমে কাশীতে নাথুরাম নামে একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহাকে লোকে নথমল ব্রহ্মচারী বলিত। বদরিকাশ্রমের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি নামে বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বড়ো কিছু জানিতেন না। তাঁহার সংস্কার ছিল সংবৎ ১৭৫৫, ৮ই মাঘ বুদ্ধদেব বদরিকাশ্রমে অবতীর্ণ হইবেন। ৫ই মাঘ বিষ্ণু শিব গণপতি শক্তি এবং সূর্য নথমলের নিকট আসিয়া তাঁহাকে মুখভাষাগ্রন্থ লিখিতে বলেন। সেই গ্রন্থে বুদ্ধের অবতার হওয়া, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রভৃতি অনেক

কথা লেখা থাকিবে। তিনিও সেইমতো কাশীর রামাপুরায় থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় চারি-পাঁচজন বিদ্যার্থীর সাহায্যে সাড়ে-বারো লক্ষ শ্লোকে এক প্রকাণ্ড পুস্তক লেখেন। ঐ পুস্তকের খানিক খানিক কাশীর পুথিওয়ালাদের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়। খানিকটা এশিয়াটিক সোসাইটিতেও আছে। কিন্তু সেটা মূল পুথি নয়—নকল করা। পুথির নাম এখন হইয়াছে 'বুদ্ধচরিত'। বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া শূরসেন দেশে বুদ্ধনামক এক দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিলেন।

মুসলমানেরা যখন ভারতবর্ষ অধিকার করেন তখন ভারতবর্ষে যে একটা বৌদ্ধ বলিয়া প্রবল ধর্ম ছিল তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা ভারতবাসী সভ্যজাতিমাত্রকেই হিন্দু বলিতেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম দুই-ই তাঁহাদের কাছে হিন্দুধর্ম ছিল। মিন্‌হাজ ওদন্তপুরী বিহার বিনাশের যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন যে, মুসলমানেরা দুই হাজার সব মাথা কামানো ব্রাহ্মণকে বধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা "ওদন্তপুরী" বিহারকে "ওদনন" বিহার বলিতেন। সব মাথা কামানো ব্রাহ্মণ হইতে পারে না একথা বোধহয় বাঙালি পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। সন্ন্যাসীরাই সব মাথা কামায়। বিহারের ভিক্ষুরা সব মাথা কামাইতেন যেহেতু তাঁহারাও সন্ন্যাসী ছিলেন। আকবরের সময় নানা দেশের ও নানা ধর্মের পণ্ডিতগণ তাঁহার সভায় উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার সভায় কোনো বৌদ্ধ-পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন না। ইংরাজেরা যখন প্রথম বাংলা হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তখনো তাঁহারা ইংরাজ-অধিকৃত দেশে কোনো বৌদ্ধ দেখিতে পান নাই। কিরূপে বৌদ্ধদের নাম পর্যন্ত এদেশে লোপ হইয়া গেল, তাহা জানিতে হইলে প্রথম বৌদ্ধদের ইতিহাস জানা চাই। পূর্বে অনেক বার লেখা হইয়াছে যে, শেষ অবস্থায় বৌদ্ধেরা বড়ো কদাচারী হইয়াছিল—অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়াছিল এবং তাহারা শেষ অবস্থায় ধর্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিল সে অতি কদাকার। সেইজন্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে প্রথমে বিদ্রূপ করিতেন, পরে ঘৃণা করিতেন। বিদ্রূপের একটা উদাহরণ 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়। হিন্দুরাজারাও বৌদ্ধদের বিরক্ত করিতে ত্রুটি করিতেন না। আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, যেখানে দেবোত্তর ভূমি আছে তাহার নিকটে ব্রাহ্মণকে "ব্রহ্মোত্তর" দিবে না। কিন্তু সেন রাজাদের ব্রহ্মোত্তর দানে দেখা যায় যে উহার একসীমা "বুদ্ধবিহারী দেবমঠঃ"। কিন্তু বৌদ্ধদের প্রধান শত্রু রাজারাও ছিলেন না—ব্রাহ্মণরাও ছিলেন না—শৈব-যোগীরাই উহাদের প্রধান শত্রু ছিল। শেষ কালের বৌদ্ধগ্রন্থ-সকলে দেখিতে পাওয়া যায় শৈব-যোগীদের উপর উহাদের বড়োই রাগ। 'স্বয়ম্ভূপুরাণ' নেপালের রাজা যক্ষমল্লের সময়ে লেখা হয়। তিনি ইংরাজি চৌদ্দ শতকের শেষে রাজত্ব করিতেন। 'স্বয়ম্ভূপুরাণে'র শেষে শৈবদিগকে বিস্তর গালি দেওয়া আছে। বাংলাতেও বোধহয় শৈব-যোগীরাই ক্রমে প্রবল হইয়া বৌদ্ধদের নাম পর্যন্ত লোপ করিয়াছে। চৈতন্যদেব অনেক নীচ অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধার করিয়াছেন। অনেক সময়

মনে হয়, এই সকল নীচ অস্পৃশ্য জাতিরা পূর্বে বৌদ্ধ ছিল, এখন বৈষ্ণব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাতেও বৌদ্ধধর্মের নাম ক্রমে লোপ পাইয়াছে।

কিন্তু বাঙালির আশেপাশে বিশেষ উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ ছিল। দার্জিলিং, শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থানে অনেক বৌদ্ধ বাস করিত ; নেপালে অনেক বৌদ্ধ ছিল ; চাটগাঁয়ে অনেক বৌদ্ধ ছিল। চাটগাঁ ও ত্রিপুরার পাহাড়ে বরাবরই বৌদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যে নেপালি বৌদ্ধেরাই সেকালের ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধদের উত্তরাধিকারী। দার্জিলিঙের বৌদ্ধেরা প্রায়ই তিব্বত হইতে তাহাদের বৌদ্ধধর্ম লাভ করিয়াছে। সিকিম ও দার্জিলিঙে কিরূপে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে তাহার কতক ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। সেটা সমস্ত তিব্বত হইতে আসা। নেপালেও তিব্বতিরা আপনাদের প্রভাব কিছু কিছু বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু নেপালের অধিকাংশ বৌদ্ধই পুরানো ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ।

চট্টগ্রামে যে বৌদ্ধেরা আছেন তাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ নহেন। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে তাঁহারা আরাকান হইতে বৌদ্ধধর্মে লাভ করেন, সে ধর্মও বর্মা ও সিংহল হইতে আসিয়াছে। রাঙামাটিতে যে-সকল বৌদ্ধ আছেন তাঁহারা যদিও এখন চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের শিষ্য, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক আচার-ব্যবহার আছে, তাহাতে বোধহয় তাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ, কিন্তু নিকটবর্তী চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের সংস্রবে আসিয়া তাঁহারা অনেক পরিমাণে হীনযান মত গ্রহণ করিয়াছেন।

উড়িষ্যার জঙ্গলে বৌদ্ধধর্ম একেবারে লোপ পায় নাই। বোধ নামে যে একটি করদ মহল আছে, তাহার নামেই প্রকাশ যে, উহাতে এখনো বৌদ্ধধর্ম বর্তমান আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে মহামান্য শ্রীযুক্ত সার এডওয়ার্ড গেট সাহেব [Edward Albert Gait] আমাকে কয়েকখানি উড়িয়া পুথি ও কতকগুলি কাগজপত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে বেশ বোধহয় যে উড়িষ্যার সরাকি তাঁতিরা এখনো বৌদ্ধ। তাঁহাদের বিবাহের সময় বুদ্ধদেবের পূজা হইয়া থাকে। এই সরাকি তাঁতি যে কেবল জঙ্গল মহলেই আছেন এমন নহে। পুরী জেলার দুই-একটি থানায় এবং কটকের কয়েকটি থানায় সরাকি তাঁতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারাও স্পষ্ট বুদ্ধদেবের পূজা করিয়া থাকেন। আমাদের বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায়ও সরাকি তাঁতি আছেন। তাঁহারা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হিন্দু হইয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের সহিত তাঁহাদের কোনো সম্পর্ক নাই।

কাজে বৌদ্ধ, নামেও বৌদ্ধ, এরূপ লোক অনেক খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। কিন্তু খাঁটি বৌদ্ধ আছে, অথচ নাম পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, এরূপও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিরূপে এই সকল বৌদ্ধকে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত আগামী বারে দেওয়া যাইবে।

'নারায়ণ', পৌষ, ১৩২২

এখনো একটু আছে

পাঠানেরা তিন-চারি শত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন না যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম ছিল। মোগলেরা দুশো আড়াইশো বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাও জানিতেন না যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম ছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমেও সেকথা জানা ছিল না। ইউরোপীয়েরা জানিতেন যে সিংহল, বর্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশেই বৌদ্ধধর্ম চলিত—সে ধর্মের ভাষা পালি, ধর্মযাজকেরা ভিক্ষু, বিবাহ করেন না—ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৮১৬ সালে নেপালের সঙ্গে ইংরাজদের সন্ধি হয় ; সেই সন্ধির বলে ইংরাজরা নেপালের রাজধানীতে একজন রেসিডেন্ট রাখেন। হজ্‌সন সাহেব বহুদিন সেই রেসিডেন্সির ডাক্তার থাকেন, পরে তিনি রেসিডেন্টও হন। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে এক নূতন রকমের বৌদ্ধধর্ম দেখিতে পান। ১৮২৬ সালে তাঁহার পণ্ডিত অমৃতানন্দ 'ধৰ্ম্মকোষ সংগ্রহ' নামে একখানি বৌদ্ধ-গ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিয়া হজ্‌সন সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন। হজ্‌সন সাহেব বৌদ্ধধর্ম ও নেপাল সম্বন্ধে যে-সকল পুস্তক লিখিয়াছেন তাহার অনেক মালমসলা এই সংস্কৃত পুস্তক হইতে সংগ্রহ করা।

হজ্‌সনের পুস্তক পড়িয়া লোকের বিশ্বাস হয় যে, মহাযান নামে একপ্রকার বৌদ্ধধর্ম বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে চলিতেছিল এবং ভারতবর্ষ হইতেই সেই ধর্ম চীন, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে—ক্রমে চীন ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত অনেক সংস্কৃত পুস্তকের তর্জমা দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহাতে লোকের আগ্রহ আরো বাড়িয়া ওঠে। হজ্‌সন সাহেব বৌদ্ধধর্মের অনেক সংস্কৃত পুথি নকল করাইয়া কলিকাতা, প্যারিস ও লণ্ডন নগরে পাঠাইয়া দেন। নেপাল রেসিডেন্সির আর-একজন ডাক্তার, রাইট সাহেব [Daniel Wrights] অনেকগুলি তালপাতার ও কাগজের বৌদ্ধ পুথি সংগ্রহ করিয়া কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিকে দেন।

হজ্‌সন সাহেব কলিকাতায় যে-সকল পুথি দেন, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৭৮ সালে তাহার ক্যাটালগ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার পীড়া হয় ; তিনি আমাকে তাঁহার সাহায্য করিতে বলেন। আমিও সাধ্যানুসারে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলাম। ১৮৮২ সালে তাঁহার ক্যাটালগ বাহির হয়। উহার নাম *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* [১৮৮২ খৃ.]। ঠিক এই সময় বেন্ডল সাহেব [Cecil Bendall], রাইট সাহেব কেম্ব্রিজে যে পুথিগুলি দিয়াছিলেন, তাহার ক্যাটালগ করিতেছিলেন। তাঁহার ক্যাটালগ [*Catalogue of Buddhist Sanskrit Mss. in the University Library of Cambridge*] ১৮৮৩ সালে বাহির হয়। ক্যাটালগ বাহির করার পরই তিনি একবার ভারতবর্ষে আসেন এবং নেপাল বেড়াইয়া

যান। তিনি কলিকাতায় আসিলে আমার সহিত তাঁহার আলাপ হয়।

আমরা অনেক সময় আশ্চর্য হইয়া যাইতাম যে, এই যে এত বড়ো বৌদ্ধধর্ম, যাহা বাংলা বেহার হইতেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, বাংলায় তাহার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি চলিয়া গেলে আমি মনে মনে স্থির করি, বৌদ্ধধর্ম বাংলায় কী রাখিয়া গিয়াছে খোঁজ করিতে হইবে। এমনি দেখিলে তো বোধহয় কিছুই রাখিয়া যায় নাই। বেহারে তবু ভাঙা বাড়িং লি আছে, বাংলায় তাও নাই। এই সময় 'বঙ্গবাসী'র যোগেনবাবু [যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু] ঘনরামের ধর্মমঙ্গল প্রকাশ করেন। সে বইখানা পড়িয়া মনে হয় যে ধর্মপূজাই হয় তো বৌদ্ধধর্মে শেষ অবস্থা। ধর্মঠাকুর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের উপর, তাঁর পুরোহিত ডোম, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের সম্বন্ধ বড়ো বেশি নাই। তখন ধর্মঠাকুরের পূজা দেখিতে বড়ো ইচ্ছা হয়।

পাটুলির নিকট সুঁয়াগাছি গ্রামে এক ময়রার বাড়ি ধর্মঠাকুর আছেন শুনিয়া দেখিতে যাই। ঠাকুর খুব জাগ্রত, তাঁর কাছে মানত করিলে সব রকম পেটের অসুখ আরাম হয়। রথের মতন থাক্-থাক্ করা এক সিংহাসন, তাহার উপর ঠাকুর আছেন। ঠাকুর একখানি কালো পাথর বলিয়া মনে হইল, পাথরে যেন পিতলের paper-fastener বসানো আছে, সেগুলি ঠাকুরের চোখ। ভক্তিভাবে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কিছু পূজা দিয়া ময়রাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাপু, তুমি কী মন্ত্রে ঠাকুর পূজা করিয়া থাক ও ঠাকুরের ধ্যান কী?" অনেক পীড়াপীড়ির পর সে ধ্যানের মন্ত্রটি বলিল ; মন্ত্রটি এই—

যস্যান্তো নাদিমধ্যো নচ করচরণং নাস্তি কায়নিদানং
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্ম ঝ [চ] যস্য।
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনহিতং সর্ব্বলোকৈকনাথং
তত্ত্বং তঞ্চ নিরঞ্জনং [ম] মরবরদ পাতু বঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ॥

আবার শুনিলাম মুক্‌সিমপাড়ার কাছে জামালপুরে এক ধর্মঠাকুর আছেন। তিনি বড়ো জাগ্রত, যে যা মানত করে, সে তাহা পায়। ঠাকুর বড়ো রাগি, কোনোরূপ ত্রুটি হইলে হঠাৎ মন্দ করিয়া বসেন। তিনি চালাঘরে থাকিতে ভালোবাসেন, কেহ কোঠাঘর করিয়া দিতে চাহিলে তাহার সর্বনাশ হইয়া যায়। তিনি যেখানে বসিয়া আছেন, তাহার মাথার উপর চালে খড় কখনই থাকে না। বৈশাখ মাসে পূর্ণিমার দিন তাঁহার ওখানে মেলা হয়, সে মেলায় ১০০০/১২০০ পাঁঠা পড়ে, অনেক শুয়ার ও মুরগিও পড়ে। আগে সামনেই শুয়ার মুরগি বলি হইত, এখন মন্দিরের পিছন দিকে হয়। এই-সকল শুনিয়া জামালপুরের ধর্মঠাকুর দেখিবার জন্য বড়োই আগ্রহ হইল। জামালপুর গেলাম ; গিয়া দেখি সামনে দাওয়ার চালে অসংখ্য ঢিল ঝুলিতেছে ; ন্যাকরার ফালি, কাপড়ের পাড়, পাটের দড়ি, শণের দড়ি, নারিকেল দড়ি প্রভৃতিতে ঢিল ঝোলানো আছে। কেহ কিছু মানত করিলে, একটি ঢিল ঝুলাইয়া আসে এবং

মনোরথ পূর্ণ হলেই ঢিলটি খুলিয়া লয়। আমি অনেকক্ষণ মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইলাম ; আমার বোধ হইল মন্দিরের পিছনে একটা স্তূপ ছিল—তাহার গোল তলাটা মাত্র পড়িয়া আছে। তলা একেবারে মাটির সমান। মন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড মনসাসিজের গাছ, গাছের দুটা ডালের মধ্যে একখানা একটু পালিশ করা পাথর। সিজগাছের দুটা ডালের মাঝখানে পাথরখানা অনেক দিন আগে রাখা হইয়াছিল—তার পর ডাল বাড়িয়া উঠিয়াছে—দু-দিক হইতে পাথরখানাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। অনেক টানিয়া পাথরখানা বাহির করিলাম—দেখিলাম উহাতে একটি বড়ো কারিকুরি করা W লেখা আছে। এইরূপ W-ই প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্বে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের চিহ্ন ছিল। মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বে একটা প্রকাণ্ড গাছ, অশ্বত্থ কি বট মনে নাই—গাছের তলায় বিস্তর আস্‌শেওড়ার গাছ। আস্‌শেওড়ার বনের মধ্যে একখানা পাথর পড়িয়া আছে। পাথরখানা তুলিয়া লইয়া দেখিলাম উহাতে একটি নাগকন্যার মূর্তি। কন্যার মাথার উপরে কয়েকটি নাগ ফণা ধরিয়া রহিয়াছে। ইহাকে মনসার মূর্তি বলা যাইতে পারে।

আমি থাকিতে থাকিতেই একজন জীর্ণ শীর্ণ ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিলেন। আমি দেখলাম একটি মাটির বেদির উপর একখানি পাথর বসানো। উল্কার পাথরের মতো উহা চক্‌চক্ করিতেছে। ব্রাহ্মণের অনুমতি-লইয়া আমি ঠাকুরের কাছে কোষাকুষি লইয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলাম এবং এই সুযোগে ঘরের সব জিনিস দেখিয়া লইলাম। ব্রাহ্মণ শিকা হইতে একটি বড়ো হাঁড়ি পাড়লেন, তাহা হইতে প্রায় সেরখানেক চাল বাহির করিলেন এবং ধুইয়া একখানা বড়ো থালে রাখিলেন। এটি তাঁর নৈবেদ্য। নৈবেদ্যের চারিদিকে কিছু কিছু উপকরণ রাখিলেন। পরে আঙুল দিয়া নৈবেদ্যটি দুই ভাগ করিয়া কাটিলেন ; এইরূপ কাটায় নৈবেদ্যের মাথাটিও দুই ভাগে কাটিয়া গেল—তখন তিনি সেই দুই মাথায় দুটি সন্দেশ বসাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, ও কী করিলেন? নৈবেদ্য দু-ভাগে কাটিলেন কেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "ইনি ধর্মঠাকুরও বটেন শিবও বটেন। তাই এক নৈবেদ্য দুই করা হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী মন্ত্রে নৈবেদ্য উৎসর্গ করেন?" তিনি বলিলেন, "শিবায় ধর্মরাজায় নমঃ।" আমি তাঁহাকে ধর্মঠাকুরের ধ্যান পড়িতে বলিলে তিনি বলিলেন, "আমি জানি না, যাঁর ঠাকুর তিনি জানেন, তিনি এখন এখানে নাই, আমার উপর ভার দিয়া গিয়াছেন, আমি যাহা জানি তাহাতেই পূজা করি।"

শুনিলাম ঠাকুর একজম গোয়ালার ছিলেন। সেই পূজা-আর্চা করিত, কিন্তু ঠাকুর যখন খুব জাগ্রত হইয়া উঠিলেন তখন ব্রাহ্মণেরাও মানত করিতে লাগিল। চারি দিকেই বড়ো বড়ো ব্রাহ্মণের গ্রাম ; ব্রাহ্মণেরা গোয়ালার হাতে ঠাকুরের পূজা দিতে ইতস্তত করে দেখিয়া, গোয়ালা একজন দুর্দশাপন্ন ব্রাহ্মণকে পূজারি নিযুক্ত করিল। সে প্রথম

প্রথম ব্রাহ্মণেরই পূজা দিত, পরে অন্য জাতেরও পূজা দিতে লাগিল। কিন্তু শুয়ার ও মুরগি বলির সময় সে আসিত না, মানতওয়ালারা ছোটো জাতের পণ্ডিত লইয়া আসিত। ক্রমে গোয়ালার বংশ লোপ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা প্রবল হইয়া উঠিলেন, এখন ঠাকুর তাঁদেরই—তাঁহারা সব হিন্দুর আচার-ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি উহা ইংরাজি [১৮] ৯৩ কি ৯৪ সালে। [১৮] ৯৮ কি ৯৯ সালে আমি আর-একবার যাই। সেবার দেখি ধর্মঠাকুর মাটির বেদিতে আর নাই। তাঁহার নিচে বেশ একটি পরিষ্কার বড়ো গৌরীপট্ট হইয়াছে।

ক্রমে অনুসন্ধান করিতে করিতে শুনিলাম কলিকাতা শহরের মধ্যেই অনেক স্থানে ধর্মঠাকুরের মন্দির আছে। তাহার মধ্যে ৪৫নং জানবাজার রোডের ধর্মঠাকুর খুব প্রবল। তাঁহার একটি একতলা মন্দির আছে, মন্দিরের সামনে বারান্দা আছে ; বারান্দার নিচে উঠান আছে ; উঠানের পর রেলিং আছে। সিংহাসনখানি অনেক থাকের উপর। ধর্মঠাকুরের আসন সকলের উপর। তাঁহার নিচের থাকে গণেশ ও পঞ্চানন্দ। গণেশ ও পঞ্চানন্দের নিচে তিনখানি পাথর, মাঝেরখানি একটু ছোটো, বোধ হয় ত্রিরত্নের মূর্তি। এই তিনখানির নিচের থাকে শীতলা ও ষষ্ঠী, আর ঘরের কোণে জরাসুর—প্রকাণ্ড মূর্তি, ত্রিপদ ও ত্রিশির। ধর্মঠাকুরের চোখ আছে, এবং সেই তিনখানি পাথরেরও চোখ আছে। ধর্মঠাকুরের মানত করিলে অনেকে পাঁঠাও দেয়, কিন্তু পাঁঠা বলির সময় ধর্মঠাকুরের সামনের কপাটখানি বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়, কারণ ধর্মঠাকুর পরম বৈষ্ণব, মাংস খানও না প্রাণী-হিংসাও চান না। কিন্তু পঞ্চানন্দ বড়ো মাংসাশী—তিনি যেমন মাংস খান তেমনি মদও খান। তালতলা লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন দে এই ধর্মঠাকুরের মানত করিয়া আপন সংসারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছিলেন। তিনিই ধর্মঠাকুরের মন্দিরের মেরামত করিয়া দিয়াছেন, সৌষ্ঠব করিয়া দিয়াছেন। পূজা আদির ব্যবস্থাও তিনিই করেন। ধর্মঠাকুরের পূজারি একজন বর্ণব্রাহ্মণ। বসন্তের চিকিৎসা ও শীতলার পূজা করিয়া তিনি বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন।

হরিমোহনবাবুই আমাকে তন্ন তন্ন করিয়া মন্দিরটি দেখাইয়াছিলেন। পঞ্চানন্দের মদ্যপান ও মাংস আহারের সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, ধর্মঠাকুর যে কেন এ মাতালটিকে সঙ্গে রাখেন জানি না। ওনার কিন্তু ক্ষমতা খুব—যে যা ধরে সে তাই পায়। কিন্তু উনি মাতালের একশেষ। একদিন একটু কম দেওয়া হইয়াছিল। সেইদিন হতে আর ওঁকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নিকটস্থ সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা গেল, কিছুতেই পাওয়া গেল না। অনেকে পঞ্চানন্দের পূজা না হওয়ায়, নিজেদের আহারাদি বন্ধ করিয়া দিল। শেষে একদিন একজনকে স্বপ্ন দিলেন, "আমি জানবাজারের চৌমাথায় শুঁড়ির দোকানের একটা মদের জালার ভিতরে পড়ে আছি।" তখন ঢাকঢোল বাজাইয়া জালার ভিতর হইতে তাঁহাকে বাহির করা হইল। মহাসমারোহে তাঁহাকে আবার ধর্ম মন্দিরে

স্থান দেওয়া হইল। হরিমোহনবাবু গদ্‌গদ ভাবে বলিলেন, "সেইদিন হইতে মহাশয়, আমি ওঁর জন্য রোজ এক বোতল মদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, যেন আর না পালান।" হরিমোহনবাবুর গদ্‌গদ ভাব দেখিয়া আমি বাস্তবিক বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম।

বলরাম দে-র স্ট্রিটেও একটি ধর্মঠাকুর আছেন। কিন্তু সেখানে শীতলাই প্রবল। একটু বিশেষ মন দিয়া না খুঁজিলে ধর্মঠাকুরকে দেখিতেই পাওয়া যায় না।

এইরূপ নানা জায়গায় ধর্মঠাকুরের নানা মন্দির দেখিয়া ধর্মঠাকুর যে বৌদ্ধধর্মেরই অবশেষ তাহা আমার বেশ বিশ্বাস হইল। কিন্তু আমার বিশ্বাস হইলে তো হয় না। অন্যকে তো বোঝানো চাই। সুতরাং আমি আমার সুযোগ্য ভ্রমণকারী পণ্ডিত রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ দুই জনকেই যে যে স্থানে ধর্মঠাকুরের বড়ো বড়ো মন্দির আছে, সেই সেই স্থানে পুথি খোঁজার জন্য পাঠাইয়া দিই। তাহাদিগকে বলিয়া দিই, "যদি 'হাকন্দ পুরাণ' পাও বা ময়ূরভট্টের 'ধর্মমঙ্গল' পাও, অতি অবশ্য করিয়া লইয়া আসিবে ; এবং কোনো প্রসিদ্ধ মন্দির দেখিলে মন্দিরের ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ লিখিয়া আনিবে।" রাখালচন্দ্র বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শলপ নামক স্থানে গিয়া দেখেন যে ধর্মের মন্দিরে রীতিমতো ধ্যানস্থ বুদ্ধের মূর্তি রহিয়াছে। বিনোদবিহারী ময়নায় যাইয়া খবর দেন যে ধর্মের মন্দিরে পূর্বে তিনটি জিনিস ছিল। একখানি পাথর, একটি শঙ্খ ও ধর্মঠাকুর। পাথরটি আর পাওয়া যায় না, শঙ্খটিও আর দেখা যায় না—কেবল ধর্মঠাকুরই আছেন ; ধর্মঠাকুর দেখিতে কচ্ছপের মতো। ইহার পর শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র একখানি পুথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন—উহার নাম 'ধর্ম্মপূজাবিধি'। আমার এখনকার সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুক্ত বাবু ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এ পুস্তকখানি ছাপাইতেছেন। পুস্তকখানি পড়িলেই বেশ বুঝা যাইবে ধর্মঠাকুর শিবও নন, বিষ্ণুও নন, ব্রহ্মাও নন, কারণ ইঁহারা সকলেই ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা। ইঁহাদের ধ্যান, পূজা ও নমস্কারাদির ব্যবস্থা স্বতন্ত্র আছে। ধর্মঠাকুর ইঁহাদের ছাড়া ; ইঁহাদের চেয়ে বড়ো। ধর্মঠাকুরের শক্তির নাম কামিন্যা। বল্লুকানদীর তীরে ইঁহার প্রথম আবির্ভাব হয়। আমি বল্লুকানদীর তীরে বড়ওয়ান গ্রামে এই ধর্মঠাকুরের মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। এককালে ধর্মঠাকুরের খুব বড়ো মন্দির ছিল। ভাঙা মন্দিরের চিহ্ন এখনো অনেক জায়গায় আছে। এখনকার মন্দিরটি একটি প্রকাণ্ড একতলা ঘর ; সামনে একটি বড়ো নাটমন্দির। মন্দিরের অধিকারী একজন স্ত্রীলোক, মুখী পণ্ডিত, সাধুভাষায় নাম মোক্ষদা। তিনি জাতিতে ডোম—নিজেই পূজা করেন ; তবে পালপার্বণে একজন ব্যাকরণ-জানা ডোমের পণ্ডিত লইয়া আসেন। তিনিও "যস্যান্তো নাদিমধ্যো" ইত্যাদি মন্ত্রে ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন।

ধর্মঠাকুরের মূর্তি কচ্ছপের ন্যায়। এইটি বুঝিতে হইলে বৌদ্ধধর্মের অনেক কথা বুঝিতে হয়। বৌদ্ধদের তিনটি রত্ন ছিল। তিনটিই উপাসনার বস্তু—বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ। বুদ্ধ বলিতে শাক্যসিংহ বুঝাইত, ধর্ম বলিতে গ্রন্থাবলী বুঝাইত এবং সংঘ বলিতে

ভিক্ষুমণ্ডলী বুঝাইত। কোনো কোনো সম্প্রদায় বুদ্ধকে প্রথম স্থান না দিয়া ধর্মকেই প্রথম স্থান দিতেন। তাঁহাদের মতে ত্রিরত্ন হইল "ধর্ম, বুদ্ধ ও সংঘ"। ক্রমে ধর্ম বলিতে স্তূপ বুঝাইত। পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে মহাযান মতে শাক্যসিংহ কেবলমাত্র লেখক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—ত্রিরত্নের মধ্যে তাঁহার স্থান নাই। সেখানে ধ্যানীবুদ্ধেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই-সকল ধ্যানীবুদ্ধ অনাদি ও অনন্ত। ধ্যানীবুদ্ধগণের মন্দির ক্রমে স্তূপের গায়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্থাৎ ধর্ম ও তথাগত এক হইয়া গেল। স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গি কাটা হইতে লাগিল। পূর্বের কুলুঙ্গিতে অক্ষোভ্য বসিলেন, পশ্চিমে অমিতাভ, দক্ষিণে রত্নসম্ভব এবং উত্তরে অমোঘসিদ্ধি। প্রথম ধ্যানীবুদ্ধ যে বৈরোচন তিনি স্তূপের ঠিক মধ্যস্থলে থাকিতেন। এইরূপ চারিটি কুলুঙ্গিওয়ালা স্তূপই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুকাল পরে প্রধান ধ্যানীবুদ্ধকে এরূপে লুকাইয়া রাখা লোকে পছন্দ করিল না। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আর-একটি কুলুঙ্গি করিয়া সেইখানে তাঁহার স্থান করিয়া দিল। পাঁচটি কুলুঙ্গিওয়ালা স্তূপ দেখিতে ঠিক কচ্ছপের মতো হইল। আমাদের ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি। সুতরাং তিনি এই শেষকালের স্তূপেরই অনুকরণ। স্তূপ আবার ধর্মের প্রতিমূর্তি। সুতরাং স্তূপ, ধর্ম এবং কচ্ছপাকৃতি তিনই এক হইয়া গেল। ইহাতেই মনে হয় কচ্ছপাকৃতি ধর্মঠাকুর পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তির সহিত ধর্মমূর্তির স্তূপ—আর-কেহ নহে।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—সংঘ কোথায় গেল। মহাযানে সংঘ বোধিসত্ত্ব রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অনেক বোধিসত্ত্বের স্বতন্ত্র পূজা হইত। এখন ভদ্রকল্প চলিতেছে। এ কল্পে অমিতাভের পালা। অমিতাভের বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, তিনিই কর্তা, তিনিই জগৎ উদ্ধার করিতেছেন, তাঁর সহস্র সহস্র নাম, তাঁর সহস্র স্বতন্ত্র মন্দির আছে। স্তূপ হইতে তাঁহাকে এখন পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে—ত্রিরত্ন এখন আর নাই। মাত্র ধর্মঠাকুর আছেন। ঐ যে বিনোদবিহারী বলিয়াছেন যে, ময়নায় পূর্বে একখানি পাথর, ধর্মঠাকুর ও শঙ্খ পাওয়া গিয়াছিল। পাথর লোপ পাইয়াছে অর্থাৎ ত্রিরত্নের বুদ্ধ লোপ পাইয়াছেন। শঙ্খও নাই অর্থাৎ সংঘও নাই। আছেন কেবল ধর্মঠাকুর—কচ্ছপাকৃতি।

নেপালে প্রত্যেক বিহারে ফটকের কাছে দেখিবে, এক-একটি হারীতির মন্দির। হারীতিই বসন্তের দেবতা, আমাদের দেশের শীতলা। বিহারবাসী বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা শীতলাকে বড়ো ভয় করিতেন, সেইজন্য তাঁহারা হারীতিকে পূজা না দিয়া, বিহারে প্রবেশ করিতেন না। আমাদের এখানেও ধর্মঠাকুরের সহিত শীতলার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে ধর্মঠাকুরের মন্দির সেইখানেই প্রায় শীতলা।

গণেশ ও মহাকাল নেপালে বুদ্ধমন্দিরের দ্বার-দেবতা। যেখানে বুদ্ধের মন্দির, মন্দিরের মধ্যে ছোটো চৈত্যই থাকুক বা শাক্যসিংহের মূর্তিই থাকুক—দ্বারের একদিকে গণেশ, একদিকে মহাকাল। নেপালে দু' জনেই মাংসাশী, দু' জনেই মাতাল। বাংলায়

মহাকালের জায়গায় পঞ্চানন্দ হইয়াছেন। বাংলায় গণেশ মাংস খান না, কিন্তু পঞ্চানন্দ বড়ো মাংসাশী। হরিমোহনবাবু পঞ্চানন্দের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

তারপর ধর্মঠাকুরের চোখ। এখন তো লোকে Paper-fastncr দিয়া ধর্মঠাকুর ও শীতলার চোখ তৈয়ার করিয়া থাকে। কিন্তু চোখ স্তূপের একটা অঙ্গ। স্তূপের গোল শেষ হইয়া গেলে তাহার উপর একটা চৌকা জিনিস থাকে। তাহার চারিদিকেই দুইটা করিয়া চোখ থাকে। তথাগত প্রাতঃকালে উঠিয়াই একবার চারিটি দিক অবলোকন করিতেন। তিনি চক্ষু হইতে শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের রশ্মি বাহির করিয়া ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতুর অন্ত পর্যন্ত অবলোকন করিতেন। সেইজন্য এই ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতুর নাম অবলোকিত। সুতরাং স্তূপের গোলার্ধের উপর চারিদিকে চার জোড়া চোখ থাকাই উচিত। এখনকার ধর্মঠাকুরেরও সেইজন্য অনেক চক্ষু। ইহাতেও ধর্মঠাকুরকে পুরানো বৌদ্ধধর্মের শেষ বলিয়া মনে হয়।

আমরা শাক্যসিংহের মতাবলম্বীদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া থাকি, কিন্তু তাহারা আপনাদিগকে কী বলিত? তাহারা আপনাদিগকে সদ্ধর্মী বলিত এবং আপনাদের ধর্মকে সদ্ধর্ম বলিত। অনেক জায়গায় দ ও ধ-য়ের যে সংযুক্ত বর্ণ তাহার পরিবর্তে শুধু ধ বলিত। অশোকের শিলালিপিতে বৌদ্ধধর্মের নাম সধর্ম। অনেক সংস্কৃত পুস্তকেও উহার নাম সধর্ম। রামাই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের পূজার পদ্ধতি লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি নিরঞ্জনের উষ্মা নামে যে ছড়া লিখিয়াছেন তাহাতেও ধর্মঠাকুরের পূজকদিগকে সধর্মী বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রামাই পণ্ডিতও মনে করিলেন যে, ধর্মঠাকুরের পূজা ও বৌদ্ধধর্ম এক। ছড়াটি পরে দেওয়া গেল। এ ছড়া পড়িলে আরো বোধ হইবে যে ধর্মঠাকুরের পূজা বৌদ্ধধর্মের ন্যায় ব্রাহ্মবিরোধী ধর্ম। কারণ ছড়ায় বলিতেছে, "ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত অত্যাচার করাতেই সধর্মীরা ধর্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে—আপনি আমাদের আপদ উদ্ধার করুন। ধর্মঠাকুর অমনি মুসলমান মূর্তি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জব্দ করিয়া দিলেন।"

শ্রীনিরঞ্জনের উষ্মা।

জাজপুর পুরবাদি সোলসয় ঘর বেদি
বেদি লয় কর লয় দুন।
দক্ষিণা মাগিতে যায় যার ঘরে নাহি পায়
শাঁপ দিয়া পোড়ায় ভুবন॥
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাইর দিশ পাস।
বোলিষ্ঠ হইল বড় দশবিশ হইয়া জোড়
সধর্ম্মীকে করএ বিনাশ॥

বেদে করে উচ্চারণ বের‍্যায় অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্ফমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম সবে বলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ॥
এইরূপে দ্বিজগণ করে ছিষ্টি সংহারণ
এ বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম্ম মনেতে পাইয়া মর্ম্ম
মায়াতে হইল অন্ধকার॥
ধর্ম্ম হইল যবনরূপী মাথায়েতে কাল টুপি
হাতে শোভে তীরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদার বলিয়া এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার হইল্য ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেন দম্মাদার॥
যতেক দেবতাগণ সবে হয়্যা একমন
আনন্দে পরিল ইজার॥
ব্রহ্ম হইলা মহাম্মদ বিষ্ণু হইলা পেগাম্বর
আদম্ফ হইল শূলপাণি।
গণেশ হইল গাজি কার্ত্তিক হইল কাজী
ফকির হইল যত মুনি॥
তেজিয়া আপন ভেক নারদা হইল্য সেক
পুরন্দর হইল্য মৌলানা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সবে
সবে মেলি বাজায় বাজনা॥
আপুনি চণ্ডিকাদেবী তিঁহ হইল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হইল বিবিনূর।
যতেক দেবতগণ হয়্যা সবে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কড়া কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাই পণ্ডিত গায়
ই বড় বিষম গণ্ডগোল॥

'নারায়ণ', মাঘ, ১৩২২

উড়িষ্যার জঙ্গলে

বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল খুঁজিতে খুঁজিতে বাংলায় ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্মের শেষ বলিয়া বোধ হইল, তখন উড়িষ্যার জঙ্গলে আবার খোঁজ আরম্ভ হইল; যদি সেখানে পাওয়া যায়। সেখানে যে বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু আছে এরূপ প্রত্যাশা করিবার একটা কারণ এই যে, উড়িষ্যার গড়জাত মহলের মধ্যে একটি মহলের নাম বোধ অর্থাৎ বৌদ্ধ। সেখানে এখনো বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। আর-একটা কারণ এই যে, গড়জাত ও কিল্লাজাত মহলের অনেক জায়গায়—এমন-কি মোগলবন্দিতেও পুরী ও কটক জেলার অনেক থানায় সরাকি নামে এক জাত তাঁতি বাস করে। তাহাদের বিবাহাদি শুভকার্যে এখনো বুদ্ধদেবের পূজা হইয়া থাকে। সরাকি তাঁতি বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলাতেও আছে, কিন্তু তাহারা একেবারে হিন্দু হইয়া গিয়াছে— তাহাদের ক্রিয়াকর্মে এখন বৌদ্ধধর্মের গন্ধও নাই। "সরাকি" শব্দের ব্যুৎপত্তি করিলে দেখা যায় যে উহা "শ্রাবক" শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং সরাকিরা সে এককালে বৌদ্ধ ছিল ইহাতে আর সন্দেহ নাই। উড়িষ্যায় উহারা এখনো অনেকটা বৌদ্ধ।

মুসলমানদের হাতে বাংলার বৌদ্ধধর্ম নষ্ট হয়। উড়িষ্যাতে তো সে সময় মুসলমানেরা যাইতে পারে নাই। উড়িয়ারা আর চারি শত বৎসর পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। সুতরাং বাংলায় যেভাবে বৌদ্ধধর্ম লোপ হইয়াছিল উড়িষ্যায় সেভাবে হয় নাই। বিশেষ উড়িষ্যার জগন্নাথদেব নিজেই বুদ্ধমূর্তি। এখন তিনি নারায়ণের অবতার হইলেও নবম অবতার অর্থাৎ বুদ্ধ অবতার। চূড়ামণি দাস চৈতন্যচরিত লিখিতে গিয়া জগন্নাথদেবকে বুদ্ধ অবতারই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উড়িষ্যার জঙ্গলে বৌদ্ধধর্ম বাহির করিয়াছেন শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু। তিনি দিনকতক বিনা বেতনে ময়ূরভঞ্জের আর্কিওলজিকেল সার্ভেয়র হইয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহাকে ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে অনেক ঘুরিতে হইয়াছিল, অনেক লোকের সহিত মিলিতে মিশিতে হইয়াছিল। তাহাতেই তিনি বুঝিতে পারেন যে সেখানে এখনো বৌদ্ধধর্ম অনেক স্থানে চলে। তিনি ধর্মের অনেক উড়িয়া পুস্তকও সংগ্রহ করিয়াছেন। এ প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

কিন্তু নগেনবাবুর সব কথা বুঝিতে হইলে, উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম কতদিন হইতে চলিতেছিল ও ঐ ধর্ম সেখানে কিরূপ গোড়া গাড়িয়া বসিয়াছিল, তাহার কতক কতক জানা আবশ্যক। তাই আরো একটু পুরানো কথা আলোচনা করিব, পরে নগেন্দ্রবাবুর কথা বলিব।

অশোকেরও পূর্বে উড়িষ্যা দেশে বিশেষ ভুবনেশ্বরের চারি পাশে বৌদ্ধধর্ম বেশ প্রবল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। স্পুনর [D. Brained Spooner] সাহেব একবার আমাকে কয়েকখানি উড়িয়া লেখা তালপাতা দেখিতে দিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া এবং উদয়গিরির দু-একখানি লেখ পড়িয়া মনে হয় ঐর নামে একজন রাজা অশোকের অনেক পূর্বে

মগধের হস্ত হইতে উড়িষ্যা উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন এবং অনেক মঠ ও গুহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। অশোকরাজা উড়িষ্যা জয় করেন এবং তথায় বৌদ্ধধর্মের খুব শ্রীবৃদ্ধি করেন। এখানে বলিয়া রাখি যে, উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ প্রায় একই দেশ। কটক ও পুরী জেলা কলিঙ্গও বটে উড়িষ্যাও বটে। কিন্তু বালেশ্বরকে কখনো কলিঙ্গ বলে কিনা জানি না। অশোকের সময় কলিঙ্গর রাজধানী ছিল তোষলি। তোষলি জায়গাটা অনেক দিন খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এখন পাওয়া গিয়াছে—উহার এখনকার নাম ধৌলি, তোষলি শব্দেরই অপভ্রংশ। অশোকের তোষলি হইতে এখনকার ধৌলি এক মাইলের মধ্যে, দেখা যায়। অশোকের তোষলিতে একটি পাহাড়ের মাথা ছাঁটিয়া তথায় একটি হাতির মূর্তি বাহির করা হইয়াছে। হাতির মাথা আছে, শুঁড় আছে, সামনের দুটি পা আছে এবং ধড়ের অর্ধেকটা আছে। বাকিটা খুদিয়া বাহির করা হয় নাই। হাতির সামনে অনেকটা জায়গায় বেশ খাঁজ কাটা আছে। বেশ করিয়া নিপুণ হইয়া সে খাঁজগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হয় পূর্বে সেখানে একটি কাঠের মন্দির ছিল। হাতিটি তাহার ভিতরে থাকিত। এই মন্দিরের নিচে পাহাড়ের গা বেশ পরিষ্কার করিয়া তাহাতে আশোকের একটি শিলালেখ আছে। অশোকের অন্যান্য শিলালেখেও যতগুলি আজ্ঞা (Edict) থাকে এখানেও সেইগুলি আছে। অধিকের মধ্যে একটি নূতন আজ্ঞা আছে— সেটি এই যে, শ্রাবণমাসের কোন্ কোন্ তিথিতে তোষলির লোকদিগকে এই আজ্ঞাগুলি শুনাইয়া দিতে হইবে। সুতরাং অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য যে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। অশোকের পরে উড়িষ্যায় বোধ হয় জৈনধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়। কারণ উদয়গিরির হাতিগুম্ফায় যে প্রকাণ্ড শিলালেখ পাওয়া যায় সেটি জৈনলেখ। খণ্ডগিরিতেও জৈনধর্মের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া বৌদ্ধধর্ম সেখানে লোপ হয় নাই। হিয়েন-সাং যখন নালন্দায় পড়িতেছিলেন তখন উড়িষ্যার হীনযানীরা মহাযানীদিগকে কাপালিক বলিয়া গালি দিয়াছিল। হর্ষবর্ধন ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হিয়েন-সাংকে বিচার করিবার জন্য উড়িষ্যায় পাঠাইয়াছিলেন।

মহাযান ধর্মে যখন নানা দেবদেবীর উপাসনা আরম্ভ হইল—অর্থাৎ বজ্রযান যখন প্রবল হইয়া উঠিল—তখন উড়িষ্যা বজ্রযানের একটি প্রধান কেল্লা হইয়া দাঁড়াইল। উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি বজ্রবারাহীর পূজা প্রকাশ করেন, তিনি বজ্রযানের অনেক পুস্তক লিখিয়া যান। উড়িষ্যা, বাংলা, মগধ, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশে তাঁহার মতের খুব আদর ছিল। তাঁহার এক মেয়ে ছিলেন, নাম লক্ষ্মীঙ্করা। তিনিও বজ্রযান মতের অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যায় তেলি, কায়স্থ প্রভৃতি জাতের লোকেও অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। এই-সকল পুস্তকেরই তিব্বতি ভাষায় তর্জমা আছে এবং তিব্বতি লোকে আদর করিয়া পড়ে।

ইন্দ্রভূতির পর সোমবংশ, কেশরীবংশ, গঙ্গবংশ, গজপতিবংশ ও সর্বশেষে

তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। ইঁহাদের সময়ে উড়িষ্যায় বৌদ্ধও ছিল, হিন্দুও ছিল। ব্রাহ্মণেরও প্রতিপত্তি ছিল, বিহারবাসী ভিক্ষুদেরও প্রতিপত্তি ছিল; কিন্তু রাজা হিন্দু হওয়ায় এবং রাজসভায় ব্রাহ্মণদিগের প্রতিপত্তি অধিক হওয়ায়, এবং মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা হিন্দু ও বৌদ্ধের ভেদ করিতে না পারায়, উড়িষ্যা হিন্দুর দেশ বলিয়াই পরিচিত হইত। মগধ ও বাংলার বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা লোপ হইয়া যাওয়ায় উড়িষ্যার বৌদ্ধেরা অতি হীন ভাবে বাস করিত। নগেন্দ্রবাবু যে-সকল পুস্তক আনিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায়, প্রতাপ রুদ্রের সময় ১৫০০ হইতে ১৫৩৩ পর্যন্ত বৌদ্ধদিগের উপর উড়িষ্যার অত্যন্ত উৎপাত হইয়াছিল। বড়ো বড়ো বৌদ্ধগণ বাহিরে বৈষ্ণব সাজিয়া থাকিতেন কিন্তু তাঁহাদের মত চলিত বৈষ্ণবধর্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা শূন্যপুরুষ মানিতেন। শূন্য পুরুষকেই বিষ্ণু মনে করিয়া পূজা করিতেন। তাঁহারা অলেখ শব্দ সর্বদাই ব্যবহার করিতেন। অলেখ অর্থাৎ অরেখ অর্থাৎ কোনো দাগ নাই। নিরঞ্জন শব্দও এই অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে—

"জয় ধর্ম্ম শ্রী পুরুষোত্তম। অনাদি স্তুতি পরমব্রহ্ম ॥১
অব্যক্ত পুরুষ নিরাকার হরি। সর্ব্ব ঘটে অচ্ছু ব্রহ্মরূপ ধরি ॥২
নাহি রেখ রূপ তোর শ্রীবিষ্ণুপুরুষ। বিষ্ণুর গোচর হইছু প্রকাশ ॥৩
মন-নয়ন-চিত-চেতন নাহি তোর। কর্ম্ম ধর্ম্ম সর্ব্ব ঠারে সিদ্ধ ন কর ॥৪
মহামূল্য তোর নাম। ওঁকার শব্দ এ যে বেদান্ত আগম ॥"

(Modern Buddhism–P. 41)
[বলরাম দাস, 'ব্রহ্মাণ্ড-ভূগোল-গীতা।']

আবার—

"তোহর রূপ রেখ নাহী। শূন্য পুরুষ শূন্যদেহী ॥
বোইলে শূন্য তোর দেহো। আবর নাম থিব কাহোঁ ॥
শূন্য রে ব্রহ্মাসিনা থাহি। সেঠারে নাম থিব রহি ॥"

(Modern Buddhism–P. 41)
[বলরাম দাস, 'বিরাট-গীতা']

শূন্যবাদ ও ব্রহ্মবাদের কেমন অদ্ভুত মিলন। যিনি শূন্য, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পুরুষোত্তম।

অচ্যুতানন্দ দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস ও চৈতন্য দাস—ইঁহারাই এই বৈষ্ণবধর্মের প্রধান কবি। অচ্যুতানন্দ দাস প্রতাপরুদ্রের সময় নীলাচলে বাস করিতেন। বলরাম দাস 'প্রণব গীতা' লেখেন এবং মুক্তিমণ্ডপে বসিয়া বেদান্তমতে 'প্রণব গীতা'র ব্যাখ্যা করেন—তাহাতে ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অনবরত গালি দিতে থাকেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রও রাগান্বিত হইয়া বলেন, "তুই শূদ্র, প্রণব উচ্চারণে ও বেদের ব্যাখ্যায় তোর কী অধিকার আছে?" তাহাতে বলরাম হাসিয়া বলেন, "শ্রীপতি কাহারো নিজস্ব

নন্। যে ভক্ত, যে ধার্মিক তাঁরই তিনি। জগন্নাথে কাহারো একচেটিয়া অধিকার নাই। ব্রাহ্মণেরা কেবল দাম্ভিকতা করিয়া বলিতেছেন জগন্নাথ তাঁহাদেরই। আমি বেদের বচন উদ্ধার করিয়া এ-সকল কথা প্রমাণ করিতে পারি।" ব্রাহ্মণেরা শুনিয়া আরো রাগিয়া উঠিলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "করুক্, করুক্, এখনই করুক্, এখনই করুক্।" রাজাও তাহাতে সায় দিলেন। স্থির হইল, সকলে পরদিন প্রভাতে বলরামের আখড়ায় যাইবে এবং তথায় বিচার হইবে। বলরাম সেদিন ভয়ে আর বাড়ি গেলেন না—বটমূলে আশ্রয় লইলেন। গভীর নিশায় নরহরি আসিয়া বলরামকে দেখা দিলেন এবং তাঁহাকে ভরসা দিয়া গেলেন। পরদিন রাজা আসিয়া উপস্থিত হইলে বলরাম বলিলেন, "আপনি নিজে শূদ্রের মুখে বেদের ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিয়াছেন, তাই আমি ব্যাখ্যা করিতেছি। আমি জড়, মূঢ়মতি, এখানে ভিক্ষা করিয়া খাই। আমি বেদ ব্যাখ্যা করিলে আপনি রাগত হইবেন না।" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "ও যদি বেদ ব্যাখ্যা করিতে পারে আমরা পরাজয় স্বীকার করিব।" বলরাম বলিলেন, "তবে শুনুন। নিত্য হইতে শূন্যের উৎপত্তি; শূন্য হইতে প্রণবের উৎপত্তি; প্রণব হইতে শব্দের উৎপত্তি; শব্দ হইতে বেদের উৎপত্তি; বেদ হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তি।" এই কথা শুনিয়া রাজা ব্রাহ্মণেরা সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেলেন এবং বলরামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একবার প্রতাপরুদ্র রাজার বাড়িতে চুরি হইয়া গিয়াছিল। রাজা ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ-পণ্ডিতদিগকে আনাইয়া চুরির ঠিকানা করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণেরা পারিল না, বৌদ্ধেরা পারিল। সুতরাং রাজা বৌদ্ধদিগকে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু রানী তাহাতে ভারি চটিয়া গেলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের মধ্যে কে বড়ো আবার পরীক্ষা হইল। একটা মুখঢাকা হাঁড়ি সভায় আনা হইল এবং জিজ্ঞাসা করা হইল এ হাঁড়িতে কী আছে? তাহার ভিতরে ছিল সাপ। ব্রাহ্মণেরা বলিল, "মাটি আছে।" ঢাকা খুলিলে মাটিই দেখা গেল। ব্রাহ্মণদের উপর রাজার ভক্তি বাড়িয়া গেল। তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়াইয়া দিলেন এবং তাহাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। এই সময় বোধ হয় বলরাম দাসকেও পলাইয়া যাইতে হয়। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর বাইশ বৎসর পরে তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব রাজা হইলে বলরাম আবার ফিরিয়া আসিলেন—কারণ মুকুন্দদেব বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধদিগকে যথেষ্ট আদর করিতেন। মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত উর্গা নগরের প্রধান লামা তারনাথ এই সময় ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা জানিবার জন্য যে লোক পাঠাইয়াছিলেন তিনি বলিয়া গিয়াছেন, উড়িষ্যার রাজা তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব বৌদ্ধ এবং তাঁহার রাজত্বে বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল গড়জাত মহলে মহিমাধর্ম নামে এক নূতন ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এ ধর্ম নীচ জাতির মধ্যেই চলে। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ইহার যথেষ্ট মিল আছে। এ ধর্মেও অলেখ পুরুষ, শূন্য পুরুষের পূজা আছে। ইহাতেও জাতিভেদ নাই।

ইহাও সন্ন্যাসীর ধর্ম। এ ধর্মেও ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়। এ ধর্মের প্রধান গুরু ভীমভোই— ইঁহার পুরা নাম ভীমসেন ভোই অরক্ষিতদাস। ধেকানল রাজ্যে জুরন্দাগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন এবং অতি নীচ কন্ধ জাতিতে ইঁহার জন্ম। ইনি ধান ভানিয়া খাইতেন। কিন্তু ভগবানের প্রতি ইঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল। একুশ বৎসর বয়সে ইনি মনের দুঃখে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যান, এবং আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগে থাকেন। একদিন যাইতে যাইতে তিনি এক কুয়ার মধ্যে পড়িয়া যান। কুয়ার মধ্যে তিন দিন তিন রাত্রি কাটিয়া গেল। নিকটের লোকে তাঁহাকে উঠাইবার অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু তিনি উঠিতে চাহিলেন না। তিন দিনের দিন রাত্রিশেষে ভগবান্ নিজ মূর্তি ধরিয়া কুয়ার উপর দাঁড়াইলেন এবং ভীমভোইকে ডাকিতেলাগিলেন, "ভীম, তুমি উপর দিকে চাহ— দেখ আমি আসিয়াছি।" ভীম অন্ধ ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি ভগবান্‌কে দেখিলেন। ভগবান্‌ও হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে কুয়া হইতে উঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, "যাও, অলেখ ধর্ম প্রচার করো।" ভগবান্ তাঁহাকে একখানি কৌপীন দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "রান্না ভাত ছাড়া তুমি আর-কোনো জিনিস ভিক্ষা করিও না, গ্রহণও করিও না।" কৌপীন পরিয়া ভীমভোই যখন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "একটা পেটের মতো চার্‌টিখানি ভাত দাও," তখন গাঁয়ের লোক সব হাসিয়া উঠিল। কিন্তু ভীম যখন ভাত ছাড়া আর-কিছু লইবেন না জানিল, তখন "এ লোকটা আমাদের জাত খাইতে আসিয়াছে" এই বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। তিনিও কৌপীন ফেলিয়া কপিলাশের দিকে যাইতে লাগিলেন। কিছুদূর গেলে শূন্য পুরুষ তাঁহাকে দেখা দিলেন এবং রাগত হইয়া বলিলেন. "তোমার এখনো সিদ্ধি হয় নাই। নহিলে তুমি মার খাইয়া পলাইয়া আসিবে কেন?" এই বলিয়া তিনি ভীমভোইর হাত পা বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে একটা মন্দিরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং সে মন্দিরের অন্ধি সন্ধি সব বুজাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আমি বাহিরে বসিয়া তিন বার হাততালি দিব, তোমার যদি সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, তো, তুমি বাহিরে আসিতে পারিবে।" তিন তালির পর ভীম যখন বাহিরে আসিলেন, তখন ভগবান্ বলিলেন, "ভীম, তোমার সিদ্ধি হইয়াছে। তুমি জুরান্দাতেই থাকো। তোমার আর কোথাও যাইতে হইবে না। তুমি এখানে বসিয়াই অলেখ ধর্মের কবিতা লেখো।" ইহার পর ভীমভোই ভগবানের আজ্ঞায় বিবাহ করিলেন। তাঁহার সন্তানাদিও হইল। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। তিনি অনেক কবিতা লিখিলেন। তাঁহার প্রধান পুস্তকের নাম 'কলি ভাগবত'। তাঁহার বহুতর ভজন ও পদাবলী আছে। দশ-বারো বৎসর হইল তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ভীমভোই একবার সদলবলে জগন্নাথের মন্দির দখল করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু সেখানে মার খাইয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন। 'বশোমতী মালিকা' নামক গ্রন্থে এই ধর্মের সমস্ত ইতিহাস পাওয়া যায়।

তাঁহার মতে যে গৃহত্যাগ করিবে সে—

সুজাতি যে কুলধর্ম্ম সমস্ত ছাড়িবে।
হোমকর্ম্ম যাগক্রিয়া সকল ত্যজিবে॥
দারাসুত বিত্তব্রত ক্রিয়া ত্যাজ্য করি।
কুণ্ডিপট পিন্ধি শিরে থিবে জটাধরি॥
জম্বুদ্বীপে মহিমাঙ্ক বীজ সে বুনিবে।
নিজ ব্রহ্ম গুরু পাই আনন্দ লভিবে॥
অনাকার মহিমা নামকু করি শিক্ষা।
নব শূদ্র ঘরে মাগি খেলুথিবে ভিক্ষা॥
তেলি তন্ত্রী ভাট কেরা রজক কুলারক।
ব্রহ্ম ক্ষেত্রী চণ্ডাল যে আবুরিলা পিক॥
এহি নব জাতি ঘরে ভিক্ষা না ঘেনিবে।
অশুদ্ধ এ মানে শাস্ত্রে লেখিয়াছি পূর্ব্বে॥
এ মানে অটন্তি অধা জন্মরু জাতকি।
তেনু করি নব শূদ্রে বাছি রখিছন্তি॥
নব শূদ্র অটন্তি প্রভুঙ্ক নিজ দাস।
তাঙ্ক ঘরে অন্নভিক্ষা ন লগাই দোষ॥
মহাব্রহ্মাতেজরে যে হই যাই ভস্ম।
শূদ্র ঘরে ভিক্ষা কলে নাহি তাঙ্কু দুষ্য॥
নব শূদ্র ঘরে অন্ন ভিক্ষাকু ভুজিবে।
নগর বাহারে কাল নিদ্রাকু কাটিবে॥
দিবসরে নিদ্রা কলে কাল করে বাস।
রাত্রে অন্নভোজন আহারে হয় দোষ॥
প্রভুঙ্কর ভক্ত যে দিবসে ভুঞ্জিবে।
রাত্রে উপবাস যমকালুকু জগিবে॥
নিশি উজাগরে রহি ধুনিকি জগিবু।
পঞ্চিশ প্রকৃতি তেবে পশি করিবু॥
জপ নাহি তপ নাহি উদাসী ভাবরে।
একা মহিমাকু নাম জপিবু হৃদরে॥

বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের 'বিনয়পিটকে'র নিয়মের সহিত এই-সকল নিয়মের অনেক মিল আছে। ভেকধারী বৈষ্ণবরা এ-সকল নিয়ম পালন করে না। বিশেষত বৈষ্ণবরা নীচ জাতির অন্ন গ্রহণ করে না। নীচ জাতির অন্ন মহিমা-ধর্মীর পক্ষে শুদ্ধ। ইহারা কুম্ভ নামক গাছের বাকল পরে, সেই জন্য ইহাদিগকে কুম্ভপটিয়া বলে।

ইহাদের মতে বুদ্ধদেব অলেখ ব্রহ্মের উপাসনা প্রচারের জন্য এবং জগৎ উদ্ধারের জন্য বোধ মহলের গোলাসিংহা নামক স্থানে বাস করেন। জগন্নাথদেব নীলাচল ছাড়িয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কাহার আজ্ঞায় এখানে আসিয়াছেন?" বুদ্ধদেব বলেন, "আমি অলেখের আজ্ঞায় আসিয়াছি। অলেখই পরাৎপর গুরু।" বুদ্ধদেব জগন্নাথকে সমাধিস্থ হইয়া কপিলাশে বলেন। তিনিও বারো বৎসর দুধ ও জল খাইয়া কপিলাশে থাকেন। সমাধির অন্তে জগন্নাথ ভীমভোইয়ের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিয়া অন্তর্ধান হন।

ভীমভোই বুদ্ধস্বামীর উদ্দেশে এই গানটি লিখিয়াছিলেন—

অনাকার অরূপ ব্রহ্ম-মূরতি হে।
এবে বিজে করিছন্তি ধরিতী হে॥ (পদ)
অরূপ পুরুষ রূপবন্ত হোইলে
ব্রহ্মাণ্ডকু আইলে,
ভকত হিতকারী করুণা কৃপাধারী,
মায়াসিন্ধুসাগরু এবে উধার করি,
পিণ্ডপ্রাণকু দেই কর ভকতি হে॥১
অগমিকা পুরুষ নামকু বহি,
রক্ষা নিমন্তে মহি
নির্ব্বেদরু প্রকাশ মহিমা দীক্ষা রস,
ভজি যেবে পারিব জীব পূর্ব্ব কল্মষ,
তেবে পাইব সদগতি মুকতি হে॥২
অচিহ্ন পুরুষ সে যে চিহ্নিবা দেলে,
আপে অতিথি হেলে,
অলেখ পদ যেহু লেখি ন হোই সেহু,
গুরু পণে শকতা অটন্তি মহাবাহু,
একুইশ ভুবনে সেহু নৃপতি হে॥৩
অকল্পন পুরুষ সে কল্পন কলে,
অঙ্গু সর্ব্বে জনমিলে,
আজ সে করতাঙ্ক নেত্র রে দেখু,
নিন্দিত করু অচ্ছ ভজুঅচ্ছ কাহাকু,
এবে মহিমা-ধর্ম্ম অচ্ছি পিরিথি হে।৪
অক্ষয় পুরুষ ক্ষয় হেবাকু নাহি,
একু নহি দুই ব্রহ্মাণ্ডে গুরুবীজে

শিষ্য নাহান্তি কেহি
বড়হি মা পণে সর্ব্বে দিন যাউছি হি,
গুরুদর্শনে খণ্ড কাল বিপতি হে ॥৫
দেহধারী হইছন্তি মহীমণ্ডলে,
এ ঘোর কলিকালে.
এবনা একাক্ষর বানাহি, বীরবর
বচন সুধাধার মুক্তিদানী পয়র
ভণে ভীম অরক্ষিত করি বিনতি হে ॥৬

'নারায়ণ', চৈত্র, ১৩২২

জাতক ও অবদান

মানুষ যখন বুদ্ধ হন, যখন তাঁহার দিব্যজ্ঞান হয়, তখন তাঁহার অনেকগুলি অলৌকিক শক্তির উদয় হয়। তাহার মধ্যে পূর্বনিবাসের অনুস্মৃতি একটি। তিনি তখন দিব্যচক্ষে দেখিতে পান যে, সৃষ্টির প্রথম হইতে তিনি কতবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কী কী কর্ম করিয়াছিলেন, এবং সেই-সকল কর্ম দ্বারা তিনি বুদ্ধ হইবার পথে কখন কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমাদের ভাষায় আমরা বলি তিনি জাতিস্মর হন। যাঁহারা পুনর্জন্ম মানেন না তাঁহাদের মতে জাতিস্মর হওয়ার কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা মানেন, তাঁহারা পূর্বজন্মে "কী ছিলাম, কী করিয়াছিলাম" জানিবার জন্য বড়োই ব্যগ্র হন। তাঁহারা মনে করেন, ধ্যান ধারণা যোগ প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাঁহারা পূর্বজন্মের কথা জানিতে পারেন। কেহ এক জন্ম, কেহ দুই জন্ম, কেহ বা দশ জন্ম বিশ জন্ম পর্যন্ত স্মরণ করিতে পারেন। পুণ্য কর্ম, তীর্থ পর্যটন, যোগযাগ সৎকর্ম করিলে হিন্দুরা মনে করেন দশ জন্মার্জিত পাপক্ষয় হয়, কোটি জন্মার্জিত পাপক্ষয় হয়। তাই যাঁহারা পুনর্জন্ম মানেন তাঁহারা এই-সকল সৎকর্ম করার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন।

বুদ্ধ ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিনই দেখিতে পাইতেন। সুতরাং তিনি আপনার পূর্ব পূর্ব জন্ম যে স্মরণ করিতে পারিতেন, তাহা আশ্চর্য নহে। শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়া অনেক উপদেশ দিয়াছেন; সেই-সকল উপদেশ লোকে যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, তাহার জন্য অনেক সময়ে তিনি আপনার পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা দিয়া সেগুলি ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। এই যে পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা, ইহার নাম জাতক।

জাতকের প্রাদুর্ভাব হীনযানে, পালি ভাষায়, অত্যন্ত অধিক। পালি ভাষার গ্রন্থে ৫৫৫টি জাতক আছে; অর্থাৎ বুদ্ধদেব আপনার ৫৫৫টি পূর্বজন্মের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই যে নম্বর ৫৫৫, ইহা কিন্তু সর্ববাদীসম্মত নহে; কেহ বলেন ৫৫০, কেহ বলেন ৫২৫, কেহ বলেন ৫৩৫, কেহ বলেন ৫১৫। ব্রহ্মদেশে ৫১৫ নম্বরই চলিত, তাহার মধ্যে ১০ খানি

বড়ো—আর ৫০৫ খানি ছোটো। সংস্কৃতে একখানি 'জাতকমালা' আছে। সেখানি আর্যশূরের প্রণীত ; ইহাতে ৩৪টি মাত্র 'জাতক' আছে। এই সংস্কৃত পুস্তক হীনযানের কি মহাযানের বলিতে পারা যায় না। কেন-না, হীনযানের লোকেও সংস্কৃতে লিখিত। বসুবন্ধু যখন হীনযান ছিলেন, তখন তিনি 'অভিধর্ম্ম কোষ' নামে একখানি পুস্তক লিখেন, সেখানি সংস্কৃতে। প্রোফেসর কর্ণ অথবা ভট্টকর্ণ সংস্কৃত 'জাতকমালা' ছাপাইয়াছেন। ওই-সকল জাতকের মধ্যে কোন্ নম্বরে পাওয়া যায়, তাহাও তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন। ডেনমার্কের প্রোফেসর ফোস্‌বোল পালি জাতকগুলি ছাপাইয়াছেন। রায় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ সাহেব এই পালি জাতকগুলি বাংলা করিতেছেন। বুদ্ধদেব কোন্ সময়ে, কোন্ শিষ্যের কথায়, কী উদ্দেশ্যে, এক-একটি জাতক বলিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তাহার পর তিনি সেই জাতকটির বাংলা তর্জমা করিতেছেন।

বুদ্ধদেব যখন নিজে এই গল্পগুলি বলিতেছেন, তখন মনে করিতে হইবে, এই গল্পগুলি তাঁহার পূর্বেও প্রচলিত ছিল। তিনি গল্পগুলি আপনার পূর্বজন্মের গল্প বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এগুলি ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন সম্পত্তি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইহা হইতে খৃ.পূ. ছয় শতকের পূর্বে ভারতবর্ষের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, মনের ভাব, ধর্মের ভাব জানিতে পারা যায়।

মহাযানের লোকের কিন্তু জাতকের উপর তত আস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এক 'জাতকমালা' ছাড়িয়া দিলে, উহাদের আর জাতকের বই নাই। এই 'জাতকমালা' আবার যখন মহাযানীরা পড়ে, তখন উহার নাম হয় 'বোধিসত্ত্বাবদানমালা'। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'জাতকমালা'র বা 'বোধিসত্ত্বাবদানমালা'র যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, আর্যশূরের লেখা এই পুথিখানি মহাযানীরা সংগীতির ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছেন এবং মঙ্গলাচরণের পর উহাতে "এবং ময়া শ্রুতমেকাস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাং বিজহার" বলিয়া মুখপাত করিয়াছেন ; অর্থাৎ আর্যশূরের বহিখানিকে তাঁহারা বুদ্ধের বচন করিয়া তুলিয়াছেন ; তাঁহারা প্রথমত একটি নূতন জাতক দিয়া আর্যশূরের ৩৪টি জাতকের স্থানে ৩৫টি করিয়া লইয়াছেন। আর্যশূরের বহির নাম 'জাতকমালা' ; মহাযানের বহির নাম 'বোধিসত্ত্বাবদান', বা 'বোধিসত্ত্বাবদানমালা'। ইহা দেখিলেই বোধ হইবে যে মহাযানীরা জাতক শব্দটা পছন্দ করিতেন না। উঁহারা জাতকের স্থানে অবদান শব্দ ব্যবহার করিতেন। উঁহাদের পূর্ববর্তী মহাসাংঘিকের দল, তাঁহারাও জাতকের পরিবর্তে অবদান বলিতেন। মহাসাংঘিক হইতেই যে মহাযানের উৎপত্তি হইয়াছে, একথা পূর্বেই বলিয়াছি, আরো অনেকেরই এই বিশ্বাস। মহাসাংঘিকের যে একখানিমাত্র পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি জাতকের গল্প আছে, কিন্তু সেগুলির নামও অবদান। অবদান শব্দে সংস্কৃত ভাষায় মহৎকার্য বুঝায়। মহাযানের অবদানে শুধু বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের কথা নয়, আরো অনেক মহাপুরুষেরই পূর্বজন্মের কথা আছে। যেমন, অশোকরাজা

পূর্বজন্মে কোনো বুদ্ধকে একমুষ্টি ধূলা দিয়া তৃপ্তি করিয়াছেন, তাই আর-একজন্মে তিনি চক্রবর্তী রাজা হইয়া ছিলেন। সুতরাং অবদান শব্দ যতটা ব্যাপক, জাতক শব্দ ততটা নয়। মহাযানে অবদানের অনেক পুস্তক আছে। আর্যশূরের 'অবদানশতকে' এইরূপ ১০০টি অবদান আছে। 'দিব্যাবদানমালায়' ৩৭টি অবদান আছে। 'ভদ্রকল্পাবদানে' ৩৫টি জাতক আছে। 'অশোকাবদান' 'দিব্যাবদানমালা'র একটি অবদান, গদ্যে লেখা ; কিন্তু 'অশোকাবদান' নামে পদ্যে লেখা আরো একটি বৃহৎ অবদান আছে। 'সুগতজন্মাবদান' নামে আমরা আরো একখানি অবদান পাইয়াছি। অবদানের শেষ এবং উৎকৃষ্ট পুস্তক 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'—এখানি খৃ. ১১ শতকে কাশ্মীরে ক্ষেমেন্দ্রব্যাসদাস নামে একজন কবির লেখা। তিনি হিন্দু, ব্রাহ্মণ ও একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। তাঁহার একজন ন্যক্ক নামে বৌদ্ধ বন্ধু ছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র যখন 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'বৃহৎকথা' প্রভৃতি বড়ো বড়ো পুস্তকের বিষয় লইয়া 'রামায়ণমঞ্জরী', 'ভারতমঞ্জরী', 'বৃহৎকথামঞ্জরী' প্রভৃতি কাব্য লিখিয়া খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তখন ন্যক্ক একদিন আসিয়া বলিলেন, আমাদের অবদানগুলি বড়ো কট্‌মট ভাষায় লেখা, কতক গদ্য, কতক পদ্য, কোনোটাই সুবোধ নয়। তুমি যদি তোমার ভাষায় এইগুলি কাব্যাকারে লিখিয়া দাও, তবে আমাদের ধর্মের বড়ো উপকার হয়। তাই ক্ষেমেন্দ্র 'বোধিসত্ত্বাবদান' রচনা করেন। ইহাতে ১০৮টি অবদান আছে। ইহার পুরা পুথি বড়োই দুষ্প্রাপ্য। এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিতে ৫১-১০৮ পর্যন্ত অবদান আছে ; কেম্ব্রিজের পুথিতে ৪১-১০৮ অবদান আছে, শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তিব্বত হইতে একখানি পুথি আনাইয়াছেন, তাহাতে ১-৪৯টি অবদান আছে। তিনি পুথিখানি ছাপাইতেছেন, ডানপাতে সংস্কৃত বামপাতে ভুটিয়া ভাষায় তাহার তর্জমা। তিনি ইহার বাংলাও করিতেছেন।

আমরা একটি জাতক ও একটি অবদান পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। ১. আর্যশূরের 'জাতকমালা'র প্রথম ব্যাঘ্রী জাতক। ২. 'মহাবস্তু অবদানে'র পুণ্যবন্ত ও তাঁহার বন্ধুদিগের অবদান।

১.

এক সময়ে বুদ্ধদেব কোনো ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'কল্পসূত্র' অনুসারে তাঁহার জাতকর্মাদি সংস্কার হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত মেধাবী, কৌতূহলী ও অনলস ছিলেন। সেইজন্য তিনি অল্পদিনের মধ্যেই অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা যে-সব কলা শিক্ষা করিতে পারেন, সে-সকল কলাতেও তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পসার প্রতিপত্তিও খুব ছিল। কিন্তু গার্হস্থ্যে তাঁহার মন উঠিল না। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন শুনিয়া, যাঁহারা তাঁহাকে ভালোবাসিতেন, তাঁহারাও সন্ন্যাসী হইলেন। অজিত তাঁহার প্রধান শিষ্য হইল। তিনি পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে বড়োই ভালোবাসিতেন; অজিত সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। একদিন

তিনি পর্বত গুহায় এক বাঘিনি দেখিলেন। সে এইমাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে, অত্যন্ত দুর্বল, ক্ষুধায় কাতব, সতৃষ্ণ নয়নে বাচ্চার দিকে চাহিতেছে। ব্রাহ্মণপুত্র দেখিলেন বাঘিনি ক্ষুধায় এত কাতর যে, সে বাচ্চাটিও খাইতে চায়। করুণার সাগর সন্ন্যাসী শিষ্যকে বলিলেন, বাঘিনি দেখিতেছি ক্ষুধায় বাচ্চাটি খাইয়া ফেলিবে, তুমি অনুসন্ধান করিয়া যদি উহাকে কোনো খাবার আনিযা দাও, তবে বড়োই ভালো হয়। শিষ্য চলিয়া গেলে, সন্ন্যাসী ভাবিলেন—আমাব এ ছার দেহে কী কাজ? আমি ইহার আহার হই না কেন? এই ভাবিয়া তিনি এক উঁচু জায়গা হইতে বাঘিনির সম্মুখে পড়িয়া দেহত্যাগ করিলেন। বাঘিনিও আনন্দের সহিত তাঁহার দেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল। শিষ্য আসিয়া দেখিল, তাঁহার গুরু বাঘিনির জন্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। সে আর আর শিষ্যদের এই কথা বলিল। সকলেই মনে করিল, ইনি কোনো না-কোনো জন্মে বুদ্ধ হইবেন।

২.

কোনো জন্মে ভগবান্ বারাণসীর রাজা অঞ্জনের পুত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল পুণ্যবন্ত। তাঁহার চারি জন বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের নাম বীর্যবন্ত, শিল্পবন্ত, রূপবন্ত ও প্রজ্ঞাবন্ত। তাঁহাদের কাহার কী গুণ ছিল, তাহা নামেই প্রকাশ। একবার পাঁচ বন্ধুতে মিলিয়া আপনাদেরই গুণ পরীক্ষার জন্য কাম্পিল্ল যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহারা দেখিলেন. গঙ্গায় প্রকাণ্ড এক বাহাদুরি কাঠ ভাসিয়া যাইতেছে, দেখিয়াই বীর্যবন্ত জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন ও কাঠ ডাঙায় তুলিলেন। পরীক্ষায় জানিলেন এটা চন্দনের কাঠ—বিক্রয় করিয়া অনেক টাকাকড়ি পাইলেন ও পাঁচ জনে টাকা ভাগ করিয়া লইয়া অনেক আমোদ আহ্লাদ করিলেন।

শিল্পবন্ত একদিন এক নগরের প্রান্তে বসিয়া বীণা বাজাইতেছিলেন। বীণায় সাতটি তন্ত্রী ছিল। বীণার ঝংকারে সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া ঝাঁকিয়া পড়িল। এরূপ বীণা তাহারা আর-কখনো শুনে নাই। বাজাইতে বাজাইতে বীণার একটা তার ছিঁড়িয়া গেল। কিন্তু সে এমনি কলাবৎ, ছয় তারেই সাত তারের মতো বাজাইতে লাগিলেন। ক্রমে আরো একতার ছিঁড়িল। তাহাতে বাজনার কোনো ব্যতিক্রম হইল না। ক্রমে চার তার, তিন তার, দুই তার, শেষে এক তারে দাঁড়াইল। তখনো সপ্ততন্ত্রী বীণার ঝংকার হইতেছে। নগরের লোক তাঁহাকে অনেক টাকা পুরস্কার দিল।

রূপবন্তের রূপ দেখিয়া নগরের এক বেশ্যা মুগ্ধ হইয়া গেল এবং তাঁহার কথায় তাঁহার বন্ধুগণকে অনেক টাকাকড়ি দিল।

এইবার প্রজ্ঞাবন্তের পালা। তিনি একদিন বাজারে গিয়া দেখিলেন, এক শেঠের ছেলে এক বেশ্যার সহিত ঝগড়া করিতেছে। ঝগড়ার বিষয় একলক্ষ টাকা। শেঠের ছেলে বেশ্যাটিকে আগের রাত্রিতে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিল ও একলক্ষ টাকা দিতে স্বীকার হইয়াছিল। বেশ্যার অন্য লোকের বাড়ি যাইবার কড়ার ছিল, সে সে-রাত্রিতে যাইতে পারিল না। সে

পরদিন সকালে আসিয়া উপস্থিত হইল। শেঠ বলিল, তোমায় আমার আর কাজ নাই। রাত্রে স্বপ্নে আমি তোমায় পাইয়াছিলাম, তবে আমার কাজ হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, যদি স্বপ্নে আমায় পাইয়াছিলে, তবে আমার টাকাটি দাও। এ ঝগড়ার আর মীমাংসা হয় না। দুই দলেই লোক জুটিয়া গেল। শেষে প্রজ্ঞাবন্ত আসিয়া মধ্যস্থ হইলেন। শেঠকে বলিলেন, তুমি এখনই টাকা লইয়া আইস। সে টাকা আনিয়া সম্মুখে রাখিল। প্রজ্ঞাবন্ত বলিলেন, একখানি বড়ো আরশি লইয়া আইস। আরশি আনিলে, তিনি বেশ্যাকে বলিলেন, "তুমি ঐ আরশির ভিতর হইতে টাকা লও। শেঠজী স্বপ্নে তোমার ছায়ামাত্র পাইয়াছিলেন, তুমিও টাকার ছায়া লও, আসল টাকায় তুমি কী করিয়া হাত দিবে?" বেশ্যার মুখ চুন। মহানন্দে শেঠ সমস্ত টাকা প্রজ্ঞাবন্তকে পুরস্কার দিল। পাঁচ বন্ধুতে টাকা ভাগ করিয়া লইয়া খুব আমোদ-প্রমোদ করিলেন।

পুণ্যবন্ত এক রাজবাড়ির সম্মুখে একদিন বসিয়া আছেন। এমন সময় মন্ত্রীপুত্র সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পুণ্যবন্তের পুণ্যজ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে রাজবাড়ির ভিতর লইয়া গেলেন এবং উহারই এক অংশে তাঁহাকে থাকিতে দিলেন। রাত্রিতে পুণ্যবন্ত ঘুমাইয়া আছেন, রাজকন্যা আসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া রক্ষকগণ পুণ্যবন্তকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিল। রাজা অনুসন্ধানে জানিলেন পুণ্যবন্তের কোনো দোষই নাই। তিনি কাশীরাজের পুত্র জানিয়া, রাজা মহাশয় তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিলেন।

এই পুণ্যবন্তই বুদ্ধদেব, বীর্যবন্ত তাঁহার শিষ্য শোনক, শিল্পবন্ত রাষ্ট্রপাল, রূপবন্ত সুরেন্দ্র ও প্রজ্ঞাবন্ত শারিপুত্র।

'নারায়ণ', শ্রাবণ, ১৩২২

দলাদলি

ধর্ম হইলেই দলাদলি হয়। সভা হইলেই দলাদলি হয়। পাঁচজনে মিলিয়া কাজ করিতে গেলে মতান্তর হয়ই হয়, আর মতান্তর হইলেই দলাদলি হয়। দলাদলিটা দোষের কথাও বটে, দোষের কথা নয়ও বটে। দলাদলিতে যখন মূল কাজ পণ্ড হয়, তখন দোষের। যখন মূল কাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তখন গুণের। যখন দলাদলির মীমাংসা করিয়া দিবার লোক থাকে, তখন দলাদলিতে উপকার হয়। যখন মিটাইয়া দিবার লোক থাকে না, তখন উহাতে অপকার হয়। বৌদ্ধধর্মে যে দলাদলি হইয়াছিল তাহাতে ধর্মের উন্নতিই হইয়াছিল; দুই দলই ধর্মপ্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া পৃথিবীর চারিদিকেই ঘুরিয়াছিলেন। একদল উত্তরে, একদল দক্ষিণে। তাঁহারা যে-সব দেশে গিয়াছিলেন, তাহার অনেক দেশে এখনো বৌদ্ধ আছে। সুতরাং এত বড়ো একটা বড়ো দলাদলির ইতিহাসটা কিছু জানা চাই।

প্রথম কথা কী লইয়া দলাদলি হয়? অতি তুচ্ছ কথা। যাহা লইয়া দলাদলি হয়,

পালিতে তাহাকে দশবত্থু বলে, সংস্কৃতে দশবস্তু। অর্থাৎ দশটি জিনিস লইয়া দলাদলির সূত্রপাত। যথা—

১. কপ্পতি, সিঙ্গিলোণ কপ্পো—অনেক ভিক্ষু শিংয়ের পাত্রে একটু লুন সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। তাঁহারা তো ভিক্ষা করিয়া খাইতেন। সব সময়ে তো লুন দেওয়া ব্যঞ্জন পাইতেন না। আবার সেকালে সকলে সকলের লুন খাইতেন না। লুন না দিয়া ব্যঞ্জন রান্না হইত। তাই পরিবেশনও হইত। লোকে লুন মিশাইয়া খাইত। এখনো অনেক খাঁটি হিন্দুর বাড়িতে আলুনি ছক্কার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন লুন দিলেই "এঁটো" হয়। তাই পরিবেশনের সময় আলুনিই পরিবেশন করেন। পাতে লুন থাকে, সেই লুন মিশাইয়া লোকে "এঁটো" করিয়া খায়। এইরূপ ব্যবহার বোধ হয় সেকালেও ছিল। লোকে ভিক্ষুদের রান্না জিনিস দিত, আলুনিই দিত। ভিক্ষুরা একটু লুন সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন—তাও রাখিতেন শিংয়ে অর্থাৎ যাহার দাম নাই, কুড়াইয়া যথেষ্ট পাওয়া যায়। তখন তো আর bone-mill-এর দরকার হয় নাই! এই সামান্য কথা, ইহা লইয়াই ঘোর দলাদলি উপস্থিত হইল। যাঁহারা কড়া ভিক্ষু, তাঁহারা বলিলেন, ভিক্ষুর আবাব সঞ্চয়? তাহা হইলে আর ভিক্ষু রহিল না, গৃহস্থ হইয়া গেল। যাঁহারা তত কড়া ভিক্ষু নন, তাঁহারা বলিলেন, একটু লুন সঞ্চয় করিলাম তাতে বহিয়া গেল কী? আমরা কি কিছুই সঞ্চয় করি না! আমাদের পাত্র আছে, চীবর আছে, শয়ন আসন এসব তো আমাদের থাকে, একটু লুন থাকিলেই সর্বনাশ হইয়া গেল? এই আপত্তির নাম সিঙ্গিলোণ কপ্পো।

২. কপ্পতি দ্বঙ্গুল কপ্পো—বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, বেলা ঠিক দুই প্রহরের পর কোনো ভিক্ষু আহার করিতে পারিবে না। ১২টা বাজিবার পূর্বে সকলকেই আহার সারিয়া লইতে হইবে, ১২টা বাজিলে পর আর-কেহই আহার করিতে পারিবে না। তাহার পর আহার যদি খাইতে হয় তো জল ও ফলের রস খাইতে হইবে। কিন্তু ইহারা তো ভিক্ষু, ভিক্ষা করিয়া রান্না ভাত আনিয়া তো খাইতে হইবে? একালের মতো তো আর স্কুল, কালেজ, অফিস ছিল না, যে ৯টার মধ্যে ভাত চাই! সেকালের লোকে খাইত বেলায়, রাঁধিতও বেলায়। ভিক্ষুরা সেই বেলার রান্না ভিক্ষা করিয়া আনিয়া খাইত। দুপুরের আগে খাইতে হইবে। দুপুরের পর এক গ্রাসও খাইবার হুকুম নাই। সুতরাং অনেকের খাওয়া হইত না, অনেকের আধ-পেটা হইত। তাই তারা মনে করিত, দুই প্রহরের সময় ছায়া যেরূপ থাকে, তাহা হইতে দুই আঙুল ছায়া সরিয়া গেলেও খাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, সে কখনো হতে পারে না। মহাপ্রভুর আজ্ঞা দু-প্রহরের পূর্বে খাইতে হইবে, সে আজ্ঞা কি আমরা লঙ্ঘন করিতে পারি! সুতরাং মতান্তর হইল, দলাদলির একটা কারণ হইল।

৩. কপ্পতি গামান্তর কপ্পো—ভিক্ষুরা একই গ্রামে ভিক্ষা করিবে, একদিনে দুই গ্রামে যাইতে পারিবে না, নিয়ম ছিল। কোনো কোনো ভিক্ষু মনে করিতেন, যদি গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ হয়,

আগে স্বগ্রামে ভিক্ষা কিছু খাইয়া গেলে দোষ কী? প্রথমত দুবার খাওয়া দোষ, দ্বিতীয় দোষ আগে স্বগ্রামে খাইয়া, গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণে গেলে, যে বেচারা নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তাহার রান্না অন্নব্যঞ্জন সব ফেলা যায়। কারণ ভিক্ষুরা তো একবার খাইয়া গিয়া আবার সব জিনিস খাইয়া উঠিতে পারেন না; সুতরাং বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণে যাইলে ঘরে খাইয়া যাইতে পারিবে না। কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, এ নিয়ম ঠিক। অন্যে বলিলেন, গ্রামান্তরে যাইতে হইলে যদি পেটে কিছু না থাকে তাহা হইলে যাইতে বড়ো কষ্ট হয়। সুতরাং কিছু খাইয়া গেলে দোষ কী? এও একটা বিবাদের কারণ।

৪. কপ্পতি আবাসকপ্পো —এখানে আবাস শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোলযোগ আছে। এক-এক মঠে অনেক ভিক্ষু বাস করিতেন। যাঁহারা এক ঘরে বাস করেন তাঁহাদের এক আবাস। আবাস শব্দের অর্থ ঘর। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে আবাস শব্দের অর্থ পরগণা বা ডিহি। বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়াছিলেন যে, এক জায়গার যত ভিক্ষু থাকিবে, সব এক জায়গায় আসিয়া উপোষ করিবে। উপোষ শব্দের অর্থ উপবাস, বাংলায় যাহাকে উপোস বলে। সংস্কৃতে দুই-এক জায়গায় উপবসথ শব্দ পাওয়া যায়, তাহা হইতে উপোষ হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে ক্রমে উ লোপ হইয়া পোষথ বা পোষধ হইয়াছে। জৈন ভাষায় আবার ষ, ধ, লোপ হইয়া শুধু পো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের ধর্মে একটা পো-শালা আছে, সেখানে সকলে আসিয়া পোষধ ব্রত ধারণ করেন অর্থাৎ উপোস করিয়া ধর্মকথা শ্রবণ করেন। অষ্টমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এ কয়দিন পোষধের দিন। বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়াছিলেন এক আবাসের লোক এক জায়গায় পোষধ করিবে। কিন্তু কেহ কেহ বলিলেন, এ নিয়ম বড়ো কড়া, যাহার যেখানে ইচ্ছা, সে সেখানে পোষধ করিবে। বৃদ্ধেরা বলিলেন, তাহা হইতে পারে না, তথাগতের আজ্ঞা মানিয়া চলিতেই হইবে। আর-সকলে বলিলেন, পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পোষধ করিলে, উপাসকদিগের সুবিধা হয়, তাহাদের ধর্মকথা শুনাইবার সুবিধা হয় এবং তাহাতে ধর্মবৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধেরা বলিলেন, সকলে একত্র বসিয়া উপবাস করিলে, লুকাইয়া খাইবার সুবিধা হয় না, পৃথক্ পৃথক্ উপবাস করিলে সেটা হওয়ার সুবিধা হয়। সেজন্য আবার ভিক্ষুদের দেখিবার দরকার হয়। সুতরাং ইহা একটা বিবাদের কারণ হইল।

৫. কপ্পতি অনুমতি কপ্পো— বৌদ্ধদের সকল কর্মই সংঘে নির্বাহিত হইত, অর্থাৎ এক বিহারের যত ভিক্ষু সকলে একত্র বসিয়া (ভোট লইয়া) বিহারের কার্য নির্বাহ করিতেন। সকল ভিক্ষু উপস্থিত না থাকিলে, কোনো কোনো বিহারের ভিক্ষুরা অনুপস্থিত ভিক্ষুদের অনুমতি পাওয়া যাইবে, এইরূপ মনে করিয়া কার্য নির্বাহ করিয়া লইতেন। এ বিষয়ে যে মতামতি হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একদল বলিবেন, "অনুপস্থিতেরা যে তোমাদের হইয়া মত দিবেন একথা তোমরা কি করিয়া ভাব।" আর-একদল বলিবেন,

"তাহারা তো উপস্থিত ছিলেন না, আমরা কী করি, কাজ তো ফেলিয়া রাখা যায় না।"
৬. কপ্পতি আচিন্ন কপ্পো—গুরু করিয়া গিয়াছেন আমিও করিব। পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে ইহাতে দোষ কী? বৃদ্ধেরা বলিবেন, তথাগতের যাহা উপদেশ তাহার তো ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। তোমার গুরু কোথায় কী করিয়া গিয়াছেন, সেটা তো আর তথাগতের উপদেশের বিরুদ্ধে প্রমাণ হইবে না। অতএব তোমাকে সে কার্যটি ছাড়িতে হইবে। সে বলিল, বাঃ, বরাবর চলিয়া আসিতেছে, আমার গুরুও করিয়া গিয়াছেন, আমি করিলেই দোষ হইবে? সুতরাং ইহা লইয়া বিবাদের একটা কারণ হইল।
৭. কপ্পতি অমথিত কপ্পো—পূর্বেই বলা হইয়াছে দু-প্রহরের পর ভিক্ষুরা জল ও ফলরস খাইতে পারিবে। ঘোলটাকে ভিক্ষুরা রস বলিয়াই মনে করিতেন। ঘোল খাওয়ায় তাঁহাদের দোষ ছিল না। দই মওয়া হইলে তবে তো ঘোল হয়! অনেক ভিক্ষু দইয়ে জল দিয়া পাতলা করিয়া তাহাকে ঘোল বলিয়া খাইতেন। এই যে "আমওয়া" দই এটা ভিক্ষুদের পক্ষে নিষিদ্ধ। অনেক ভিক্ষু বলিলেন, এ নিষেধের কোনো মানে নাই। এ জিনিসটা তো দইয়ে জল দিয়া তৈয়ারি হইয়াছে. ঘোলও জল দিয়া তৈয়ারি হয়। একটা "মওয়া", একটা "আমওয়া"। এতে আর এতই তফাত কী? বৃদ্ধেরা বলিলেন, বেশ তফাত আছে। একটাতে মাখনটা থাকিয়া যায়, আর-একটাতে থাকে না। মাখন তো ফলের রস নয়, জলও নয়, সুতরাং সেটা তো খাওয়া উচিত নয়। সুতরাং মাখন খাওয়াও যা, "আমওয়া" দই খাওয়াও তা। এ কার্যটি একেবারেই করা উচিত নয়। সুতরাং এটা একটা বিবাদের কারণ।
৮. কপ্পতি জলোগি কপ্পো—মদ গাঁজিয়া উঠিবার পূর্বে জল বলিয়া সেইটাকে খাওয়া। অর্থাৎ তাড়ি হইবার পূর্বে ঝাঁঝওয়ালা রস খাওয়া। ইহা লইয়াও দলাদলি হইল। বৃদ্ধেরা বলিলেন, "ও তো মদ। মদ খাওয়া ভিক্ষুদের নিষেধ। সুতরাং মদ হওয়ার পূর্বে উহাকে খাইলে পেটে যাইয়া মদ হইবে।" অপরে বলিলেন, "আমরা তো মদ খাইলাম না, তথাগতের আদেশ তো পালন করিলাম, পেটে যাইয়া মদ হইলে আমরা কী করিব।"
৯. কপ্পতি অদসকং নিসীদনং—নিসীদন শব্দের অর্থ আসন। আর দশা শব্দের অর্থ কাপড়ের ছিলে। যে আসনের ছিলে না থাকে, বৌদ্ধদের তাহাতে বসিতে নাই। ছিলেগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া দেখিতে যে সুন্দর আসন হয়, তাহাতে বসা ভিক্ষুদের নিষেধ। ভিক্ষুরা অনেকে চান এইরূপ সুন্দর আসনে বসিতে। বৃদ্ধেরা বলেন, তাহাতে ভগবানের যে আজ্ঞা আছে "উচ্চাসনে বা মহাসনে বসিবে না", সে আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়। অতএব ছিলাকাটা আসনে বসিতে নাই। বিরুদ্ধবাদীরা বলিলেন, ছিলা কাটিলাম আর না কাটিলাম তাহাতে কী আসিয়া গেল? আমরা উচ্চাসনেও বসিতেছি না, মহাসনেও বসিতেছি না। তবে আমরা ভগবানের আজ্ঞা কী করিয়া লঙ্ঘন করিলাম।
১০. কপ্পতি জাতরূপ রজতন্তি—সোনারূপা গ্রহণ করা বুদ্ধদেবের আদেশে ভিক্ষুদের

নিষেধ। কিন্তু বৈশালীর ভিক্ষুরা ছলে ও কৌশলে সোনারূপা লইতেন। কিরূপে লইতেন তাহার উদাহরণ দেখুন। তাঁহারা উপোষথ-শালায় একটি জলপূর্ণ পাত্র রাখিতেন এবং উপাসকদের বলিতেন, তোমরা এই জলে কার্যাপণ কাহাপন বা কাহন ফেলিয়া দাও। তাহারা ফেলিয়া দিত, ভিক্ষুরা সোনারূপা ছুঁইতেন না, কিন্তু আপনাদের লোক দিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া খরচ করিতেন। কার্যাপণ বলিতে সেকালে চৌকা চৌকা তামার পয়সা বুঝাইত। বৃদ্ধেরা বলিলেন, ইহার দ্বারা বুদ্ধের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইল। অন্য ভিক্ষুরা বলিলেন, আমরা তো ছুঁইলাম না, কী করিয়া বুদ্ধদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইল। সুতরাং এটিও বিবাদের কারণ হইল।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর ঠিক একশো বৎসর অতীত হইয়া গেলে, বৈশালীর ভিক্ষুরা বিশেষত যাহারা বজ্জিবংশে জন্মিয়াছিল, তাহারা এই দশবস্তু চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় যশ নামে একজন ভিক্ষু বৈশালীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগের দশবস্তু চালাইবার চেষ্টা যে ধর্মবিরুদ্ধ এ বিষয়ে তাঁহার কোনো সন্দেহ রহিল না। তিনি প্রথমেই মহাবনবিহারে উপষোথ-শালায় দেখিলেন একটা ধাতুপাত্রে জল রহিয়াছে, উপাসকেরা তাহাতে কাহাপন দিতেছে। তিনি বলিলেন, এটা বড়ো দোষের কথা। তিনি উপাসকদিগকে বারণ করিয়া দিলেন, তোমরা দিও না। বৈশালীর ভিক্ষুরা খুব চটিয়া গেল। তাহারা নানারূপে তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। তিনি পলাইয়া কৌশাম্বী গেলেন। এবং সেখান হইতে পাবা ও অবন্তীতে ভিক্ষুদের নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন ও নিজে অহোগঙ্গ পর্বতে গমন করিলেন। সম্ভূত শোনবাসী অহোগঙ্গ পর্বতে বাস করিতেন। যশ তাঁহার নিকট সকল কথা বলিলেন। ক্রমে পাবা হইতে ৬০ জন ও অবন্তি হইতে ৮০ জন ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে রেবত সকলের চেয়ে প্রাচীন ও সকলের চেয়ে বিদ্বান। তাঁহাকে একথা জানানো যাক। তিনি তক্ষশিলার নিকট বাস করিতেন। সহজাতি নামক স্থানে রেবতের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। রেবত শুনিয়া বলিলেন, এই দশটাই ধর্মবিরুদ্ধ এবং এই দশটাই উঠিয়া যাওয়া উচিত। বৈশালীর ভিক্ষুরা তাঁহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার এক শিষ্যকে বশ করিয়া ফেলিলেন। রেবত তাঁহাদের কথা শুনিলেন না এবং শিষ্যটিকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৈশালীর ভিক্ষুরা পাটলিপুত্রের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না।

সহজাতিতে ১১৯০ হাজার ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু রেবত বলিলেন, যাহারা এ বিবাদ উপস্থিত করিয়াছে তাহাদের সম্মুখেই এ বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। অতএব তোমরা বৈশালী চলো। সেখানে রেবত দেখিলেন যে, লোকে বাজে কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিতেছে। সুতরাং তিনি প্রস্তাব করিলেন উব্বাহিকা করিয়া ইহার নিষ্পত্তি করো। অর্থাৎ আট জন লোককে বাছিয়া লইয়া তাহাদের হাতে নিষ্পত্তির ভার দাও।

৮জন বড়ো বড়ো ভিক্ষু বাছিয়া লওয়া হইল। ইঁহাদের সকলেরই বয়স এক শতের উপর। ইঁহারা সকলেই তথাগতকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই দশবস্তুর বিরুদ্ধে মত দিলেন। ক্রমেই সে মত প্রচার হইল। যাঁহারা সে মত গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের নাম হইল স্থবিরবাদী অথবা থেরাবাদী। যাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহাদের নাম হইল মহাসাংঘিক। এইরূপে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে দশটি সামান্য কথা লইয়া ঝগড়া হইয়া বৌদ্ধধর্মের দুই দল হইয়া গেল।

'নারায়ণ', কার্তিক, ১৩২২

মহাসাংঘিক মত

বুদ্ধদেব কখন পরিনিবৃত হন, তাহার দিন তারিখ ঠিক নাই। লঙ্কাবাসীরা বলেন, তিনি খৃ. পৃ. ৫৪৩ সালে নির্বাণ লাভ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বরাবর বলিয়া আসিতেছিলেন যে, এই গণনায় ৬৬ বৎসরের ভুল আছে। তাহার পরে কাণ্টন নগরে চীন দেশে একখানি কাঠের পাটা পাওয়া যায়, উহাতে কতকগুলি ফোঁটা দেখা যায়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর দিন হইতে বছর বছর ঐ পাটা সিন্দুকের ভিতর হইতে মহাসমারোহে বাহির করিয়া মঠের ভিক্ষুরা উহাতে একটি করিয়া ফোঁটা দিতেন; ফোঁটা গুণিয়া বৎসর ঠিক করিয়া লইতেন। যখন লেখার ব্যবহার অধিক হয় নাই, তখন অনেক লোকেই ফোঁটা দিয়া হিসাব রাখিতেন; আমরাও বালককালে দেখিয়াছি, পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা ফোঁটা দিয়া ধোপার হিসাব, গোয়ালার হিসাব রাখিত। কাণ্টন নগরে যে পাটা পাওয়া যায়, তাহাতে ৯৭৫ টি ফোঁটা ছিল এবং ৪৮৯ খৃঃপূঃ সালে শেষ ফোঁটা দেওয়া হয়। সুতরাং ৯৭৫-৪৮৯=৪৮৬ খৃঃপূঃ সালে বুদ্ধদেব নির্বাণ প্রাপ্ত হন। অনেক বাদানুবাদের পর ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ৪৮৩ খৃঃপূঃ সালেই তাঁহার নির্বাণ হয়।

ইহার পর একশত বৎসর বৌদ্ধদের মধ্যে কোনোরূপ দলাদলি হয় নাই। কিন্তু বৌদ্ধগণ যে বড়ো আনন্দে ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহাদের মধ্যে বিলক্ষণ গোলমাল ছিল। যেদিন বুদ্ধদেব মরেন, সেই দিনই সুভদ্দ নামে এক ভিক্ষু বলিয়া বসেন, "আঃ, বাঁচলাম, কঠোর শাসন হইতে আমাদের উদ্ধার হইল। এখন আমরা যা খুশি করিতে পারিব।" যাহা হউক, স্থবিরেরা একত্র হইয়া রাজগৃহের নিকট সপ্তপর্ণী গুহার সম্মুখে এক সংগীতি করিয়া সব গোলযোগ মিটাইয়া দেন ও বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপকে সংঘথের করিয়া ধর্মশাসনের বন্দোবস্ত করেন। তদবধি একজন করিয়া সংঘথের থাকিতেন; তিনিই বৌদ্ধদের আপিলকোর্ট ছিলেন। কোনো গোলযোগ হইলে সকলে তাঁহার নিকট গিয়া পড়িতেন। তিনি যাহা বলিতেন, কাজ সেইরূপ হইত।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে অর্থাৎ খৃস্টের ৩৮৩ বৎসর পূর্বে, সর্বকামী সংঘথের ছিলেন। তাঁহার সময়ে "দশবস্তু" লইয়া বৈশালীর বজ্জিপুত্তদের সঙ্গে যে দলাদলি

হয়, সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ; তক্ষশিলা হইতে রেবত আসিয়া "উব্বাহিকা" করিয়া যেরূপে দলাদলি মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেকথাও বলা হইয়াছে। থেরাবাদীরা বলেন, তাঁহাদের দিকে ১১,৯০,০০০ ভিক্ষু ছিল; আর বৈশালীওয়ালারনের পক্ষে ১০,০০০ মাত্র। একথা ঠিক বিশ্বাস হয় না। কারণ, বৈশালীওয়ালারা নাম লইল "মহাসাংঘিক" । এত কম হইলে তাহারা কোন্ সাহসে এত বড়ো নাম লইবে? আর অশোকের পূর্বে এগারো লক্ষ ভিক্ষু থাকাও বড়ো সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বোধ হয়, সংখ্যায় বিরুদ্ধ দলই বড়ো ছিল। কিন্তু বয়স, বিজ্ঞতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, পসার-প্রতিপত্তিতে থেরাবাদীরা বড়ো ছিল। থেরাবাদীদের ইতিহাস পালিগ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু মহাসাংঘিকদের ইতিহাস নাই বলিলেই হয়। চীনদেশে যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা কনিষ্কের সময় হইতেই বিশ্বাসযোগ্য; কারণ, তাঁহার সময়ই চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রবেশ হয়। খৃ. পূ. ৩৮৩ হইতে খৃ. ৭৮ পর্যন্ত মহাসাংঘিকদের ইতিহাস অন্ধকার। অশোকের রাজত্বের ১৭ বৎসরে পাটলিপুত্রে যে সংগীতি হয়, মহাসাংঘিকেরা তাহার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। কনিষ্কের সময় জলন্ধরে যে সংগীতি হয়, থেরাবাদীরাও আবার তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যাহা হউক, দ্বিতীয় সংগীতি ৩৮৩ হইতে অশোকের সংগীতি পর্যন্ত মহাসাংঘিকদের ছয়টা দল হয় থেরাবাদীদের ১২ দল হয়। সর্বসুদ্ধ ১৮টা দল হইয়া বৌদ্ধেরা একপ্রকার লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। অশোকের অনুগ্রহ পাইয়া থেরাবাদীরা প্রবল হইয়া উঠিল। মহাসাংঘিকদের যে কী দশা হইল, তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। তাহারা বোধ হয় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

ইহার পরই ৪০/৫০ বৎসরের মধ্যে মৌর্যরাজাদের বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙিয়া গেল। যিনি ভাঙিলেন, তিনি শুঙ্গ গোত্রের একজন সামবেদী ব্রাহ্মণ। তাঁহার নাম পুষ্যমিত্র। প্রাচীন পুথিতে ষ্য ও ষ্প প্রায়ই সমান, সেইজন্য অনেকে মনে করেন যে তাঁহার নাম পুষ্পমিত্র। তিনি বৌদ্ধদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। তিন-চারি শত বৎসর পরে যেমন রোমান সাম্রাজ্যে খৃশ্চিয়ানদিগের উপর অত্যাচার হইত, পুষ্পমিত্র সেইরূপ আরম্ভ করিলেন; তিনি বিধর্মী ও সমাজদ্রোহী বলিয়া অনেক বৌদ্ধের প্রাণসংহার করিলেন। বৌদ্ধেরা তাঁহার নাম পর্যন্ত মুখে আনিত না, মুখে আসিলেও গালি দিত। এ অত্যাচার হইতে মহাসাংঘিক দল অনেকটা রক্ষা পাইয়াছিলেন। কারণ—যাহাদের কথায় অশোক যজ্ঞে পশুহত্যা নিষেধ করিয়া সকল ব্রাহ্মণের; বিশেষত সামবেদী ব্রাহ্মণের, মনে দারুণ আঘাত দিয়াছিলেন, তাঁহার রাগটা তাহাদের উপর অধিক পড়িয়াছিল। এদিকে আবার থেরাবাদীদের নির্যাতনে মহাসাংঘিকেরা কতকটা হিন্দুদের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধদেবকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন। বুদ্ধদেব আশি বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, একথা তাঁহারা মনেও করিতে পারিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, তিনি কোনো অনির্বচনীয় ভাবে আছেন। যতদূর দেখা যাইতেছে, তাঁহারাই প্রথমে বুদ্ধমূর্তি

নির্মাণ করিয়া বিহারে স্থাপিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পুথি-পাঁজি সংস্কৃত-মিশ্রিত ভাষায় লেখা হইত। তাঁহারা বুদ্ধদেবকে "মহাবস্তু" বলিয়া মনে করিতেন। থেরাবাদীরা বিনয়ের কঠোর শাসনে বদ্ধ ছিলেন। ইঁহারা তো গোড়া হইতেই সে শাসনের কঠোরতা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহারা দর্শনশাস্ত্রের দিকে অধিক ঢলিয়া পড়িলেন।

থেরাবাদীরা মনে করিতেন, বিনয়ের নিয়ম রক্ষা করিতে করিতে তাঁহাদিগের চরিত্র বিশুদ্ধ হইবে এবং চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে তাঁহারা অনেক জন্মের পর এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িবেন যে, মুক্তির পথ হইতে তাঁহাদিগকে আর ফিরিতে হইবে না। এইরূপ অবস্থাকে তাঁহারা স্রোতাপত্তি বলিতেন অর্থাৎ স্রোতে পড়িলে যেমন মানুষ আর ফিরে না, ক্রমেই একদিকে ভাসিয়া যায়, সেইরূপ তাঁহারাও নির্বাণের দিকে ভাসিয়া যাইবেন। আরো কিছুদিন পরে তাঁহারা এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িবেন যে, তাঁহাদিগকে আর একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ইহাকে তাঁহারা সকৃদাগামী অবস্থা বলিতেন। আরো অগ্রসর হইলে তাঁহাদের আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, ইহার নাম অনাগামী অবস্থা; ইহার পর তাঁহারা অর্হৎ হইবেন। কিন্তু তাঁহারা মুক্তি পাইবেন না, অর্হৎ হইয়া বসিয়া থাকিবেন। আবার নূতন বুদ্ধ আসিলে তাঁহারা সেই বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ নিবিয়া যাইবেন। তাঁহারা আর জন্মগ্রহণ করিবেন না। তাঁহারা জন্ম-জরা-মরণের হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইবেন। তাঁহারা কর্মের দ্বারাই মুক্তি হয় ভাবিতেন। মহাসাংঘিকেরা মনে করিতেন, বিনয় প্রথম কতকটা দরকার হয় বটে, কিন্তু যেমন পাটলিপুত্র হইতে কোনো বণিক যদি বাণিজ্য করিতে যায়, সে প্রথম ঘোড়া হাতি উটের পিটে ও গাড়িতে মাল চাপাইয়া বরাবর গিয়া তাম্রলিপ্তিতে উপস্থিত হয়; সেখানে গিয়া দেখে যে, আর হাতি ঘোড়া উটও চলিবে না, গাড়িও চলিবে না, এখন নূতন যানবাহনের প্রয়োজন, এখন নৌকা চাই, দাঁড় চাই, হাল চাই, পাল চাই; তেমনি চরিত্রবলে কর্মবলে কতকদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা এমন স্থানে উপস্থিত হন যে, কর্ম, চরিত্র, বিনয়ে তাঁহাদের কোনোই সাহায্য হয় না, তখন জ্ঞান চাই; সে জ্ঞানলাভের উপায় স্বতন্ত্র—উপকরণ স্বতন্ত্র।

গোড়ায় কথা উঠিয়াছিল, বুদ্ধদেব লৌকিক অপর মানুষের মতো, না অলৌকিক কেমন দেবতা? থেরাবাদীরা বলিতেন, তিনি মানুষ, মহাসাংঘিকেরা বলিলেন, না। তিনি অলৌকিক শব্দ ব্যবহার করিতেন না। বলিতেন, লোকোত্তর, তাই মহাসাংঘিকদের আর-এক নাম হইল লোকোত্তরবাদী। 'মহাবস্তু'তে আছে, "অঘ্যমহাসাঙ্ঘিকানাং লোকাত্তরবাদিনাং পাঠেন" ইত্যাদি। তাঁহারা বলিতেন, বুদ্ধদেবের কোনো আস্রব ছিল না, অর্থাৎ কোনো দোষ ছিল না। অর্থাৎ তাঁহার অহংবুদ্ধি ছিল না. অজ্ঞান ছিল না, এবং জন্মমৃত্যুর তিনি অতীত ছিলেন। থেরাবাদীরা বলিতেন, প্রথম দুইটি কথা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু শেষটি ঠিক হইল কেমন করিয়া? তাহা হইলে তিনি মরিবেন কেন? তিনি যখন মানুষ হইয়া জন্মিয়াছিলেন, তখন মানুষের মতো তাঁহার সবই ছিল। নহিলে তাঁহাকে

দেখিয়া কাহারো রাগ হইত, কাহারো ঈর্ষা হইত, কাহারো দ্বেষ হইত কেন? সুতরাং তোমার আমার মতো তিনি মানুষ ছিলেন, তাঁহার আশ্রবও ছিল। মহাসাংঘিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেব কখনো একটি বৃথা কথা কহেন নাই, তিনি যাহাই বলিতেন, তাহাতেই উপদেশ পাওয়া যাইত। তিনি নিরন্তরই লোকের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেন, লোকের উদ্ধার ছাড়া তাঁহার আর কাজই ছিল না। শোওয়া, বসা, দাঁড়ানো ও পাইচারি করা এই চারিটিকে ঈর্ষ্যাপথ বলে, বুদ্ধদেব যে কোনো ঈর্ষ্যাপথেই থাকুন, তাঁহার দ্বারা কেবল লোকের উপকারই হইত। থেরাবাদী বলিতেন, একথা আদৌ সত্য নহে, তিনি মানুষ ছিলেন, মানুষের মতো তাঁহাকে খাওয়া দাওয়া করিতে হইত, পাইচারি করিতে হইত, দাঁতন করিতে হইত, স্নান করিতে হইত; এই-সকলের জন্য লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে হইত, হুকুম করিতে হইত। এ-সকলের দ্বারা লোক উদ্ধার হইবে কিরূপে? তিনি অযথা কথা কহিতেন না, বাজে কথা কহিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার সকল কথায়েই যে লোক উদ্ধার হইত, এটা বড়ো বেশি কথা। মহাসাংঘিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেবের ঘুম ছিল না, সুতরাং স্বপ্নও ছিল না। থেরাবাদীরা বলিতেন, স্বপ্ন ছিল কিনা জানি না, কিন্তু তিনি তো মানুষ, ঘুম ছিল না, সে কী কথা? মহাসাংঘিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেব নিরন্তরই সমাধিমগ্ন থাকিতেন; সুতরাং কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে ভাবিতে হইত না। তিনি একেবারেই তাহার জবাব দিতে পারিতেন ও দিতেন। থেরাবাদীরা বলিতেন, তাঁহাকেও ভাবিয়া জবাব দিতে হইত।

থেরাবাদীরা বলিত, কই, বুদ্ধদেব তো নিজে কখনো বলেন নাই যে, তিনি লোকোত্তর, তবে তোমরা তাঁহাকে "লোকোত্তর" "লোকোত্তর" বলিয়া গোল করো কেন? তাঁহার মতে, যাহা পরমার্থ, তাহাই তিনি শিখাইতেন, তিনি তো কখনো বলেন নাই যে, তিনি অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া এই-সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে পরমার্থ লাভ করিয়াছিলেন, শিষ্যদিগকেও তাহাই উপদেশ দিতেন। মহাসাংঘিকেরা বলিতেন, সত্য, কিন্তু পড়ো দেখি বুদ্ধের উপদেশ, পড়ো দেখি তাঁহার সূত্রান্ত, দেখো দেখি, তাহাতে কত গভীর ভাব, কত গভীর উপদেশ, কত গূঢ় তত্ত্বকথা আছে। সাধারণ মানুষের সাধ্য কী সে-সব কথা কয়, সে-সব ভাব মনে ধারণা করে, সে-সব গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করে। এই-সকল কথা হইতেই মহাসাংঘিক ধর্মের উৎপত্তি হয়।

'নারায়ণ', মাঘ, ১৩২৩

থেরাবাদ ও মহাসাংঘিক

সংস্কৃতে নিদান শব্দের অর্থ আদিকারণ, মূলকারণ, একেবারে গোড়া। বৈদ্যেরা রোগের নিদান খোঁজেন অর্থাৎ মূল কারণ খোঁজেন, তাহার পরে চিকিৎসা করেন।

আমরাও সংসার-যাত্রায় সকল ব্যাপারেরই আদি কী দেখিতে চাই। বৌদ্ধেরা যখন সংসারের মূল খুঁজিতে যান, তখন অবিদ্যা, সংস্কার-বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, এই বারোটি সংসারের নিদান বলিয়া দেখেন। যখন বুদ্ধদেবের নিদান খুঁজিতে যান, তখন তিনি পূর্ব পূর্ব জন্মে বুদ্ধ হওয়ার জন্য কী কী করিয়াছিলেন, তাহাই খোঁজেন। এই বুদ্ধনিদান সম্বন্ধে থেরাবাদীদের ও মহাসাংঘিকদের বিশেষ মতান্তর। থেরাবাদীরা চব্বিশটি বৈ বুদ্ধ মানেন না, ইঁহাদিগের প্রথম হইতেছেন দীপংকর ও শেষ হইতেছেন কাশ্যপ। তাঁহাদিগের নামগুলি এই— ১. দীপংকর, ২. কৌণ্ডিন্য, ৩. মঙ্গল, ৪. সুমনস, ৫. রেবত, ৬. শোভিত, ৭. অনোমদর্শিন্, ৮. পদ্ম, ৯. নারদ, ১০, পদ্মোত্তর, ১১. সুমেধাঃ, ১২. সুজাত, ১৩. প্রিয়দর্শিন্, ১৪. অর্থদর্শিন্, ১৫. ধর্মদর্শিন্, ১৬. সিদ্ধার্থ, ১৭. তিষ্য, ১৮. পুষ্য, ১৯. বিপশ্যী, ২০. শিখী, ২১. বিশ্বভূ, ২২. ক্রকুচ্ছন্দ, ২৩.কনকমুনি, ২৪. কাশ্যপ। ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি শাক্যমুনি বুদ্ধ হইবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া গিয়াছেন, তিনি তিনিই শাক্যমুনি বুদ্ধের নিদান।

দীপংকর তাঁহার এক শিষ্য মেঘ নামে এক বামনের ছেলেকে বলিয়াছি লেন, অনাগত অধবা অর্থাৎ ভবিষ্যকালে তুমি শাক্যমুনি নামে বুদ্ধ হইবে, কপিলবাস্তু তোমার জন্মভূমি হইবে, শুদ্ধোদন তোমার পিতা হইরেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই চব্বিশ জনের মধ্যে আরো ২/৪ জন, শাক্যমুনি সম্বন্ধে ২/৪ কথা বলিয়া গিয়াছেন। চব্বিশ জনের শেষ বুদ্ধ কাশ্যপ বলিয়াছিলেন, হে শিষ্য জ্যোতিষ্পাল, আমার পরেই ভবিষ্যতে তুমি শাক্যমুনি বুদ্ধ হইবে।

এই হইল থেরাবাদ মতে শাক্যসিংহের নিদান। এ মতে বুদ্ধ চব্বিশ জন কেন হইলেন, বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয়, সেকালের লোকে, চব্বিশ সংখ্যাটা বড়ো ভালোবাসিত। থেরাবাদীদের তো চব্বিশ জন বুদ্ধ ছিলেন, জৈনদের চব্বিশ জন তীর্থংকর, সাংখ্যদের চব্বিশটি তত্ত্ব, কোনো কোনো পুরাণেও ভগবানের অবতার চব্বিশটি, আমরা যে-সকল মুনিদের মত লইয়া চলি, তাঁহাদেরও সংখ্যা চব্বিশ। 'চতুর্ব্বিংশতি-মুনির্মতম্' নামে একখানি প্রাচীন স্মৃতি-সংগ্রহ আছে।

মহাসাংঘিকদের মতে বুদ্ধনিদান অন্যরূপ। তাঁহাদের মতে বোধিসত্ত্বগণের চারি প্রকার চর্যা অর্থাৎ আচার আছে। এক-এক চর্যায় কত শত জন্ম-জন্মান্তর চলিয়া যায়। থেরাবাদীরা যাহা বলিতেছেন, তাহা শেষ চর্যার শেষ অংশ মাত্র; পূর্ব তিনটি চর্যার নামও ইহাতে নাই। চর্যা চারিটির নাম—১. প্রকৃতিচর্যা, ২. প্রণিধানচর্যা, ৩. অনুলোমচর্যা, ৪. অনিবর্তনচর্যা। প্রকৃতিচর্যায় বোধিসত্ত্ব মাতৃভক্ত, পিতৃভক্ত, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্, কুলজ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তিমান্, দশ কুশলকর্মপথের পথিক, লোককে সর্বদাই দান করিতে, পুণ্যকর্ম করিতে উপদেশ দেন, বুদ্ধদিগের পূজা করেন; কিন্তু তাঁহার মন এখনো বোধি লাভের জন্য লালায়িত নয়। ইহার পরে প্রণিধানচর্যা অর্থাৎ

আমাকে বুদ্ধ হইতেই হইবে, ইহা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা। এই প্রণিধানচর্যায় পাঁচটি অংশ আছে, এক-একটির নাম, প্রণিধি। প্রথম প্রণিধি—আমি বুদ্ধ হইব। দ্বিতীয় প্রণিধি—আমি বুদ্ধকে অনেক বস্তু দান করিলাম। তৃতীয় প্রণিধি—যত কালই যাউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, আমাকে বুদ্ধ হইতেই হইবে। চতুর্থ প্রণিধি—বুদ্ধ ও সংঘের জন্য অনেক গুহা, অনেক বিহার দান করা। পঞ্চম প্রণিধি—জগৎ অনিত্য এইটি বুঝিতেই হইবে।

ইহার পর তৃতীয়, অনুলোমচর্যা। প্রণিধান চর্যার অনুকূল যাহা-কিছু করিতে হয়, তাহা এই চর্যায়েই করিতে হয়। চতুর্থ, অনিবর্তনচর্যা, এই চর্যায় বোধিলাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিত্ত আর অন্য দিকে ফিরিয়া আসিতে চাহে না, এই চর্যায়ই ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণ শব্দের অর্থ গ্রামার নহে, ইহার নাম ব্যাখ্যা অথবা ভবিষ্যদ্‌বাণী। অর্থাৎ কোনো বুদ্ধ তাঁহার শিষ্য বোধিসত্ত্বকে বলিয়া দেন, তুমি ভবিষ্যতে কোনো-না-কোনো সময়ে বুদ্ধ হইবে। থেরাবাদীদের নিদান এই ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, উহা এক প্রকার শেষ চর্যার নিদান।

তবে মহাসাংঘিকদের নিদান কিরূপ? চারি চর্যায় অসংখ্য নিদান। শাক্যসিংহের প্রকৃতিচর্যার নিদান অপরিমিতধ্বজ বুদ্ধ। তখন আমাদের শাক্যমুনি একজন চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। তিনি ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইয়া দশ কুশলকর্মপথের পথিক হন, বৌদ্ধ ভাষায় দশ কুশলকর্মের গোড়া গাড়েন। প্রণিধানচর্যায় আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধের নিদান একজন অতীত শাক্যমুনি বুদ্ধ। আমাদের শাক্যমুনি তখন বণিকশ্রেষ্ঠী ছিলেন, তিনি বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমিও একদিন শাক্যমুনি নামে বুদ্ধ হইব, আমারো একদিন কপিলবাস্তু নামে নগর হইবে। অনুলোমচর্যায় শাক্যমুনির নিদান সমিতাবী বুদ্ধ। তখন শাক্যমুনি একজন চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। অনিবর্তনচর্যায় শাক্যমুনির অনেক নিদান; তন্মধ্যে দীপংকর তাঁহার ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। দীপংকরের পরে আরো অনেক বুদ্ধ সেই ব্যাকরণের অনুব্যাকরণ করিয়াছিলেন। সর্বাভিভূ ভগবান বুদ্ধঅনু-ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। বিপশ্যী, ক্রকুচ্ছন্দ, কাশ্যপ শাক্যমুনির ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। কাশ্যপ আবার বলিয়াছিলেন, তোমায় আমি যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলাম।

যৌবরাজ্যে অভিষেক থেরাবাদীদের নাই, চব্বিশ জনের অধিক বুদ্ধও নাই, কিন্তু মহাসাংঘিকদের মতে সহস্র সহস্র বুদ্ধ। 'মহাবস্তু অবদানে'র আদিতেই "নিদাননমস্কারাণি সমাপ্তানি" বলিয়া একটি ছোট্ট প্যারাগ্রাফ আছে। প্যারাগ্রাফ বলি কেন? অধ্যায় বলিতে পারি না, অত বড়ো নয়। সেই প্যারাগ্রাফে যে কয়েকটি নিদানের নাম আছে, তাহাই আমরা পূর্বে দিয়াছি। কিন্তু বই পড়িতে পড়িতে অনেক বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। একটু উদাহরণ দিতেছি। মহাবস্তুর মূল গদ্যে, কিন্তু তাহার আবার মূল পদ্যে বা গাথায়

আছে, তাহারই কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি—

শাক্যমুনিনামকানামুপস্থিতাস্ত্রিংশ কোটিয়ো জিনানাং।
অষ্টশতসহস্রাণি দীপঙ্করনামধেয়ানাং॥১॥
ষষ্টিং চ সহস্রাণি প্রদ্যোতনামধেয়ানাং ***।
তথ পুষ্পনামকানাং ত্রয়ো কোটিয়ো বাদিসিংহানাং॥ ২॥
অষ্টাদশ সহস্রাণি মারধ্বজনামকানাং সুগতানাং।
যত্র চরে ব্রহ্মচর্য্যং সর্ব্বজ্ঞতামভিলাষায়॥ ৩॥
পূজয়ি পঞ্চশতানি পদ্মোত্তরনামকানাং সুগতানাং।
কৌণ্ডিন্যনামকানামপরাণি দ্বি সহস্রাণি॥ ৪॥
অপরিমিতাসংখ্যেয়া প্রত্যেকজিনান কোটিনযুতাং চ।
পূজয়ি বুদ্ধসহস্রং জম্বুধ্বজনামধেয়ানাং॥ ৫॥
চতুরশীতি সহস্রাণি ইন্দ্রধ্বজনাম[কানাং] সুগতানাং।
নবতিং চ সহস্রাণি কাশ্যপসহনামধেয়ানাং॥ ৬॥
পঞ্চদশ বুদ্ধ সহস্রাণি প্রতাপনামকানাং সুগতানাং।
পঞ্চদশ চ সহস্রাণি আদিত্যনামধেয়ানাং॥ ৭॥
দ্বাষষ্টিং চ শতানি সুগতানামন্যোন্যনামধেয়ানাং।
চতুঃষষ্টিং চ সহস্রাণি সমিতাবিনামধেয়ানাং॥ ৮॥
এতে চ কোলিতশিরী অন্যে চ দশবলা অপরিমাণা।
সর্ব্বে অনিত্যতায় সমিতা শোকপ্রদ্যোতা॥ ৯॥
যানি চ বলানি কোলিত তেষাং মহাপুরুষলক্ষবরাণাং।
সর্ব্বে অনিত্যতায় কালং না উপেন্তি সংখ্যাং চ॥ ১০॥
জ্ঞাত্বানানিত্যবলং সুদারুণং সৎকৃতস্য অনন্তরং।
বীর্যারম্ভ যোজিতো অনিত্যবলস্য বিঘাতায়॥ ১১॥

[শুদ্ধাবাসদেবনিকায়ে প্রস্থানং মৌদ্‌গল্যায়নস্য]

মহাসাংঘিকদের সংখ্যাটা খুব লম্বা লম্বা। কথায় কথায় তিন কোটি, চারি কোটি, নব্বই হাজার, বিশ হাজার, চৌরাশি হাজার বুদ্ধের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। গরিব থেরাবাদীদের অত লম্বা-চৌড়া ছিল না। এদিকে যেমন সংখ্যায় লম্বা-চৌড়া, কালের পরিমাণেও মহাসাংঘিকেরা সেইরূপ লম্বা-চৌড়া। নবনবতি কোটিকল্প মহাযানীরা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ মহাসাংঘিকেরাও বড়ো কম যান না। সমিতাবী নামে একজন বুদ্ধ দেখিলেন, আমি নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে, এককল্প দু কল্প কোনো বুদ্ধ হইবেন না, সহস্র কল্পের পরে বুদ্ধ হইবেন। কিন্তু এত কাল ধরিয়া তো বুদ্ধ-কার্য হওয়া চাই। বুদ্ধ হইবে না; তো, কে করিবে? অতএব আমাকেই থাকিতে

হইল। তিনি শত সহস্র কল্প রহিলেন। পূর্বে বলিয়াছিলেন, সহস্র কল্পের পর বুদ্ধ হইবেন, এখন শত সহস্র কল্প রহিয়া গেলেন! মাঝের ও শতটা যেন কিছুই নয়!

জাপানদেশী সুজুকি সাহেব যে লিখিয়াছেন, অল্পবয়স্ক ভিক্ষুরা বুদ্ধদেব আশি বৎসরে মরিয়া গেলেন বলিয়া বড়োই দুঃখিত হইয়াছিলেন, বুদ্ধদেব তো মনে করিলেই এককল্প দুই কল্প থাকিতে পারিতেন, থাকিলেন না কেন? থেরাবাদীরা বলিলেন, তিনি মরিয়াছেন। অনেক বিরুদ্ধবাদীরা বলিলেন, না, তিনি মরেন নাই, মরিবেনও না, তিনি মৃত্যুর ভান করিয়াছেন মাত্র। কোনো কোনো মহাযানের বইয়ে আছে, সমুদ্রের জলবিন্দু বরং গণিয়া উঠা যায়, সুমেরু গুঁড়াইয়া সরিষার মতো করিয়া ফেলিলে সে সরিষাও গণিয়া উঠা যায়, কিন্তু শাক্যমুনির বয়স গণিয়া উঠা যায় না।

যাহা হউক, বুদ্ধ-নিদান লইয়া এই দুই দলে যে মতান্তর ছিল, তাহার ব্যাখ্যা করা গেল। আরো অনেক জিনিস লইয়া মতান্তর আছে, পরে দেখা যাইবে। তবে একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি, পালি জাতকে বুদ্ধদেবের নিদানের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া আছে, 'মহাবস্তুতে' সেগুলি একত্র করিয়া একটা ধারা বাঁধিয়া লেখা আছে। ধারা এই যে, চারি চর্যায় যতগুলি নিদান আছে, চর্যাক্রমে সেগুলিকে সাজানো হইয়াছে। কালের পরিমাণ যতই লম্বা-চৌড়া হউক, সময়ানুসারে সেগুলিকে সাজানো হইয়াছে। থেরাবাদীরা "বুদ্ধায় নমঃ" বলিলেই যথেষ্ট মনে করেন, কিন্তু ইঁহারা গোড়ায়ই আরম্ভ করিলেন, "ওঁ নমঃ শ্রীমহাবুদ্ধায়াতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নেভ্যঃ সর্ব্ববুদ্ধেভ্যঃ", অর্থাৎ তাঁহারা এক বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালে যত বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, হইবেন ও হইতেছেন, সকল বুদ্ধকে নমস্কার করিতেছেন। থেরাবাদীরা চব্বিশ ও দুই (শাক্যসিংহ ও মৈত্রেয়) এই ছাব্বিশজনেই সন্তুষ্ট, কিন্তু মহাসাংঘিকেরা "ছাব্বিশকোটিনিযুতশতসহস্রে"ও সন্তুষ্ট নহেন!

নিদান-নমস্কারে প্রকৃতিচর্যায় ভগবান্ শাক্যসিংহ একজন মাত্র, অর্থাৎ অপরিমিতধ্বজ বুদ্ধের নিকটে ধর্মের গোড়া গাড়িয়াছিলেন, কিন্তু কেবল সংক্ষেপের জন্য সেখানে একজনের নাম করা হইয়াছে। বহুতর বুদ্ধের নিকটেই তিনি ধর্মের গোড়া গাড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বিস্তার করিয়া দেওয়া আছে। যথা—

'এবমুক্তে আয়ুষ্মান্ মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মন্তং মহাকাত্যায়নমুবাচ। ভগবতা ভো জিনপুত্র সম্যক্সংবুদ্ধেন শাক্যমুনিনা প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থা পঞ্চমা ষষ্ঠা সপ্তমাসু ভূমিষু বর্ত্তমানেন যেষু সম্যক্সংবুদ্ধেষু কুশলমবরোপিতং, তেষাং সম্যক্সংবুদ্ধানাং, কানি নামানীতি। এবমুক্তে আয়ুষ্মান্ মহাকাত্যায়ন আয়ুষ্মন্তং মহাকাশ্যপমুবাচ॥ যেষু ভো ধৃতধর্ম্মধর সম্যক্সংবুদ্ধেষু ভগবতা শাক্যবংশপ্রসূতেন কুশলমূলবরোপিতং। তেষাং বিপুলবলবরকীর্ত্তিনাং নামানি শৃণু॥

"প্রথমতঃ, সত্যধর্ম্মবিপুলাকীর্ত্তিঃ, ততঃ সুকীর্ত্তিঃ, লোকাভরণঃ, বিদ্যুৎপ্রভঃ, ইন্দ্রতেজঃ, ব্রহ্মকীর্ত্তিঃ বসুন্ধরঃ, সুপার্শ্বঃ, অনুপবদ্যঃ, সুজ্যেষ্ঠঃ, সৃষ্টরূপঃ, প্রশস্তগুণরাশিঃ, মেঘস্বরঃ,

হেমবর্ণঃ, সুন্দরবর্ণঃ, মৃগরাজঘোষঃ, আশুকারী, ধৃতরাষ্ট্রগতিঃ, লোকাভিলাষিতঃ, জিতশত্রুঃ, সুপূজিতঃ, যশোরাশিঃ, অমিততেজঃ, সূর্যগুরুঃ, চন্দ্রভানুঃ, নিশ্চিতার্থঃ, কুসুমগুপ্তঃ, পদ্মাভঃ, প্রভংকরঃ, দীপ্ততেজঃ, সপ্তরাজঃ, গজদেবঃ, কুঞ্জরগতিঃ, সুঘোষঃ, সমবুদ্ধিঃ, হেমবর্ণ-লম্বদামঃ, কুসুমদামঃ, রত্নদামঃ, অলংকৃতঃ, বিমুক্তঃ, ঋষভগামী, ঋষভঃ, দেবসিদ্ধিমাত্রঃ, সুপাত্রঃ, সর্ব্ববন্দ্যঃ, রত্নমকুটঃ, চিত্রমকুটঃ, সুমকুটঃ, বরমকুটঃ, চলমকুটঃ, বিমলমকুটঃ, লোকংধরঃ, বিপুলোজঃ, অপরিভিন্নঃ, পুণ্ডরীকনেত্রঃ, সর্ব্বসহঃ, ব্রহ্মগুপ্তঃ, সুব্রহ্ম, অমরদেবঃ, অরিমর্দ্দনঃ, চন্দ্রপদ্মঃ, চন্দ্রাভঃ, চন্দ্রতেজঃ, সুসোমঃ, সমুদ্রবুদ্ধিঃ, রতনশৃঙ্গঃ, সুচন্দ্রদৃষ্টিঃ, হেমক্রোড়ঃ, অভিন্নরাষ্ট্রঃ, অবিক্ষিপ্তাংশ, পুরবন্দরঃ, পুণ্যদত্তঃ, হলধরঃ, ঋষভনেত্রঃ, বরবাহুঃ, যশোদত্তঃ, কমলাক্ষঃ, দৃষ্টিশক্তিঃ, নরপ্রবাহঃ, প্রণষ্টদুঃখঃ, সমদৃষ্টিঃ, দৃঢ়দেবঃ, যশকেতুঃ, চিত্রচ্ছদঃ, চারুচ্ছদঃ, লোকপরিত্রাতা, দুঃখমুক্তঃ, রাষ্ট্রদেবঃ, রুদ্রদেবঃ, ভদ্রগুপ্তঃ, উদাগতঃ, অস্খলিতপ্রবরাগ্রঃ, ধনুনাসং, ধর্ম্মগুপ্তঃ, দেবগুপ্তঃ, শুচিগাত্রঃ, প্রহেতিঃ, প্রথমশতমার্য্যপক্ষস্য ॥"

যেখানে একটি ছিল, সেখানে এই তো এক নিশ্বাসে সাতানব্বইটি নাম পাইলাম। গ্রন্থকার কিন্তু ইহাকেই একশত বলিয়াছেন, হয় তো লেখকের দোষে তিনটি নাম পড়িয়া গিয়াছে। আর-এক নিশ্বাসে আর-একশত নাম আছে। আরো এক নিশ্বাসে প্রায় আর-একশত নাম আছে। ইহাতে তো "অষ্টমা ভূমি" শেষ হইল। আবার "নবমা ভূমি"তেও এইরূপ। সুতরাং লম্বা হাতে নাম বাড়াইতে মহাসাংঘিক মহাশয়েরা খুব মজবুত। ইঁহাদের সঙ্গে গরিব থেরাবাদীরা পারিবে কেন? কাজেই ক্রমে তাঁহাদিগকে ভারত ছাড়িতে হইয়াছে।

'নারায়ণ', চৈত্র, ১৩২৩

মানুষ ও রাজা •

পৃথিবীর সকল দেশেই, পৃথিবীর উৎপত্তি কিরূপে হইল, মানুষ কিরূপে জন্মাইল, এই দুইটি কথা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া থাকে। খৃস্টানেরা বলেন, গোড়ায় এক পরমেশ্বর ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আলো হউক" অমনি আলো হইল। তিনি দেখিলেন, আলো উত্তম হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছায়ই সৃষ্টি হইয়াছে। একথা লইয়াও আবার গোলমাল আছে। কেহ কেহ বলেন, যাহা ছিল না, তাহাই হইল—অর্থাৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণু হইতে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সবই সৃষ্টি হইল। কেহ কেহ বা বলেন, পরমাণু ছিল ঈশ্বর তাহাই ভাঙিয়া গড়িয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন। আমাদের কোনো কোনো শাস্ত্রে লিখে—ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব। অমনি তিনি বহু হইয়া গেলেন। কোনো কোনো শাস্ত্রে বলে—সমস্ত জগৎ "অপ্রজ্ঞাত", "অলক্ষণ" ছিল। বিধাতাপুরুষ তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীজ হইতে এক প্রকাণ্ড অণ্ড উৎপন্ন হইল। অণ্ড দুই ভাগ হইল, এক ভাগে পৃথিবী ও আর-এক ভাগে অন্তরীক্ষ

হইল। দার্শনিকদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন এক হইতেই সব হইয়াছে ; কেহ বা বলেন, দুই-ই ছিল,-দুই হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে।

বুদ্ধদেবকে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, তোমার সে কথায় কাজ কী? তুমি আপন চরকায় তেল দাও। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় যাইবে? এই কথাই ভাবো। আকাশ কোথা হইতে হইল, পৃথিবী কোথা হইতে হইল, তাহা ভাবিয়া তোমার দরকার কী? এমন-কী, মানুষ কোথা হইতে আসিল, তাহাও তিনি কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যান নাই। মহাসাংঘিকেরা কিন্তু মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা বিশেষ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পরে পালিভাষায়ও সে মত প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু মহাসাংঘিকদের মত যে অতি পুরানো, তাহা আমরা পরে দেখাইব। মহাসাংঘিকেরা বলেন, অনাদিকাল হইতেই "সম্বর্ত" (প্রলয়) ও "বিবর্ত" (সৃষ্টি) চলিতেছে। প্রলয় হইয়া গেলে সমস্ত সত্ত্ব (জীব) "আভাস্বর" নামে এক স্বর্গে উৎপন্ন হয়। আবার যখন সৃষ্টি হয়, লোকের থাকিবার স্থান হয়, কতকগুলি "সত্ত্ব" "আভাস্বর" হইতে নামিয়া পৃথিবীতে উৎপন্ন হন। তখন তাঁহারা "স্বয়ংপ্রভ", "অন্তরীক্ষচর", "মনোময়", "প্রীতিভক্ষ", "সুখস্থায়ী" ও "কামচর" থাকেন। তাঁহাদের নিজের শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত হয়, চন্দ্রসূর্যের প্রয়োজন থাকে না, নক্ষত্রতারার প্রয়োজন থাকে না, আকাশের দরকার হয় না, দিন থাকে না, রাত্রি থাকে না, পক্ষ থাকে না, মাস থাকে না, ঋতু থাকে না, অয়ন থাকে না, বৎসরও থাকে না। তাঁহারা, যখন যেখানে ইচ্ছা, অন্তরীক্ষে ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহাদের আহার প্রীতি এবং বাড়িঘর সুখ। সুখনিবাসে থাকিয়া তাঁহারা প্রীতি ভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। তাঁহারা যাহা করেন, সবই ধর্ম।

তাহার পর পৃথিবী উদয় হইল—যেন একটি হ্রদ, জলে পরিপূর্ণ। সে জলের কী রঙ! কী আস্বাদ! মিষ্ট যেন মধু, যেন ক্ষীরের ধারা, যেন ঘৃতের ধারা। কোনো কোনো জীব একটু লোভে পড়িয়া আঙুলের আগায় সেই মধু তুলিয়া একটু চাকিলেন, ভালো লাগিল ; আবার চাকিলেন, ক্রমে খাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি আরো পাঁচ জনে চাকিতে ও খাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা পেট পুরিয়া খাইতে লাগিলেন। এতদিন জীবগণ লঘুকলেবর ছিলেন ; খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীর ভারি হইয়া উঠিল, শক্ত হইয়া উঠিল, কর্কশ হইয়া উঠিল। তাঁহাদের যে গুণগুলি ছিল, সেগুলি ক্রমে লোপ হইল, দেহের জ্যোতি লোপ হইল, শুধু প্রীতি ভক্ষণ করিয়া আর তাঁহাদের চলে না, অন্তরীক্ষে আর তাঁহারা বেড়াইতে পারেন না ; সুতরাং চন্দ্রসূর্যের দরকার হইল, নক্ষত্রের দরকার হইল ; দিন, রাত্রি, মাস, সংবৎসরের দরকার হইল।

পৃথিবীর রস খাইতে খাইতে তাঁহাদের রঙও সেইমতো হইয়া গেল। এইরূপে অনেক দিন যায়। যাঁহারা অধিক আহার করেন, তাঁহাদের রঙ খারাপ হইয়া উঠে ; আর যাঁহারা অল্প আহার করেন, তাঁহাদের রঙ ভালো থাকে। ভালো রঙের লোকে

মন্দ রঙের লোককে অবজ্ঞা করে। সুতরাং "আমি বড়ো" "তুমি ছোটো" এই মান-অভিমান জাগিয়া উঠিল। এতদিন যে ধর্ম তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল, অভিমানের উদয়ে সে ধর্মের প্রভাব খর্ব হইয়া গেল। পৃথিরী হইতে সে রসও লোপ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা খান কী? পৃথিবীর সর্বত্র ভুঁইপটপটি উঠিল—চারিদিকে যেন ব্যাঙের ছাতা ফুটিয়া উঠিল। আহা, তাহার কী বর্ণ! কী রঙ! কী গন্ধ! কী আস্বাদ! মিষ্ট যেন মৌচাকের মধু। পৃথিবীর রস অন্তর্ধান হইলে জীব-সকল দুঃখে গাইয়া উঠিলেন—হায় রস! হায় রস!

ক্রমে তাঁহারা ভুঁইপটপটি খাইতে লাগিলেন। ভুঁইপটপটির মতো তাঁহাদের রঙ হইল। এইরূপে কত কাল-কালান্তর কাটিয়া গেল। যাঁহারা অধিক আহার করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের রঙ খারাপ হইয়া আসিল ; যাঁহারা অল্প আহার করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের রঙ ভালো থাকিল। যাঁহাদের রঙ ভালো, তাঁহারা খারাপ রঙের লোককে অবজ্ঞা করেন। "আমি বড়ো", "তুমি ছোটো" এই মান-অভিমান বাড়িয়া উঠিল। ভুঁইপটপটির লোপ হইল, তাহার জায়গায় বনলতা জন্মাইল। লোকে তাহাই আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রঙ বনলতার মতো হইয়া গেল। ক্রমে বনলতার বেলায়ও মান-অভিমান আসিয়া জুটিল, বনলতারও লোপ হইল। এবার আসিলেন শালিধান।

এ ধানের কণা নাই, তুষ নাই, অতি সুগন্ধ। সন্ধ্যায় ধান কাটিলে, সকালে আবার গজাইয়া উঠে, সকালে কাটিলে সন্ধ্যায় আবার গজাইয়া উঠে ; শুধু গজাইয়া উঠে, এমন নয়, একেবারে ধান পাকিয়া উঠে, বারো ঘণ্টায় একেবারে পাকা ধান পাওয়া যায়। এই ধান খাইয়া লোকে কতকাল রহিল। প্রথম প্রথম সকলেই সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা ধান ঝাড়িয়া আনিত। সকাল-সন্ধ্যায়ই খাইত, সঞ্চয়ের নামটিও করিত না ; কিন্তু ক্রমে দু-একজন ভাবিল, দু' বেলায়ই ধান কাটিতে হইবে কেন? এক বেলাতেই দু' বেলার ধান যোগাড় করিয়া আনি। তাহারা তাহাই করিতে লাগিল। তাহাদের দেখাদেখি অনেকেই সেইরূপ করিতে লাগিল, বরঞ্চ সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়িয়া গেল। এখন আর দু' বেলার সঞ্চয়ে কুলায় না, দুই দিনের সঞ্চয় হইতে লাগিল, ক্রমে দুই সপ্তাহেরও সঞ্চয় হইতে লাগিল। ক্রমে ধানের কণা আর তুষ বাড়িতে লাগিল। আর, সকালে ধান কাটিলে সন্ধ্যায় আর গজায় না, সন্ধ্যায় কাটিলে সকালে আর গজায় না।

অন্নরসের সঙ্গে সঙ্গে আর-এক উৎপাত আসিয়া জুটিল। কতকগুলি জীবের শরীরে পুরুষের চিহ্ন দেখা দিল, কতকগুলি জীবের স্ত্রীচিহ্ন দেখা দিল। তাহারা আবার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে লাগিল, একদৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, ক্রমে দোষ উৎপন্ন হইল। দোষ উৎপন্ন হইলে লোকে লাঠি, ঠেঙা, ঢিল, পাটকেল মারিতে লাগিল, গায়ে ধুলা দিতে লাগিল। দেশে অধর্ম উপস্থিত হইল।

অধর্ম উপস্থিত হইল বলিয়া সাড়া পড়িয়া গেল। এ কী? একটি জীব আর-একটি জীবের দোষ উৎপন্ন করিয়া দেয়—এত বড়ো অন্যায়। ইহা ধর্মবিরুদ্ধ, নিয়মবিরুদ্ধ। ক্রমে ক্রমে অনেক দিনের পর এ দোষ সহিয়া গেল। লোকে মনে করিল, ইহা ধর্মসম্মত, সমাজসম্মত, সহবতসম্মত। লোকেও প্রথমে ভয়ে ভয়ে একদিন দুই দিন একত্র বাস করিত, এখন মাস, পক্ষ, সংবৎসর একত্র বাস করিতে লাগিল, গৃহকর্ম সকলও স্ত্রীলোকদিগকে করাইতে লাগিল, ক্রমে অধর্মের কথা চাপা পড়িয়া গেল।

ওদিকে কণাওয়ালা, তুষওয়ালা ধান খেত না করিলে আর জন্মায় না। কতকগুলি দুষ্টলোকে অন্যায় করিয়া সঞ্চয় করিতে গিয়া আমাদের এমন সুখের খোরাকে ছাই দিল। যাহা হউক, এখন আমাদের এক কাজ করিতে হইবে। এখন খেত ভাগ করিতে হইবে, সীমাসরহদ্দ বাঁধিয়া দিতে হইবে, কাহার কোন্ খেত ঠিক করিয়া দিতে হইবে—এই খেত তোমার, এই খেত আমার, এই খেত রামের, এই খেত শ্যামের। এইরূপে আবার কিছুদিন চলিল।

একজন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—আমার তো এই খেত, এই ধান। যদি কম জন্মায়, কী করিয়া চলিবে? সে মনে মনে ঠাহরাইল, দিক আর না দিক, অন্যের ধান আমি তুলিয়া লইব। সে আপনার ধানগুলি সঞ্চয় করিয়া অপরের খেতের ধানগুলি উঠাইয়া লইয়া আসিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া বলিল, "তুমি করো কী? পরের ধান তাহাকে না বলিয়া তুলিয়া আনিতেছ? আর এরূপ করিবে না।" কিন্তু আবার সে পরের ধান না বলিয়া তুলিয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া আবার বলিল, "তুমি ফের এই কাজ করিলে?" সে বলিল, "আর এরূপ হইবে না।" কিন্তু কিছুদিন পরে সে আবার পরের ধান উঠাইয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি এবার আর চুপ করিয়া রহিল না। সে তাহাকে বেশ উত্তম মধ্যম দিয়া দিল। তখন ধানচোর হাত তুলিয়া চিৎকার করিতে লাগল, "দেখো ভাই, আমাকে মারিতেছে, দেখো ভাই, আমাকে মারিতেছে, কী অন্যায়! কী অন্যায়!" এইরূপে পৃথিবীতে চুরি, মিথ্যাকথা, ও শাস্তির প্রাদুর্ভাব হইল।

তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল—আইস, আমরা একজন বলবান্, বুদ্ধিমান্, সকলের মন জোগাইয়া চলে—এমন লোককে আমাদের খেত রাখিবার জন্য নিযুক্ত করি। তাহাকে আমরা সকলের ফসলের অংশ দিব। সে অপরাধের দণ্ড দিবে, ভালো লোককে রক্ষা করিবে, আর আমাদের ভাগমতো ফসল দেওয়াইয়া দিবে। তাহারা একজন লোক বাছিয়া লইল। তাহাকে তাহারা ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ দিতে রাজি হইল। সকলের সম্মতিক্রমে সে রাজা হইল, এইজন্য তাহার নাম হইল মহাসম্মত। এইরূপে তেজোময় জীব অনন্ত আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে লোভে পড়িয়া মাটিতে মাটি হইয়া গেল। শেষে তাহাদের খেত আগলাইবার

জন্য একজন খেতওয়ালার দরকার হইল। সেই খেতওয়ালাই রাজা, ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ তাহার মাহিনা।

'মহাবস্তু অবদানে' বুদ্ধদেবের জন্মকথা উপলক্ষে এই বৃত্তান্তটি দেওয়া হইয়াছে। এই মহাসম্মতের অনেক পুরুষ পরে ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর অনেক পুরুষ পরে শুদ্ধোধন, শুদ্ধোদনের পুত্র বুদ্ধদেব। সুতরাং 'মহাবস্তু'র বর্ণনাটি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়।

পালি 'ত্রিপিটকে'ও এইরূপ একটি গল্প আছে, 'অগ্‌গিঞ্‌ঞ সুত্ত', অর্থাৎ অগ্রণ্যসূত্র, অর্থাৎ কে সকলের আগে—গল্পচ্ছলে তাহার উপদেশ। থেরাবাদীরা এ গল্পটি স্বয়ং বুদ্ধদেবের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের এক শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম বাশিষ্ঠ-ভারদ্বাজ, তিনি যদিও ভিক্ষু হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া মনে মনে গর্ব করিতেন। তাই বুদ্ধদেব একদিন তাঁহাকে এই গল্পটি শুনাইয়া দেন। তিনি বলিয়া দেন, ব্রাহ্মণ অগ্রণ্য নয়, ভিক্ষুই অগ্রণ্য।

যে-কেহ মহাবস্তুর অবদানের "রাজবংশে আদি" অধ্যায়টি ও "অগ্রণ্য সূত্র"টি মন দিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারই মনে হইবে, 'মহাবস্তু' দেখিয়াই এই সূত্রটি তৈয়ারি হইয়াছে। রাজবংশের কথা বলিতে গেলে রাজা কেমন করিয়া হইলেন, সেটা জানিবার ইচ্ছা আপনিই হয়। সুতরাং ঐরূপ স্থলে রাজা যে সকলের সম্মতি অনুসারে খেত আগলাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন, সে কথাটি বলা আবশ্যক। খেত তো খেতই আছে, তাহার আবার আগলানো, কী? সুতরাং খেত আগলাইবার কারণও বলার দরকার হয়। কেন খেত আগলাইবার দরকার হয়, বলিতে গেলে বলিতে হয়, লোকের দোষে। সে দোষ কী? কেমন করিয়া হইল, তাহাও বলিবার প্রয়োজন হয়। 'মহাবস্তুতে' এগুলি সব পর-পর বলা আছে। উহাতে বাজে কথা নাই। কিন্তু পালিসূত্রে অনেকগুলি বাজে কথা আছে। স্ত্রীপুরুষে মার খাইয়া বনে পলাইয়া গেল, ক্রমে, বনে তাহাদের বাস হইল, বনে গ্রাম নগর পত্তন হইল, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ-সকল কথা এ উপলক্ষে বলার কোনো দরকারই দেখি না। তাই বলিতেছিলাম, 'মহাবস্তু' দেখিয়াই সূত্র প্রস্তুত হইয়াছে। আরো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র চারি বর্ণের কথা, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ বড়ো কিনা, এ-সকল কথার মীমাংসা কি এ গল্পের দ্বারা হইতে পারে, এ যেন গণেশের মাথায় গজমুণ্ড দেওয়া। ভাষা দেখিলেও বোধ হয়, 'মহাবস্তু' আগে ও সূত্রটি তাহার পরে।

এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। রাজার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা দেশে নানা মত চলিতেছে। রাজা যে ঈশ্বরের অংশ—এই মতটি অধিক দেশেই চলিত। রাজা যে প্রজার চাকর, একথা অনেকেই বলিতে সাহস করে না। এখনকার দিনে তো অবস্থাটি ঠিক উল্‌টাইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এই মত অনেক দিন চলিয়াছিল। চন্দ্রকীর্তি খৃ. পঞ্চম শতকে বলিয়াছেন—

গণদাসস্য তে গর্ব্বঃ ষড়্‌ভাগেন ভৃতস্য কঃ।

'তুমি তো দেশের লোকের দাস। ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ মাহিনাই তোমার জীবিকা। তুমি আবার গুমর করো কী?"

'নারায়ণ', বৈশাখ, ১৩২৪

ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার

বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা

পূর্বকালে ভূলোকস্বর্গ কাশ্মীর দেশে অনন্ত বর্ম নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে বহু-সংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ বাস করিতেন। তিনি একজন প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে হিন্দুদিগের মধ্যে ক্ষেমেন্দ্র নামক একজন অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন সংস্কৃত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে 'বৃহৎ কথা' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা ক্ষেমেন্দ্র নামক একজন কবির নাম শুনিতে পাই। অনন্ত বর্মদেবের সমকালবর্তী ক্ষেমেন্দ্র ও 'বৃহৎ কথা' রচয়িতা ক্ষেমেন্দ্র এক ব্যক্তি কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। 'বৃহত কথা' গ্রন্থ এক্ষণে লোপ হইয়া গিয়াছে। প্রবাদ আছে উহা গদ্যে লিখিত। সোমদেব ভট্ট এই গদ্য গ্রন্থ হইতে 'কথা-সরিৎ-সাগর' নামক যে কবিতাময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাই এদেশে প্রচলিত আছে।

আমাদের ক্ষেমেন্দ্রের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ন্যক্ক নামে এক বন্ধু ছিলেন। কাব্য রচনায় ক্ষেমেন্দ্রের যশ চারিদিকে বিস্তৃত হইলে ন্যক্ক বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় কোনো গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার সহচর-বর্গের পূর্ব পূর্ব জন্মের পুণ্য কীর্তি-সকল বর্ণনা করিয়া জাতক ও অবদান নামে বহু-সংখ্যক গল্প প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মনীষীগণ এই সকল গল্প একত্রিত করিয়া বহু-সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মহামতি হজ্‌সন সাহেব নেপাল হইতে এইরূপ কতকগুলি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ইউরোপীয় ও এদেশীয় পণ্ডিত সমাজে সমর্পণ করিয়াছেন। এই-সকল গ্রন্থের ভাষা সংস্কৃত হইলেও উহাতে অনেক প্রকার ব্যাকরণ দোষ দৃষ্ট হয়। উহার রচনা প্রণালী অতি কর্কশ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব্দে পরিপূর্ণ। ন্যক্কের সময় এরূপ সংগ্রহ গ্রন্থ অনেক ছিল, কিন্তু তাহাদিগের ভাষার কাঠিন্য, লালিত্যশূন্যতা প্রভৃতি কারণে সেগুলি লোকশিক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া ন্যক্কের ধারণা হইয়াছিল। তিনি ক্ষেমেন্দ্রের রচনার লালিত্য, ভাবের গাম্ভীর্য, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও অসাধারণ কবিত্ব দর্শনে মনে করিতে লাগিলেন যদি ক্ষেমেন্দ্র দ্বারা জাতক ও অবদানগুলিকে কাব্যাকারে লিখাইয়া লওয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে উহা পণ্ডিত সমাজে আদরণীয় হইবে ও লোকশিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করিবে। এইরূপ মনে করিয়াই তিনি ক্ষেমেন্দ্রকে অবদান রচনার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ক্ষেমেন্দ্র ব্রাহ্মণধর্মের

পক্ষপাতী ছিলেন সুতরাং তিনি প্রথমে এই কার্যে সম্মত হন নাই। কিন্তু হৃদয়বান্ধবের অনুরোধ লোকে কতক্ষণ উপেক্ষা করিতে পারে? অনেক তর্ক বিতর্কের পর অবশেষে তিনি বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র তো বৌদ্ধদিগের অবদানাবলী অবগত নহেন তিনি কেমন করিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিবেন? ন্যক্ক তখন তাঁহাকে এক একটি করিয়া অবদান বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। এবং ক্ষেমেন্দ্র সেই অবদানগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যাকারে লিখিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপ তিন খানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা হইলে ক্ষেমেন্দ্র কহিলেন আর পারা যায় না, আমি যে শাস্ত্র জানি না, শুদ্ধ তোমার নিকট শুনিয়া সেই শাস্ত্র সম্বন্ধে কিরূপে কাব্য লেখা যাইতে পারে? তাহার পর আবার, ক্ষেমেন্দ্র কাশ্মীরাধিপতির মন্ত্রীবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বিশিষ্ট সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন। পরের জন্য তিনি দীর্ঘ কাব্য রচনার পরিশ্রম সহ্য করিতে পারিবেন কেন? তিনি বৌদ্ধ কাব্য রচনার আশা পরিত্যাগ করিলেন। কথিত আছে ক্ষেমেন্দ্র বিরত হইলে একদিন ভগবান বুদ্ধ স্বপ্নযোগে ক্ষেমেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই পুণ্য কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলেন। এবং এই পুণ্যে পরিণামে তাঁহার যে-সকল পারলৌকিক উন্নতি লাভ হইবে তাহা বর্ণনা করিলেন। নিদ্রা ভঙ্গের পর ক্ষেমেন্দ্র দেখিলেন সৌগত ধর্মাবলম্বী সৌগতবিদ্যাবারিধি, বীর্যভদ্র নামক আচার্য তাঁহাকে জিন-শাসক-শাস্ত্রে শিক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। পূর্বে তিনটি মাত্র অবদান লিখিত হইয়াছিল, এক্ষণে ভগবানের প্রসাদে বীর্যভদ্রের সাহায্যে পণ্ডিত মণ্ডলীর উৎসাহে এক এক করিয়া একশত সাতটি অবদান লিখিত হইল। এই একশত সাতটি অবদান লিখিতে এত দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল যে সপ্তোত্তর শততম অবদান শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই ক্ষেমেন্দ্র জ্ঞানবজ্রের দ্বারা সৎকায় দৃষ্টি রূপ শৈলকে ভেদ করত অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

একশত আটটি অবদান হইলে মাঙ্গলিক সংখ্যা পূর্ণ হয়। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র তো আর জগতে নাই। তিনি যে পুণ্য কার্য আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা কে শেষ করিবে? সেই ভাষায়, সেই ছন্দে, সেই অলৌকিক কাব্য রসে, সেই নব নব ভাব মালায় বিভূষিত করিয়া কে আর-একটি অবদান রচনা করিয়া অষ্টোত্তর শত সংখ্যা পূর্ণ করিবে? কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র কাল কবলে পতিত হইলেও কাশ্মীরের কবিসিংহাসন শূন্য হয় নাই। নরেন্দ্র নামক কাশ্মীরাধিপতির জয়াপীড় নামক মন্ত্রীর বংশ এখনো কবি শূন্য হয় নাই। যে বংশে ভোগীন্দ্র ও সিন্ধু অবতীর্ণ হইয়া বহুকাল ধরিয়া কাশ্মীর রাজ্য শাসন করিয়া আসিয়াছিলেন সে বংশ অদ্যাপি কবি শূন্য হয় নাই। ক্ষেমেন্দ্রের দীর্ঘ কাব্য রচনা কালে তাঁহার পুত্র সোমেন্দ্র নিজেই একজন প্রধান কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন। পিতার পুণ্য কার্য অসম্পূর্ণ রাখিতে তাঁহার মন সরিল না। তিনি জীমূতবাহন অবদান নামে একটি সুদীর্ঘ অবদান রচনা করত অষ্টোত্তরশত সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দিলেন। যে কারণে পিতৃদেব

গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিলেন এবং বৈদিক সময়ের পর ভারতীয় গ্রন্থকার মধ্যে যে অনুক্রমণিকা প্রণয়ন লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল পিতৃদেবের বিরচিত গ্রন্থের সেইরূপ একখানি অনুক্রমণিকা প্রণয়ন করিলেন। গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে দৃষ্ট হইল যে বৌদ্ধদিগের মধ্যে এরূপ গ্রন্থ আর-কখনো রচিত হয় নাই। ন্যক্ক নিজেই বলিয়াছেন, আচার্য গোপ দত্ত প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ যে-সকল অবদানমালা রচনা করিয়াছেন তাহার কোথাও পদ্য কোথাও গদ্য। গদ্য পদ্য লিখিবার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, যেখানে গদ্যে লেখা উচিত, হয় তো সে স্থলে পদ্যে লেখা হইয়াছে, আর যেখানে পদ্যে লেখা উচিত সেখানে গদ্যে লেখা হইয়াছে। অবদানগুলি সাজাইবার কিছুমাত্র নিয়ম নাই, যে অবদানের পর যে অবদান লিখিত হইলে সুন্দর হইত সেটি হয়তো দূরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সকল অবদানই এক প্রণালীতে রচিত হওয়ায় অধিকক্ষণ সে গ্রন্থ পাঠ করিতে বিরক্তি বোধ হয়। ভাব স্থানে স্থানে এত গভীর যে বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ অবগত না থাকিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। ভাষা রচনা প্রণালী অত্যন্ত কর্কশ এবং বর্ণনা অত্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং পুনরুক্তি দোষে একান্ত দূষিত। এইসকল গ্রন্থের পরিবর্তে যখন সোমেন্দ্রের গ্রন্থ প্রচলিত হইল তখন বোধ হইল বৌদ্ধ সাহিত্য গগনে সমুজ্জ্বল কিরণাবলী মণ্ডিত সূর্যদেবের আবির্ভাব হইল। এই অভিনব গ্রন্থের ভাষা এরূপ সরল ও প্রাঞ্জল যে গ্রন্থকার ও পাঠকের মধ্যে ভাষা রূপ একটি ব্যবধান আছে এরূপ অনুভবই হয় না। উহার ছন্দ পাঠ কালে কখনো বা কালিদাসের ছন্দ পাঠ করিতেছি, কখনো বা বাল্মীকির ছন্দ পাঠ করিতেছি, কখনো বা ভবভূতির ছন্দ পাঠ করিতেছি বলিয়া বোধ হয়। ইহার শ্রুতিমধুর ছন্দ পাঠে হৃদয় আর্দ্র হইয়া মধুরতর ধর্মবীজ ধারণার্থ প্রকৃষ্ট উর্বর ভূমি রূপে পরিণত হয়। অবদানগুলি এরূপ সুন্দর রূপে সজ্জিত হইয়াছে যে, প্রথমটি পাঠ করিলে দ্বিতীয়টি পাঠ করিতে ইচ্ছা হয়, দ্বিতীয়টি পাঠ করিলে তৃতীয়টি পাঠ না করিয়া থাকা যায় না, এইরূপে সমগ্র গ্রন্থ বার বার পাঠ করিলেও তৃপ্তি লাভ হয় না। যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পরম সৌগত মণ্ডলী মধ্যে ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত 'অবদানকল্পলতা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মন ভগবান বুদ্ধের প্রেমে আপ্লুত ও নির্বাণ লাভ লালসায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

অল্পদিন মধ্যেই গ্রন্থ চারিদিকে প্রচারিত হইল। হিন্দুস্থানের প্রত্যেক মঠেই উহা লিখিত হইল। ক্রমে তিব্বত প্রভৃতি দেশেও 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র প্রচার হইল। তিব্বতীয় ভাষায় উহা অনুবাদিত হইল।* তিব্বত হইতে উহা দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল।

কিন্তু যে গ্রন্থ প্রণয়ন কালে ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যে গ্রন্থ প্রণয়নের

* লাসা নগরীর মহামান্য শাক্য ভদ্রের আজ্ঞায় পণ্ডিত লক্ষ্মীকর ও লামা শোঙ তোন্ দরজে শান্তি সংঘ নামক বিহারে ১২৭৯ খৃঃ অব্দে ইহার অনুবাদ করেন।

জন্য হিন্দু বৌদ্ধে, ধনী দরিদ্রে, গৃহস্থ ভিক্ষুকে মিলিত হইয়াছিল; যে গ্রন্থের উৎসাহ দাতা কবি. শিক্ষাদাতা এমন-কি প্রথম লেখকের নাম পর্যন্ত বৌদ্ধগণ ভক্তি সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; যাহা এশিয়ার সমস্ত মধ্য অংশে আমাদের 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র ন্যায় নিত্য অধীত ও গীত হইয়া থাকে, ভারতবর্ষবাসী কেহই তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত অবগত ছিলেন না। এ স্থলে বলা যাইতে পারে বৌদ্ধদিগের কোন্ গ্রন্থই বা ভারতবর্ষের লোক জানিত যে 'অবদানকল্পলতা'র নাম না জানায় তাহাদিগকে দোষ দিতে হইবে?

ভারতবর্ষের সকল লোক জানিত না সত্য কিন্তু হিমানীবেষ্টিতশিখরাবলী পরিবৃত নেপাল রাজ্যে অনেকেই বৌদ্ধ এবং তাহারা গ্রন্থাবলীর আদর জানুক আর নাই জানুক বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিকে তাহারা বিশেষ যত্নপূর্বক রক্ষা করিয়াছিল সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সংবাদ প্রচার করিবার জন্যই যেন নেপাল দেশীয় বৌদ্ধ মঠগুলি বহু-শতাব্দী ধরিয়া আপন বক্ষঃ স্থলে জরাজীর্ণ তালপত্র লিখিত গ্রন্থগুলি ধারণ করিয়া রাখিযাছিল। যেন উপযুক্ত লোকের অভাবে তাহারা এই রত্নগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরে সত্য প্রচারাভিলাষী ইংরাজ মনীষীগণ প্রার্থনা করিবামাত্র সমস্ত গ্রন্থ তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। নেপাল রেসিডেন্ট শ্রীমান্ হজ্‌সন সাহেব ভারতের এই নিভৃত কোণে অপ্রচলিতধর্মের অপ্রচলিত বহু-সংখ্যক গ্রন্থাবলী দর্শন করিয়া আশ্চর্য হইলেন এবং প্রাণপণে সেইগুলি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পর শ্রীমান্ রাইট [Daniel Wrights] সাহেবও সেই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। যদি এই দুই মহাপুরুষ গ্রন্থ সংগ্রহে ব্রতী না হইতেন তাহা হইলে অনেক গ্রন্থ একেবারে লোপ প্রাপ্ত হইত। একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। যখন শ্রীমান্ রাইট সাহেব নেপালে অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন একটি মন্দিরের পুনর্নির্মাণ আবশ্যক হয়। নেপালে এখন হিন্দু রাজা। তিনি সেই মন্দির মধ্যে যে-সকল বৌদ্ধ পুস্তক পাইলেন তাহা একেবারে ফেলাইয়া দিলেন। রাইট সেইগুলি সংগ্রহ করিলেন। শ্রীমান্ বেন্ডল [Cecil Bendall] সাহেবের পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উহার মধ্যে একখানি গ্রন্থ খৃ.পূ. ৮৫৯ সালে লিখিত হইয়াছিল এবং উহা 'পরমেশ্বরতন্ত্র' নামক বৌদ্ধদিগের একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ। এমন মহামূল্য গ্রন্থ ভারতবাসীর মূর্খতা প্রযুক্ত নষ্ট হইতেছিল, কেবল একজন ইংরাজ রাজপুরুষের চেষ্টায় রক্ষিত হইল।

হজ্‌সন ও রাইট অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেক পুস্তক লেখাইয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও ক্ষেমেন্দ্রকৃত 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' পাওয়া গেল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হজ্‌সন সাহেব যেখানি পাইলেন তাহা ৫১ পল্লব হইতে আরম্ভ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। নেপালাধিপতি অনন্ত মল্লদেবের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ১৩০২ শতাব্দীতে মঞ্জুভদ্র সুধী কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। যখন লেখা হইয়াছিল তখন

গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে উহার ১৭৪ পৃষ্ঠা কোথায় গিয়াছে তাহার এ পর্যন্ত ঠিকানা হয় নাই। সে পুথিখানি ১৭৫ পৃষ্ঠা হইতে এবং একচল্লিশ পল্লবের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ। পূর্বে যে দুখানি পুথির উল্লেখ করা হইয়াছে পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে সে দুখানি সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে এই পুথিখানিরই নকল। একখানির শেষে লিখিত আছে, "এতৎ ক্ষেমেন্দ্র কৃত অবদান শতক গ্রন্থস্য পরার্ধমেবায়ং পূর্বের্বার্দ্ধং কুত্রচিৎ ন প্রাপ্তং শুভম্"।

এতদ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণীকৃত হইল যে ক্ষেমেন্দ্রকৃত অপূর্ব গ্রন্থের পূর্বার্ধ নেপালদেশেও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজগণ বিশেষ যত্নপুরঃসর সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, ক্যাম্বোডিয়া, চীন, জাপান, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশে যত বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার তালিকা প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু কোথায় 'অবদানকল্পলতা'র পূর্বার্ধের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাহা ইংরাজগণ পারেন নাই, যাহা ফরাসিগণ পারেন নাই, যাহা উদ্যমশীল জার্মান জাতিতে পারেন নাই, একজন বাঙালির যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে সেই কর্ম সমাহিত হইয়াছে।

বাবু শরৎচন্দ্র দাস তিব্বত ভ্রমণকালে ডালর লামার রাজধানী লাসানগর হইতে বহু সংখ্যক তিব্বত অক্ষরে লিখিত কাষ্ঠযন্ত্র মুদ্রিত সংস্কৃত ও তিব্বত ভাষায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। লাসা নগরে অবস্থিতিকালে তিনি দেখিয়াছিলেন, আমাদের দেশে যেমন 'রামায়ণ', 'মহাভারত', প্রতিগৃহে পঠিত, গীত ও সর্বত্র অভিনীত হয়, তিব্বত দেশে সেইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রতিগৃহে পঠিত, গীত ও অভিনীত হইয়া থাকে। আমরা যেমন প্রতিকথায় 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র দোহাই দিয়া চলি, তিব্বতবাসীরাও সেই উক্ত গ্রন্থের দোহাই দিয়া থাকে। গ্রন্থখানির নাম 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা', গ্রন্থকারের নাম ক্ষেমেন্দ্র। এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। তিনি শুনিতে পাইলেন ডালক নামক মুদ্রা যন্ত্রে খোদিত কাষ্ঠখন্ড সমূহে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছিল। *এবং কাষ্ঠখন্ড সকল অদ্যাপি তথায় বর্তমান আছে। তখন তিনি অনেক যত্ন সহকারে কাষ্ঠযন্ত্রে মুদ্রিত একখানি তিব্বত অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত ও তিব্বত ভাষায় উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন।

গত বৎসর তিনি যখন কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যমহোদয়গণকে তিব্বতীয় ভাষার অনুবাদ সহিত উক্ত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিতে অনুরোধ করেন। সভ্যগণ সংস্কৃতভাষার সাহায্যে তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ হইবে দেখিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হইলেন। যাঁহাদের গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ

* ডালর লামা সুমতি বাগীশ্বর ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে এই পুস্তক ও ইহার অনুবাদ কাষ্ঠযন্ত্রে মুদ্রিত করেন। পোতাল নামক রাজপ্রাসাদে এই কাষ্ঠযন্ত্র সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে। দুই শত বৎসর অতীত হইয়াছে তথাপি উহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই।

করিবার ভার আছে প্রবন্ধ লেখক তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' নাম শুনিয়াই শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দাসকে উক্ত গ্রন্থের প্রথম ভাগ পাওয়া গিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবু শরচ্চন্দ্র দাস রোমান অক্ষরে লিখিত সমগ্র পুস্তক পাঠাইয়া দিলেন। পরীক্ষায় দৃষ্ট হইল গ্রন্থের যে অংশ ১৩০২ খৃষ্টাব্দের পর বিলুপ্ত হইয়াছে, যে অংশ এ পর্যন্ত অনেক অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সেই প্রথমাবধি উক্ত পঞ্চাশ পল্লব শরৎবাবুর গ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সন্দেহ ঘুচিল না। সোমেন্দ্র পিতৃকৃত গ্রন্থের শেষ ভাগে যে পদ্যময় সূচিপত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সহিত পল্লবগুলি মিলাইয়া দেখিলেন সমস্তই মিলিয়া গেল। তখন প্রবন্ধ লেখক সোসাইটির সভ্যমহোদয়গণকে এই বহুকাল বিলুপ্ত গ্রন্থের পুনরুদ্ধার সংবাদ প্রদান করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু দাসের উপর তাঁহাদের সকলেরই শ্রদ্ধা বর্ধিত হইল। ভারতের একখানি লুপ্ত রত্নের উদ্ধার হইল।

'বিভা', আষাঢ়, ১২৯৪

বৌদ্ধ-ঘন্ট ও তাম্রমুকুট

আপনারা জানেন যে, নেপালে অর্ধেক হিন্দু ও অর্ধেক বৌদ্ধ। বৌদ্ধেরা কিন্তু অহিন্দু বলিলে বড়োই চটিয়া যায়। তাহারা বলে আমরাও হিন্দু, কিন্তু বোধমার্গী; নেপালেব অন্য লোকেরা হিন্দু, কিন্তু তাহারা শিবমার্গী। সুতরাং বৌদ্ধদিগকে হিন্দু হইতে খারিজ করিবার উপায় নাই।

বৌদ্ধদের মধ্যে তিনটি ভাগ আছে। প্রথম ও সর্বোৎকৃষ্ট ভাগের নাম বান্‌রা। ইহারাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহাদেরই মধ্যে ধর্মযাজক ও পুরোহিত। দ্বিতীয় দল উদাসী, ব্যবসা করে। ইহারাও খাঁটি বৌদ্ধ। তৃতীয় দলে ২৪ জাতি আছে; তাহারা বলে বৌদ্ধ, কিন্তু ব্রাহ্মণ দিয়াও অনেক কর্ম করায় ও হিন্দুদের দেবদেবীরও পূজা করে।

বান্‌রারা নয় জাতি। ইহারা বিহারে বাস করে। কোনো বিহারেই আর এখন অবিবাহিত বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখা যায় না। শুনিয়াছি, শেষ অবিবাহিত ভিক্ষু প্রায় আশি বৎসর হইল মরিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বিহারগুলি এখন বান্‌রাদের বাড়ি। এক বিহারে অনেক লোক হইলে তাহারা শাখা-বিহার তৈয়ারি করে, কিন্তু মূল বিহারেই তাহাদের ক্রিয়াকর্ম হয়। নয় জাতি বান্‌রার মধ্যে সাত জাতি ধর্মকর্ম করে না, সেকরার কাজ করে, নকাশির কাজ করে, টাকশালে কাজ করে, বন্দুকের নলি তৈয়ারি করে, ছুতারের কাজ করে ও কাঠের উপরে নকশা করে। অপর দুই জাতির মধ্যে একটির নাম ভিক্ষু ও অপরের নাম গুভাজু। ভিক্ষুরা ধর্মকর্মের যে-সকল কাজ হাতে করিতে হয়, তাহাই করে; তাহারা ঠাকুর ছুঁইতে পারে, ঠাকুরের বেশ করায়, ঠাকুরকে এক ঠাঁই হইতে অন্য ঠাঁই লইয়া যায় ও ধর্মকর্মে গুভাজুদের সহায়তা করে। কিন্তু তাহারা

পূজা করিতে পারে না, মন্ত্রপাঠ করিতে পারে না, হোমও করিতে পারে না। অনেক ভিক্ষু অন্য কাজও করিয়া থাকে। গুভাজুরাই পূজা-পাঠ করে, হোম করে, অল্পবিস্তর লেখাপড়া শিখে, দুই-একজন ভালো পণ্ডিতও হয়। কিন্তু বান্‌রারা সবই একজাতি; পরস্পর আহার-ব্যবহারও আছে, বিবাহও আছে। অন্য জাতির ভাত খাইলে ও অন্য জাতিতে বিবাহ করিলে বান্‌রাদিগের জাতি যায়।

বান্‌রাদিগের দীক্ষা আছে। পাঁচ বৎসর বয়সে মা ছেলেটিকে কোলে করিয়া মূল বিহারের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বান্‌রার নিকট লইয়া যায়, তাঁহার উপাধি স্থবির। মায়ের শিক্ষামতো ছেলে বলে—"আমি নির্মল শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি ভিক্ষু হইব; আপনি আমাকে দীক্ষা দিন।" স্থবির বলেন, "তুমি অতি ছেলেমানুষ, তুমি সেরূপ কঠোর করিতে পারিবে না। দীক্ষা লইলে তুমি মাছমাংস খাইতে পারিবে না, মদ খাইতে পারিবে না, তোমায় একবারমাত্র হবিষ্যি করিয়া থাকিতে হইবে, তুমি পারিবে কি?" ছেলে বলিবে, "পারিব বৈকি! এ-বংশে জন্মিয়া যদি বংশের ক্রিয়া করিতে না পারিলাম তবে কেনই জন্মিলাম।" এই কথা বলিলে পর ভিক্ষু একখানি রূপার খুর বাহির করিয়া তাহার মস্তকটি সম্পূর্ণরূপে মুড়াইয়া দেয়, টিকিটি পর্যন্ত রাখা হয় না। তাহাদিগকে রীতিমতো ভিক্ষুর দীক্ষা দেওয়া হয়। সে হবিষ্যান্ন করে, স্থবিরের নিকট থাকে, বাড়ি যায় না, বুদ্ধ-ভগবানের নাম করে। পাঁচ-সাত দিন এইরূপে গেলে, সে একদিন কাঁদিয়া বৃদ্ধ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয় ও বলে, "এত কঠোর আমি জানিতাম না, আমি এত কঠোর করিতে পারিব না, আমাকে আবার সংসারে যাইতে দাও।" তখন স্থবির তাহার মুখে এক ভাঁড় মদ ও একটু শূকরের মাংস দিয়া তাহার মায়ের নিকট পাঠাইয়া দেয়। সকল বান্‌রাকেই এই দীক্ষা লইতে হয়। এই তাহাদের প্রথম দীক্ষা। আগে এই দীক্ষা যাবজ্জীবনের জন্য ছিল, এখন একটি সংস্কারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু যে-সকল গুভাজু রীতিমতো ধর্মযাজক হইতে চান, তাঁহাদিগকে আর-একবার দীক্ষা লইতে হয়। এই দীক্ষা ১৭/১৮ বৎসরে হইয়া থাকে। নিয়মেই হউক, আর অনিয়মেই হউক, সন্তান হইলে এই দীক্ষা আর দেওয়া হয় না। দীক্ষার পূর্বে সন্তান হইলে, গুভাজু পতিত হয় ও ভিক্ষু হইয়া যায়। সে অথবা তাহার বংশের অপর কেহই আর-কখনো গুভাজু হইতে পারে না। এইজন্য প্রায়ই বিবাহের পূর্বে দীক্ষা দেওয়া হয়। এই দীক্ষায় পাঁচটা অভিষেকের দরকার হয়; প্রথম বা মুকুটাভিষেক, দ্বিতীয় বজ্রাভিষেক, তৃতীয় পুস্তকাভিষেক বা মন্ত্রাভিষেক, চতুর্থ ঘণ্টাভিষেক ও পঞ্চম সুরাভিষেক। পঞ্চ অভিষেকের পর, যে গুভাজুর এই পাঁচ জিনিস ব্যবহার করিবার অধিকার হয়, তাহাকে বজ্রাচার্য বলে। এই দীক্ষা হইয়া গেলে, গুভাজু ধর্মযাজকের কাজ করিতে পারে, অন্য কাজও করিতে পারে। কিন্তু দীক্ষা চাই, নহিলে সে আর

গুভাজু মধ্যে গণ্য হইবে না।

মুকুটাভিষেকের অর্থ, মাথায় মুকুট পরিবার অধিকার। মুকুটটি তামার, উহাতে অতি পাতলা সোনার পাত লাগানো থাকে। মুকুটে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি আছে ও মুকুটের মাথায় একটি বজ্রের অর্ধেক আছে। পূর্বে বোধ হয়, টুপি ও মুকুট স্বতন্ত্র ছিল। এখন দুই-ই তামার। তামার টুপির পিছনে ঠিক যেন একটি দড়ির ফাঁস দিয়া বাঁধা আছে। যে মুকুটটি প্রদর্শন করা যাইতেছে, উহা নেপালি দশ শত উনিশ সালে তৈয়ারি ও ব্যবহার হইয়াছিল, অর্থাৎ ১৫/১৬ বৎসর পূর্বে।

বজ্রাভিষেক অর্থাৎ হাতে বজ্র ধরিবার অধিকার। বৌদ্ধ-বজ্র সকলেই দেখিয়াছেন; উহা আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

পুস্তকাভিষেক বা মন্ত্রাভিষেক অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ পড়িবার ও মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার।

ঘন্টাভিষেক অর্থাৎ বজ্রঘন্টা ধারণের অধিকার। সম্মুখে যে ঘন্টাটি রহিয়াছে, তাহার মাথায় অর্ধবজ্র ও গায়ে যে কত বজ্র রহিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই।

সুরাভিষেক। বজ্রাচার্যেরা বলেন, এই অভিষেক আগুনে ঘৃত দিবার অধিকার হয়। কিন্তু তাহা হইলে ইহার নাম সুরাভিষেক হইল কেন? ইহার উত্তর তাঁহারা দিতে পারেন না।

বজ্রাচার্যেরা এই পঞ্চালংকারে ভূষিত হইয়া মন্দিরে পূজা-পাঠ করেন, বিবাহাদির সময় পৌরোহিত্য করেন এবং উৎসবাদিতে নেতৃত্ব করেন।

'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩১৭

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ

অবতারণা।।

অশোক রাজার সময়ে—মৌর্যবংশের অধিকার কালে—মগধ সম্রাজ্যের উন্নতির মুখে—খৃস্টীয় শক আরম্ভ হইবার ২/৩ শত বৎসর পূর্বে, যখন সভ্য ভারতের অধিকাংশ লোকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়—যখন বুদ্ধদেবের নাম বিশ্বামিত্র, বাদরায়ণ প্রভৃতি বেদপ্রবর্তক ঋষিদিগের নাম ঢাকিয়া ফেলে—যখন ব্রাহ্মণগণও আমাদের সর্বনাশ হইল মনে করিয়া বৌদ্ধধর্মের নব অভ্যুদয় দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হন, তখন কে ভাবিয়াছিল যে, ঐ অল্প-সংখ্যক হীনবল, বীর্যহীন, বিচার-পরাজিত ব্রাহ্মণগণই আবার ভারতবর্ষের একাধিপতি হইবেন—আবার তাঁহাদ্দিগেরই গৌরবে ভারত গৌরবান্বিত হইবে বোধ হয় কেহই এরূপ প্রত্যাশা করেন নাই; সকলেই ভাবিয়াছিলেন আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরেই হউক ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগের পদানত হইবেন। কিন্তু তাহা হইবার

নহে। বিচ্ছিন্ন ক্ষমতাশূন্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটি শক্তি ছিল। যে শক্তি থাকিলে কিছুতেই লোকের মার নাই সেই শক্তি ছিল। যে শক্তি বলে ইহুদিরা আজিও ইহুদি আছে—গৈবিরেরা আজিও গৈবির আছে—সেই শক্তি ছিল। যদি পৌরাণিক ধর্মের উৎপত্তি না হইত, যদি চীনের ন্যায় সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধ হইত, তথাপি ব্রাহ্মণ নাম বিলুপ্ত হইত না। সে শক্তিটি স্বশ্রেণীহিতৈষিতা। এখন যেমন লোকের স্বদেশহিতৈষিতা (patriotism) বলিয়া একটি শক্তি জন্মিতেছে—তেমনি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তৎকালে স্বশ্রেণীর অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতির (সমস্ত দেশের বা লোকের নয়) ঐক্য এবং ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য একটি প্রবৃত্তি ছিল। স্বীয় ধর্মে অটল বিশ্বাস, উচ্চতর জ্ঞানজনিত অভিমান, আমার জ্ঞান আছে এই অহংকার, ব্রাহ্মণমাত্রেরই চিরকালই আছে। এই কয়টি শক্তি ছিল বলিয়াই তাঁহারা অনেকবার অনেক বিপদে রক্ষা পাইয়াছেন। এই শক্তি ছিল বলিয়াই দুর্দমনীয় মুসলমানের অসির আঘাতেও পারস্যের ন্যায় ভারতসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হয় নাই। এক্ষণে আমরা যে প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিতেছি তাহাতে বৌদ্ধের সহিত সংগ্রামে বহু-শতাব্দী পরে ব্রাহ্মণ কী উপায়ে জয়লাভ করিয়াছেন তাহাই দেখানো যাইবে।

ধর্ম প্রচারার্থ বৌদ্ধদিগের অবলম্বিত উপায়াবলী।।

আমাদের গৌরবের প্রথম সময়ে—গভীর চিন্তাশীল লোকদিগের সময়ে—যখন উচ্চদরের দার্শনিক মত-সকল চারিদিকে প্রচারিত হইতেছিল, সেই সময়ে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি। বুদ্ধদেবের অমানুষশক্তি, নিঃস্বার্থ প্রাণীহিতৈষিতা প্রভৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অনেকে তাঁহার অনুগামী হয়—তৎকালীন সামাজিক অবস্থাও উহাদের উন্নতির কারণ হয়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লোকগণ প্রধানত তিন দলে বিভক্ত ছিল। একদল মঠে থাকিত উঞ্ছবৃত্তি ও ভিক্ষাদ্বারা উদরপূর্তি করিত—এবং বুদ্ধত্ব লাভের জন্য ধ্যান-ধারণায় রত থাকিত। ইহাদিগেরই জ্ঞানের উন্নতি অবনতিক্রমে ভিক্ষু, অর্হৎ, বোধিসত্ত্ব নাম হইত। উচ্চ বিষয়ের মতামত আলোচনা মঠেই হইত, কোনো মত বিষয়ে সন্দেহ হইলে এইখান হইতেই তাহার মীমাংসা হইত। বড়ো বড়ো রাজারা ধর্মমত মীমাংসা করিবার জন্য এই ভিক্ষুদের লইয়া সভা করিতেন। দ্বিতীয় দল বিষয়ী লোকদিগকে ধর্মশিক্ষা দিত। তাহারা কোনো প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম, নীতি, বিনয় প্রভৃতি শিক্ষা দিত। ইহাদিগের নাম শ্রাবক। একজন শ্রাবক* শব্দের অর্থ করিয়াছেন যাহারা শুনে; কিন্তু বাস্তবিক শ্রু ধাতু ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া শ্রাবক পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহারা শুনে তাহাদিগকে শ্রোতা বলে ও যাহারা শুনায় তাহারাই শ্রাবক। এই শ্রাবকেরাও বিবাহাদি

---

* কনিংহাম [Alexander Cunningham] যেরূপ বলেন যদি শ্রাবকেরা সেইরূপই ছিল, যদি তাহারা কেবল শ্রোতা অর্থাৎ বুদ্ধদিগের সর্বনিম্ন শ্রেণীর লোক ছিল এবং তাহারাই মংক যদি বা বোহন্ত হইল, তবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সকলেই কি মোহন্ত ছিল? তবে অশোক রাজা বৌদ্ধ হইলেন কিরূপে?

করিত না। তৃতীয় দল বিষয়ী লোক। ইহারা পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। বৌদ্ধদিগের ইচ্ছা নয় যে, কেহ বিষয়কর্ম করে। তাহাদের চেষ্টা এই যে, লোকে চিন্তা করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য, নির্বাণের জন্য চেষ্টা করুক— কিন্তু তাহা হইলে জগৎ চলে না। অতএব কতক লোক সংসার লইয়া থাকুক, তাহারা শুনিয়া যেটুকু ধর্মশিক্ষা করিতে পারে করুক, এই পর্যন্ত; সুতরাং তাহারা ইতর সাধারণের ধর্ম শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিত এবং সে চেষ্টায় অনেক লোককে আয়ত্ত করিয়াছিল। দেখ উহাদের একদল প্রচারক ছিল, একদল প্রচারকদিগের উপর তত্ত্বাবধারণ করিতে থাকিত; ধর্মোন্নতির জন্য এই দুই দলই একান্ত উদ্যোগী, ইহাতেও শীঘ্র শীঘ্র ধর্মপ্রচার হইয়া পড়িল। বৌদ্ধেরা স্ত্রীলোকদিগকেও ধর্মপ্রচার করিতে দিত এবং উহাদিগকেও মঠের মধ্যে স্থান দিত। যে ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের বিবাদ তাহারা বৈদিক ক্রিয়াসক্ত; স্ত্রী ও শূদ্র, ধর্মশাস্ত্র ও বৈদিক ক্রিয়াতে একেবারে বঞ্চিত। বৈশ্যগণও বড়ো একটা যাগযজ্ঞাদিতে থাকিতে পারিত না। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম এক প্রকার বন্ধ বলিলেই হইল।

ব্রাহ্মণদিগের উপায়॥

এখন নিয়ম এই যে, ইতর সাধারণ লোকে যে ধর্ম অবলম্বন করিবে সেই ধর্মেরই গর্ব অধিক। একে বৌদ্ধধর্ম রাজার ধর্ম, তাহাতে ধর্মপ্রচার জন্য লোক নিযুক্ত, তাহার উপর আবার বৌদ্ধগণ যে কেবল ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক এমন নহে—যে কোনো জাতীয় লোককেই উন্নত পদ প্রদানেও কাতর নহে *সুতরাং অনেক লোক ঐ ধর্মে আসিয়া পড়িল। হিন্দুস্থানের পশ্চিমাংশেই ব্রাহ্মণদিগের প্রধান স্থান, ব্রাহ্মণগণ এখন আপনাদিগের ভ্রম দেখিতে পাইলেন; তাঁহারাও সাধারণ লোকদিগকে আপনার দলে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; যেখানে বৌদ্ধদিগের ক্ষমতা প্রবল হয় নাই—সেইখানে যাইয়াই তাহাদিগকে স্মৃতি উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন; অনার্যদিগের দেবতা আপন দেবতা বলিয়া গ্রহণ করত দলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পূর্বে দেবতা উপাসনা বলিলে প্রায়ই পৌত্তলিকতা বুঝাইত না। জৈমিনী বেদব্যাখ্যার মীমাংসায় লিখেন তাঁহার মতে দেবতা বলিয়া কোনো জীব পদার্থ নাই কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনকার ব্রাহ্মণেরা কার্য গতিকে সাকার উপাসক হইলেন, তাঁহাদের মত হইল "সাধকানাংহিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা"। সাধকেরা নিরাকার ব্রহ্ম বুঝিতে পারে না অতএব ঈশ্বরের রূপকল্পনা আবশ্যক।

---

*বুদ্ধদেবের প্রধান শিক্ষা [শিষ্য] মণ্ডলী মধ্যে রাহুল ক্ষত্রিয় ছিলেন, কশ্যপ ব্রাহ্মণ, কাত্যায়ন বৈশ্য ও উপালি শূদ্র ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সম্প্রদায় প্রবর্তক, সকলেই বুদ্ধদেবের নিজ শিষ্য। উপালি যদিও শূদ্র তথাপি বুদ্ধদেবের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। যখন বুদ্ধদিগের প্রথম ধর্মসভা হয়, বুদ্ধ উপালির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিয়াছিলেন উপালিই বিনয়ধর্ম প্রচাবের প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র। বিনয়ধর্ম সাধারণ লোকদিগের জন্য। বুদ্ধদেব বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন শূদ্রদিগের দ্বারাই তাঁহার মত সাদরে গৃহীত হইবে এবং তাহার জন্য একজন শূদ্রই বিশেষ উপযুক্ত। উপালি ধর্মভ্রাতা কশ্যপের সমস্ত প্রশ্নে সম্যক উত্তর করিয়াছিলেন।

অন্ত্যজ বর্ণ।।

অনার্যগণ যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, প্রাচীন স্মৃতিতে আমরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিমাত্র বর্ণের উল্লেখ পাই—কিন্তু অনেক পুরাণ এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে বর্ণ পাঁচটি— এই শেষ বর্ণের নাম অন্ত্যজ বা নিষাদ। মাধবাচার্য ঋগ্বেদের টীকায় উহাদের নিষাদ নাম দিয়াছেন; অন্যান্য পুরাণে নিষাদ ও অন্ত্যজ শব্দ এক পর্যায়ক রূপে ব্যবহৃত। আমরাও আধুনিক সমাজে দেখিতে পাই একদল শূদ্রের জল ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করেন আর একদল করেন না। যাহাদের জল ব্যবহার করা যায় তাহারা সৎশূদ্র, যাহাদের করা যায় না তাহারা অন্ত্যজ। আহিরি গোয়ালা সৎশূদ্র, দেশী গোয়ালা অন্ত্যজ। চাষার মধ্যে সদগোপ সৎশূদ্র, কৈবর্ত অন্ত্যজ, দুলে প্রভৃতি ছোটোলোকও এই অন্ত্যজ দলের মধ্যে।

জাত্যভিমান।।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ব্রাহ্মণেরা এত ঘৃণা করিলেও এই-সকল জাতি ব্রাহ্মণ্যধর্মে রহিল কেন? তাহার এক কারণ এই ব্রাহ্মণ্যধর্মে আসিবামাত্র উহাদের একটু জাত্যভিমান জন্মে, একজন দুলেকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম সেও বলিল, মুচি মুসলমান হইতে দুলে উৎকৃষ্ট জাতি; মুচি চাম কাটে, মুসলমানের ব্রাহ্মণ নাই। ব্রাহ্মণদিগের সংশ্রবে উহাদের এই জাত্যভিমানটুকু জন্মিয়াছে।

কোথায় অনার্যদীক্ষা আরম্ভ হয়।।

অনার্যদিগের প্রথম দীক্ষা দক্ষিণ রাজবারায় হয়। দক্ষিণ রাজবারায় নিষধ বলিয়া একটি রাজত্ব ছিল। নূতন যে পঞ্চম বর্ণ পুবাণে উল্লিখিত আছে সে পঞ্চম বর্ণের নাম নিষাদ (নিষাদ ও নিষধ একই শব্দ) তাহাতে বোধ হয় প্রথম অনার্য প্রবেশ এখানেই ঘটে। দক্ষিণ রাজবারায় হিন্দুদিগের প্রধান স্থান। শিব ও শক্তির উপাসনা ব্রাহ্মণেরা এই স্থান হইতেই প্রাপ্ত হন। কারণ এখনো দেখা যায় শৈবদিগের একটি প্রধান দূর্গ রাজবারা। এইরূপে আপন ধর্মে পৌত্তলিকতা প্রবেশ করাইবামাত্র দল বাড়িয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণদিগের উৎসব।।

অশিক্ষিত লোকদিগের পক্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম যত সুবিধা বৌদ্ধ এত নহে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বারোটি সংস্কার আছে। একটি ছেলে হইলে গর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া ছেলের বিবাহ পর্যন্ত লোকে বারবার আমোদ করিতে পারিবে এবং ঐ বারোটি সংস্কারই তাহারা সমস্ত জীবনের মধ্যে সুখের দিন বলিয়া মনে করে। বৌদ্ধদিগের এরূপ ছিল কিনা সন্দেহ। শেষ বৌদ্ধদিগের মধ্যেও পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিয়াছিল কিন্তু সে এক বুদ্ধের

উপাসনা মাত্র—হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতা দেশভেদে ভিন্ন। যে দেশের লোক যে দেবতা চায় সে সেই দেবতা উপাসনা করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।। (গীতা, ৭.২১)

শিবভক্ত শিব উপাসনা করিল—বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণু উপাসনা করিল অথচ ব্রাহ্মণের সর্বত্র মান্য হইল। উপরি উক্ত প্রবন্ধে প্রমাণ হইবে ইতর লোককে স্বধর্মে আনয়ন করিবার জন্য বাহ্যিক যে-সকল আড়ম্বর আবশ্যক, তাহাতে বৌদ্ধ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য অধিক।

ভক্তিশাস্ত্র।।

মতামত সম্বন্ধেও সাধারণ লোক মোহিত করিবার পক্ষে হিন্দুদিগের প্রাধান্য ঘটিয়া উঠিল। বৈদিক সময়ে যাগযজ্ঞ স্বর্গলাভেব উপায় ছিল। বুদ্ধিবিপ্লবের সময় জ্ঞানই হয় সাযুজ্য, নয় সালোক্য, না-হয় নির্বাণ লাভের একমাত্র উপায় পরিগণিত হয়। এই সময়ে ভক্তিমার্গ ব্রাহ্মণেবা উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। শান্ডিল্যদেব বেদ উপনিষদাদিতে নিঃশ্রেয়স্লাভের উপায় না দেখিয়া এই ভক্তিমার্গ প্রচার করেন। এই ভক্তি এই সময়ে হিন্দুদিগের মূলমন্ত্র হয়। ভক্তি কাহাকে বলে শাল্ডিল্যের প্রথম সূত্র এই—

"সা পরানুরক্তিরীশ্ব . .।"

ঈশ্বরে অর্থাৎ যে কোনো দেবতায় পরম অনুরাগই ভক্তি—সকলের সার ভক্তি; মুক্তি তার দাসী। পুরাণ বরাবর এই দুই সুরে গাইয়াছেন, ভক্তি ও জ্ঞান। জ্ঞান শিক্ষিতদিগের জন্য, ভক্তি অশিক্ষিতের জন্য। ভক্তিতে সুদ্ধ যে অনার্যগণ মোহিত হন এমন নহে—ভক্তিতে অনেক খাঁটি বৌদ্ধও গলিয়া দেবোপাসক হইয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্র যে নাস্তিক্য নিবারণের প্রধান উপায়, তাহা সুদ্ধ যে আমরাই বলিতেছি এমন নহে, 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটককার তাঁহার আশ্চর্য রূপক গ্রন্থে চার্বাক, মহামোহ, বৌদ্ধ প্রভৃতি যে-সকল হিন্দুধর্মবিরোধী পাত্র প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহাদের কেবল ভয় যে, যোগিনী বিষ্ণুভক্তি তাহাদিগকে না তাড়াইতে পারে। ভক্তি গাঢ় হইয়া একবার মস্তকে প্রবেশ করিলে লোকের বুদ্ধিগুলি উচ্চতর সমালোচনায় কিরূপ অপারগ হয় তাহা আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং চার্বাক ও বৌদ্ধ যে উহাকে ভয় করিবে আশ্চর্য কী?

বেদিতে বসিয়া ধর্ম প্রচার।।

হিন্দুরা প্রচার কার্যও ছাড়েন নাই। বৌদ্ধেরা তাহাদের ধর্মশাস্ত্র প্রচার করিত। হিন্দুরা শেষ পুরাণ পাঠ আরম্ভ করিলেন। পুরাণে পাই যে নৈমিষারণ্য বা আর-কোনো স্থানে পরাশর বা অন্য কোনো ঋষি এই এই কথা বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে,

তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় হিন্দুরা পরাশরাদি বৈদিক ঋষির নাম করিয়া আপনারা পুরাণ প্রচারকার্যে রত হন।

বৌদ্ধদিগের ধর্মব্যাখ্যা অপেক্ষা হিন্দুদিগের পুরাণ পাঠের মোহিনী শক্তিও অবশ্য অধিক। বৌদ্ধেরা বলিলেন, দান করো—ব্রাহ্মণ বলিলেন, দান করিয়া বলি রাজার সর্বস্ব গেল। শেষ আত্মদেহ পর্যন্ত দান করিলেন। বৌদ্ধ বলিলেন, সত্য কথা কও—ব্রাহ্মণ বলিলেন, যুধিষ্ঠির একটি অর্ধ মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন, এই পাপে নরক দর্শনযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন।

এই পুরাণ প্রচার আরম্ভ হইয়া অবধি অশিক্ষিতগণকে হিন্দুমতে আকর্ষণ করিবার বিশেষ সুবিধা হইল।

ব্রাহ্মণ শ্রমণের কার্যদক্ষতা এবং অনুরাগ॥

উপরি উক্ত প্রবন্ধে বোধ হইল, সাকার উপাসনা, ভক্তিমার্গ উপদেশ ও পুরাণ প্রচার এই তিন উপায়েই ব্রাহ্মণেরা জয়ী হন। ইহার উপর আর-একটি কারণও ছিল। বৌদ্ধধর্ম চালাইবার লোক কাহারা? সংসারত্যাগী বিবাহাদিশূন্য ভিক্ষুগণ। প্রথম ধর্মের প্রচার সময়ে ভিক্ষুদিগের দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছিল। উহারা প্রাণপণে ধর্ম প্রচার চেষ্টায় রত ছিল। সংসারের সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল প্রাণপণে ধর্মের জন্য চেষ্টা করিত। কিন্তু সেই ধর্মার্থ উৎকট যত্ন কালসহকারে নষ্ট হইল। যখন ভিক্ষুগণ রাজা রাজপুরুষগণের উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন, যখন মঠের অতুল ঐশ্বর্য হইল, তখন আর ধর্মপ্রচার কে করে। নিয়মমতো কার্য করিয়াই ভিক্ষুরা ক্ষান্ত থাকিত। ওদিকে ব্রাহ্মণদিগের বড়ো সুবিধা—তাঁহাদের ধর্ম তাঁহাদের জীবনোপায়। একজন ব্রাহ্মণ যদি একটি গ্রাম হিন্দু করিল, সে গ্রাম পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে তাহার থাকিবে। সুতরাং একদিকে স্বার্থ সাধনার্থে উৎকট পরিশ্রম আর-দিকে সম্পূর্ণ উদাসীনতা, ইহার মধ্যে পড়িয়া বৌদ্ধধর্ম উৎসন্ন হইল। ব্রাহ্মণদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইল।

শ্রমণের হীনবল হইবার আর-একটি কারণ॥

ভারতবর্ষ যেরূপ দেশ ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বলবান, বৌদ্ধেরা যদি প্রাণপণে ভারতবর্ষ হইতে ব্রাহ্মণদিগকে এককালীন দূরীভূত করিয়া তাহার পর বিদেশে প্রচারক পাঠাইত, তাহা হইলে কী হইত বলা যায় না। কিন্তু তাহা না করিয়া, ঘরের শত্রু বিনাশ না করিয়া, যে-সকল লোক ধর্মবিষয়ে উৎকট শ্রম করিয়াছে ও করিতে পারে, এমন-সব লোক বাছিয়া বিদেশে পাঠাইত। প্রথম অবস্থায় তাহাতে ক্ষতি হয় নাই; যেহেতু নূতন দীক্ষিতদিগের মধ্যে সকলেই সমান উদ্যোগী। কিন্তু শেষ যাহারা কার্যক্ষম তাহারাই দেশ হইতে বাহির হইতে লাগিল; ব্রাহ্মণের সুবিধা হইল। এই-সকল প্রচারকেরা বিদেশে

বিলক্ষণ শ্রম করিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যেও অনেক অগস্টিন স্কোয়ার্টজ ডফ সাহেব ছিলেন। ইঁহারা বহু-সংখ্যক বৌদ্ধগ্রন্থ তত্তদ্দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। বীল সাহেবের চৈন পুস্তকের তালিকায় অনেক এদেশীয় লোক অনুবাদক ছিলেন দেখা যায়।

বৌদ্ধধর্ম নাশের অপর কারণ॥

বৌদ্ধধর্ম প্রচার যখন আরম্ভ হয় তখন যে উহারা সুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের সহিতই বিরোধ করিয়াছিল এমন নহে। প্রথম বিপ্লব সময়ে ব্রাহ্মণবিরোধী অথচ বৌদ্ধ-শত্রু আর-একদল লোক ছিল। তাহারা তৈর্থিকোপাসক। আমরা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে পূরণ নামক একজন তৈর্থিকের নাম দেখিতে পাই। প্রথম ইহারাও বৌদ্ধদিগের উন্নতিতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চুপ করিয়া থাকে। পরে যখন বৌদ্ধেরা বিধর্মী বলিয়া আপন দলের অনেক লোককে বৌদ্ধ সংঘ বা বৌদ্ধ সমাজ হইতে দূর করিয়া দিতে লাগিল, তখন তৈর্থিকোপাসকেরা উহাদের সঙ্গে মিলিতে লাগিল। বৌদ্ধদিগের দুর্বলতার আর-একটি কারণ হইল। বৌদ্ধগণ আর-এক দোষ করিতেন তাঁহারা দলাদলি বড়ো ভালোবাসিতেন। বুদ্ধদেব মরিবার ২০০ বৎসরের মধ্যে ১৮টা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল হয় শুনিতে পাই। ব্রাহ্মণের পক্ষে যত দল হউক না সবই উহাদের সহিত একতাসূত্রে বদ্ধ, হিন্দুধর্মের মধ্যে উচ্চতম অদ্বৈতবাদী হইতে জঘন্য লিঙ্গোপাসক পর্যন্ত এক রাজনৈতিকসূত্রে বদ্ধ আছে। বৌদ্ধধর্মে সেটি ছিল না। 'তুমি লবণ খাইবে আমি খাইব না' এই লইয়া উহাদের একবার বড়ো দলাদলি হয়। ইউরোপে আজিও ঠিক এইরূপ চলিতেছে। কাথলিকেরা পোপ মানিলেই আপনার লোক বলিয়া স্বীকার করেন। প্রটেস্টন্টেরা ফি-হাত ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে আপন চার্চ হইতে দূর করিয়া দিতেছেন। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, ইহাতে কাথলিকের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেছে। ব্রাহ্মণের ক্ষমতাও সেকালে ঠিক এইরূপে বাড়িয়াছিল।

ভারতবর্ষে বুদ্ধদিগের শেষদশা : অন্তর্জগতে॥

কনিংহাম বলেন সেকন্দর শাহের সময় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের তুল্য সম্মান ছিল। খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে দেখিতে পাই অযোধ্যায় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণে ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধ। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের পর শ্রমণের জয় হয়। ফা-হিয়নের সময় শুনিতে পাই, দুইই সমান; বৌদ্ধেরা যেন একটু অধিক বলবান। হিয়ানসাঙের সময় বিহারের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কী? কনিংহাম যাহা বলিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা তাহার এই কারণ নির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। পূর্বোক্ত কারণসমূহের বলে অনেক বৌদ্ধ সংসারী হিন্দু হইয়া গিয়াছেন, যাহাদের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বিহারের পোষণ হইত, সে-সকল লোক আর বিহারবাসীদিগকে ভিক্ষা দিতে সম্মত নহে। সুতরাং অনেক মঠ উঠিয়া গেল। ক্রমে যে-সকল বিহারের জমিদারি প্রভৃতি ছিল তাহাই রহিল,

অবশিষ্ট উঠিয়া গেল। এই-সকল বিহারে বৌদ্ধদিগের দার্শনিক মতের তর্ক বিতর্ক হইত এবং বিদ্যাবিষয়ে তাহাদের বিশেষ খ্যাতিও ছিল। শংকরাচার্য এইরূপ মঠবাসীদিগেরই সঙ্গে বিচার করিয়া অনেককে আত্মাবলম্বিত শুদ্ধাদ্বৈতমতে আনয়ন করেন। যেখানে বুদ্ধের প্রতিমূর্তি ছিল, সেইখানে শংকরাচার্যের শিষ্যেরা শুদ্ধাদ্বৈত মতানুযায়ী এক প্রকার পৌত্তলিক প্রতিমূর্তি স্থাপন করিলেন। যাহা বাকি ছিল ন্যায়শাস্ত্রের বহুল প্রচার সময়ে ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর বিচারকালে তাহারো ধ্বংস হইল। উদয়নাচার্যের 'আত্মতত্ত্ববিবেক'ই বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে লিখিত শেষ গ্রন্থ। কিন্তু বোধ হয় তখনো বৌদ্ধধর্ম নির্মূল হয় নাই। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়া'দি কাব্যগ্রন্থে উহার স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় ১৫ শতাব্দীতে যে নানা প্রকার নূতন নূতন ধর্মের উৎপত্তি হয় ঐ সময়ে উহার যা-কিছু বাকি ছিল, তাহার শেষ স্মৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়। তাহার পর প্রায় চারি শত বৎসর আমরা উহাদের নামও শুনিতে পাই নাই। এখন আবার বৌদ্ধদিগকে সমাদর করিতে শিখিয়াছি।

বাহ্যজগতে॥

অন্তর্জগতে বৌদ্ধদিগের যে আধিপত্য ছিল তাহার কথা উক্ত হইল। বাহ্য জগতে উহাদের আধিপত্য অনেক অগ্রেই উৎসন্ন গিয়াছিল। প্রথম প্রচার সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজারা বুদ্ধকে বিস্তর উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু আইন করিয়া প্রজাদিগের বুদ্ধের নিকট গমন বন্ধ করিয়াছিলেন। দেবদত্ত উঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘাতক-পুরুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন। শেষ দেখিতে পাই বৌদ্ধেরাই উৎপীড়ক, কনিংহামের এনসেন্ট ইন্ডিয়ার [*The Ancient Geography of India*, London 1871.] দেখি ৭ম শতাব্দীতে অনেক বৌদ্ধ রাজাই উৎপীড়ক; বৌদ্ধ কুচবেহার অঞ্চলে একজন ব্রাহ্মণ রাজা হইয়া হিন্দুদিগের উপর দারুণ অত্যাচার করিতেছে। বুন্দেলখণ্ডের নিকটও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাতেই তাদৃশ রাজাদিগের শেষ দশা যে সন্নিকট, বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। শংকরাচার্যের সময় একজনও বৌদ্ধ রাজার নাম নাই।

বৌদ্ধেরা এদেশে না থাকুক আমরা যদি প্রণিধান করিয়া দেখি তাহাদের ধর্ম তাহাদের আচার আমাদের নিত্য কর্মমধ্যে নিত্যই দেখিতে পাই।

'বঙ্গদর্শন', শ্রাবণ, ১২৮৪

বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম

বাংলা দেশের ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলায় দেখো যে বহু পূর্বকালে, এমন-কি আর্যগণের পঞ্জাবে আসিবার বহু পূর্বেও সভ্যজাতির বাস ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র ও সমুদ্রের

মধ্যবর্তী স্থানে অতি প্রাচীনকালে মানুষে হাতি পোষ মানাইয়াছে। 'রামায়ণে' বলো, 'মহাভারতে' বলো, বৌদ্ধ 'ত্রিপিটকে' বলো, 'জাতকে' বলো, জৈন 'অঙ্গ গ্রন্থে' বলো, সব জায়গায় পোষা হাতির কথা শুনা যায়। কিন্তু এই পোষমানানোটি বাংলা দেশের লোকেরই কাজ ছিল। যাহারা পোষ মানাইত তাহারা দীর্ঘকায়, কৃশ অথচ বলিষ্ঠ, এবং স্বর্ণবর্ণ ছিল। তাহারা ঝাঁকড়া চুল রাখিত, চামড়া পরিত এবং হাতির সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের উপর হইতে সমুদ্রের তীর পর্যন্ত গমনাগমন করিত। সে জাতি এখন কোথায় গেল বলিতে পারা যায় না। তবে তাহারা হাতি পোষ মানাইয়া পৃথিবীর একটা বড়ো উপকার করিয়া গিয়াছে।

'ঋগ্বেদে' বাংলা দেশের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু 'ঋগ্বেদে'র 'ঐতরেয় আরণ্যকে' তিনটি জাতির নাম পাওয়া যায়। এখানে জাতি শব্দের অর্থ ইংরাজিতে যাহাকে caste বলে তাহা নহে—কিন্তু ethnic race। একটির নাম বঙ্গ, একটির নাম বগধ এবং আর-একটির নাম চের। দ্রবিড় জাতির সাধারণ নাম চের। একথা কেহ কেহ অস্বীকার করিলেও চেররা দ্রবিড় জাতির যে একটা খুব বড়ো অংশ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ছোটোনাগপুরে অনেক অর্ধসভ্য জাতি আপনাদিগকে চেরদিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা বলিয়া থাকে, রোটাস্‌গড়ের নিকটবর্তী স্থান হইতে তাহারা ছোটোনাগপুরে আসিয়াছিল; কিন্তু কতকাল পূর্বে, সেকথা তাহারা বলিতে পারে না। কোনো কোনো anthropologist বলেন, বঙ্গ বা বং নামে এক দ্রবিড় জাতি বাংলা দেশে বাস করিত। বগধ জাতি এখনো বাংলা দেশে আছে। রাঢ়ের বাগদিরাই তাহাদের বংশধর। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, উহারা আপনাদের ভিতরে যে ভাষায় কথাবার্তা কয়—তাহা বাংলা নয়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রমুখ ভদ্রজাতিরা সে ভাষা কিছুই জানেন না। আবার অনেকে মনে করেন যে, মগধ ও বগধ একই জাতি, অথবা, এক জাতিরই দুই শাখা মাত্র। মগধের কথা কোনো কোনো বেদে শুনিতে পাওয়া যায়। তথায় বাস করিলে ব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হইত।

এতদ্ভিন্ন উত্তরবঙ্গে কিরাত, পৌণ্ড্র এবং কৈবর্ত এই তিনটি জাতি ছিল। বেদের আর্যগণ এই তিন জাতিকে দস্যু বলিয়া বর্ণনা করিতেন। অর্থাৎ তাহারা আর্যদিগের শত্রু ছিল। কিরাতেরা এখন দার্জিলিং ও কাঠমুণ্ডের মধ্যে পর্বতময় দেশে বাস করে। নেপালিরা তাহাদিগকে "কিরান্তি" বলে। মালদহের পুঁড়রা পৌণ্ড্রগণের বংশ। উহাদের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধন অতি প্রাচীনকাল হইতে উত্তরবঙ্গের একটি প্রধান নগর ছিল। কৈবর্তরা উত্তরবঙ্গে খুব প্রবল ছিল। বল্লালসেন কৈবর্তদিগকে ভাগ করিয়া এক দলকে উত্তরবঙ্গে রাখেন এবং আর-এক দলকে উড়িষ্যার প্রান্তদেশে বাস করান। এখনো ঐ দুই স্থলে কৈবর্তের সংখ্যা অধিক। সেন্‌সাস রিপোর্টে দেখা যায় বাংলায় যত জাতি (Caste) আছে তাহাদের মধ্যে কৈবর্তের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক।

বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের পূর্বেও বাংলায় এই-সকল জাতি বাস করিত। ইহারা কতক

পরিমাণে সভ্য হইয়াছিল; কারণ, জৈনদিগের প্রায় সকল তীর্থংকরই বাংলা দেশে বিশেষত রাঢ়ে বহুদিন বাস, তপস্যা ও সিদ্ধিলাভপূর্বক আপন আপন ধর্মের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জৈন যতিদিগের অনেক আচার ব্যবহার, বিশেষত তাহাদিগের পোশাক পরিচ্ছদ বাঙালিদিগের মতো। বৌদ্ধ যতিদিগেরও তাহাই।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম দুইটি সাংখ্য দর্শনের ফলে বাহির হইয়াছে। আবার, আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে, সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্তক কপিলের আশ্রম বাংলাতেই ছিল। খুলনা জেলায় এখনো কপিলমুনি বলিয়া একটি স্থান আছে। গঙ্গাসাগরের নিকট কপিলের অন্য একটি আশ্রমও আছে। বুদ্ধদেব যে প্রথম প্রথম সাংখ্যপণ্ডিতদিগেরই চেলা হইয়াছিলেন একথা অশ্বঘোষ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। কপিলের মতের উপর বুদ্ধদেব কোন্ কোন্ বিষয় নূতন প্রবর্তিত করিয়া নিজ মতের উন্নতি বিধান করিয়াছেন তাহাও অশ্বঘোষ দেখাইয়া গিয়াছেন। কপিল দ্বৈতবাদী ছিলেন, কিন্তু বৈদিক ঋষিরা সকলেই প্রায় অদ্বৈতবাদী। শংকরাচার্য সাংখ্যকে "অশিষ্ট" বলিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি মনে করিতেন উহা একটা বেদবহির্ভূত মত। তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, সাংখ্য নিরাকরণে আমার প্রয়োজন নাই। তবে যে যত্ন করিয়া আমি উহার নিরাকরণ করিতেছি তাহার কারণ, মনু প্রভৃতি কয়েকজন "শিষ্ট" এই মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনেকের ইহাকে শিষ্ট বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, এজন্য নিরাকরণ করা আবশ্যক। শংকরাচার্য কয়েক শতাব্দী পরে হেমাদ্রি সাংখ্য ও কপিলমতে ভেদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহারা সাংখ্যশাস্ত্রে পারদর্শী তাহাদের স্থান অতি উচ্চে এবং যাহারা কপিলমতে পারদর্শী তাহাদের স্থান অতি নীচে। এমন-কি ব্রাহ্মণদের সহিত কপিলদের এক পংক্তিতে বসাও উচিত নহে। বাঙালিদের উপর আর্য ঋষিদিগের এবং তাঁহাদের বংশধরদিগের অনুগ্রহ বড়োই বেশি। তাঁহারা বলেন, তীর্থযাত্রা ভিন্ন বঙ্গ দেশে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হেমাদ্রি লিখিয়াছেন শ্রাদ্ধের পংক্তিতে বাঙালিকে বসিতে দেবে না। এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, বাংলা দেশ আর্যদের দেশ ছিল না। তবে বাংলায় ব্রাহ্মণ কবে আসিল? তাম্রশাসন বা পাথরের লেখা না দেখিলে যাঁহারা কিছুই বিশ্বাস করিতে রাজি হন না তাঁহাদের উপকারার্থে এই কথা বলিতে পারা যায় যে, খৃস্টীয় ৪৩৬ সালে মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্তের অধিকার কালে রাজশাহি অঞ্চলে একজন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করা হয়। ইহার একশত বা দেড়শত বৎসর পরে ফরিদপুরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ কিছু কিছু জমিজমা লইয়া বাস করে; এটাও তাম্রশাসনের কথা। তবে কোনো কোনো পণ্ডিত এই তাম্রশাসনগুলিকে জাল বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। জাল হইলেও ১০/১২ শত বৎসরের পূর্বে ঐ জাল প্রস্তুত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বাংলায় ঐ কালে ব্রাহ্মণের বাসের সম্বন্ধে যে উহা প্রমাণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঞ্চ ব্রাহ্মণের বাংলায় আসা আদিশূরের সময়ে ঘটে। আদিশূরের কোনো

তাম্রশাসন পাওয়া যায় না—সুতরাং বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকদিগের মতে আদিশূরের নামে কোনো রাজা থাকাই সম্ভবপর নয়। অতটা বিজ্ঞান কিন্তু সংসারে চলে না। আদিশূর রাজা থাকুন আর নাই থাকুন, কিন্তু পাঁচ জন ব্রাহ্মণ যে এককালে বঙ্গ দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরেরা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণী হইয়া উঠিয়াছেন, একথা সন্দেহ করিবার কোনো কারণ দেখি না। তবে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, সেটা কোন্ কালে? প্রাচীন ঘটকের পুথিতে বলে, বেদে বাণাঙ্গ শাকে ৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খৃস্টাব্দে তাঁহারা বাংলায় আসেন একথা অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই; কারণ, তখন সমগ্র ভারতব্যাপী একটা ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল। কুমারিল ভট্ট মীমাংসা সূত্রের শবর-ভাষ্যের এক টীকা লিখিয়া পুনরায় বৈদিকধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। মহাকবি ভবভূতি তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। তিনি তখন কনোজের ব্রাহ্মণগণের নেতা। কনোজ তখন একজন প্রবল পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী মহারাজার রাজধানী। সুতরাং সেখান হইতে যে কয়েক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া অব্রাহ্মণ বঙ্গ দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচার করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কী? কনোজ হইতে ব্রাহ্মণেরা বাংলায় আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এদেশে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন। কিন্তু তাঁহারা নামেই ব্রাহ্মণ, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কিছু জানেন না। তাঁহাদিগের ঐ কথাও অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই। কেন-না ইতিপূর্বে তাম্রশাসন হইতে দেখাইয়াছি যে, বাংলায় ঐকালে ব্রাহ্মণ বাস করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল।

কিন্তু সাত শত ঘর অকর্মঠ ব্রাহ্মণ এবং পাঁচ ঘর কর্মঠ ব্রাহ্মণ লইয়া কিন্তু বাংলা দেশ হয না। সুতরাং এদেশে অন্য ধর্মও ছিল এবং সে ধর্মের প্রবল একটা যাজককুলও ছিল। হুয়েনসাঙ ৬২৯ খৃস্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে থাকিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাংলা দেশে তখন এক লক্ষেরও অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিন্ন ভিন্ন সংঘারামে বা বিহারে বাস করিতেন। এতদ্ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বী ভিক্ষুরাও ছিলেন—অর্থাৎ জৈন প্রভৃতি ধর্মের ভিক্ষুরাও ছিলেন। ভিক্ষুরা রোজগার করিয়া খান না, ভিক্ষা করিয়া খান। তিন বাড়িতে ভিক্ষা পেলে চতুর্থ বাড়িতে যাইবার তাঁহাদের নিয়ম ছিল না। আবার একবার যে বাড়িতে ভিক্ষা পাইয়াছেন, একমাসের ভিতরে সে বাড়িতে পুনরায় আসিতে পারিবেন না, ইহাও তাঁহাদের নিয়ম ছিল। সুতরাং একটি যতিকে প্রতিপালন করিতে হইলে অন্তত একশত ঘর গৃহস্থ বৌদ্ধ থাকা চাই। অতএব লক্ষাধিক ভিক্ষু প্রতিপালনের জন্য অন্তত এক কোটি বৌদ্ধ গৃহস্থ থাকা চাই। ছিলও তাহাই—দেশটা বৌদ্ধধর্মে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণকে বৌদ্ধেরা তখন গ্রাহ্যই করিতেন না। অন্য ধর্মাবলম্বীদিগকে তাঁহারা তখন বেশ দাবাইয়া রাখিতে পারিতেন।

বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম কবে আরম্ভ হয় তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের যাহা মূল স্থান, বাংলা তাহার অতি সন্নিকট। ইহাতে বোধ হয় যে, বুদ্ধদেব

জীবিত থাকিতেই এই দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। তিনি নির্বাণের দিনে নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, "বাংলার রাজকুমার বিজয় আজ সিংহলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সিংহলে আমার ধর্ম চিরস্থায়ী হইবে।" সুতরাং বুদ্ধদেবের জীবিত কালে শুধু যে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার হইয়াছিল এমত নহে কিন্তু বাংলা দেশ হইতে অন্য দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকও যাইতেছিল।

বাংলা দেশে খুব বড়ো বড়ো দুইটি নগর ছিল—একটি পৌন্ড্রবর্ধন এবং আর-একটি তাম্রলিপ্তি, প্রাচীন নাম দামলিপ্তি অর্থাৎ তামিলদিগের শহর। ভ্রাতা বীতাশোক পাছে মগধ সাম্রাজ্য লইয়া তাঁহার সহিত ঝগড়া করে এইজন্য অশোক তাহাকে বৌদ্ধ-ভিক্ষু করিয়া পৌন্ড্রবর্ধনের এক বিহারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সুতরাং সেখানেও পূর্ব হইতেই বিহার ছিল। তাম্রলিপ্তি বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। তাঁহারা এখান হইতে অন্যান্য দেশে বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচার করিতে যাইতেন। এই বন্দর দিয়াই অশোকরাজা তাঁহার ছেলে ও মেয়েকে বোধিবৃক্ষের এক ডাল দিয়া সিংহল দেশে পাঠাইয়াছিলেন। সে ডালটি এখন দুই তিন মাইল ব্যাপী অশ্বত্থ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং হুয়েনসাঙের পূর্বে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের কতদূর প্রচার হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গেল। যে-সকল জাতি বাংলায় বাস করিত—কিরাত, পৌন্ড্র, কৈবর্ত, বঙ্গ, বগধ সকলেই বৌদ্ধ হইয়াছিল। তবে বৌদ্ধদের একটা দোষ ছিল—পশুহত্যা যাহাদের ব্যবসায় ও জীবিকা তাহাদিগকে তাঁহারা দীক্ষা দিতেন না। কিন্তু যাহারা ঐরূপ জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া সুব্যবসায় গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে দিতেন। সেই জন্যই বাংলায় হেলে কৈবর্ত ও জেলে কৈবর্ত বলিয়া দুইটি জাতি হইয়াছিল। এক দল বৌদ্ধ-দীক্ষা পাইত আর-এক দল পাইত না। কিন্তু দীক্ষা পাইত না বলিয়া যে তাহারা বৌদ্ধ ছিল না একথা যেন কেহ মনে না করেন। কারণ শিক্ষা-দীক্ষা না পাইলেও কেবল মাত্র 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' 'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি' 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' বলিলেই তাহারা বৌদ্ধ হইতে পারিত অর্থাৎ ভিক্ষু মহাশয়েরা তাহাদিগকে কোনোরূপ শিক্ষা-দীক্ষা না দিয়াও তাহাদিগের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন।

এখন যাঁহারা হিন্দুধর্মের ও ব্রাহ্মণদের প্রধান ভক্ত তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা প্রায় সকলেই তখন বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধদের যে-সকল সংস্কৃত গ্রন্থ আছে—তাহাদের গ্রন্থকার অনেকেই কায়স্থ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আচার্য, উপাধ্যায়, ভদন্ত, ভিক্ষু, পিণ্ডপাতিক এবং মহোপাধ্যায় প্রভৃতি নামে ভূষিত হইতেন।

গুপ্ত উপাধিধারী বহু-সংখ্যক লোকে বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে রামপাল রাজার সময় অভয়াকর গুপ্ত একজন পরম পণ্ডিত এবং প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন।

বৌদ্ধেরা তখন কোনো ব্রাহ্মণকে আপনাদের দলে টানিতে পারিলে বড়োই আনন্দিত হইতেন। কেন-না তাহা হইলে তাঁহাদের সংস্কৃত পুস্তক লিখাইবার বড়োই সুবিধা হইত। এখন নেপালে অবিবাহিত ভিক্ষু নাই। ভিক্ষুরা সকলেই বিবাহ করে, সন্তান উৎপাদন করে এবং নামে মাত্র ভিক্ষু হয়। তথাপি যদি একজন ব্রাহ্মণের ছেলে পান তবে এখনো তাঁহারা অত্যন্ত আদরের সহিত তাহাকে ভিক্ষু করিয়া লন। ঐরূপ হইবার কারণ, ব্রাহ্মণ-ভিক্ষু ও অন্য জাতি ভিক্ষুর মধ্যে একটু তফাত ছিল—ব্রাহ্মণেরা সুশব্দবাদী হইত অর্থাৎ ব্যাকরণ দুরস্ত করিয়া সংস্কৃত লিখিত কিন্তু অব্রাহ্মণ বৌদ্ধেরা একেবারেই সুশব্দবাদী ছিলেন না, ব্যাকরণের ধারও ধারিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, আমরা দেখিব কেবল অর্থশরণতা অর্থাৎ অর্থটি যাহাতে প্রকাশ হয় অর্থাৎ এখানকার নৈয়ায়িকদের যেমন মত ছিল, "অস্মাকানাং নৈয়ায়িকানাং অর্থনি তাৎপর্য্যং শব্দনি কোশ্চিন্তা।" সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধের সংখ্যা কিন্তু অত্যন্ত কম ছিল। গুপ্ত উপাধিধারী প্রভাকর গুপ্ত একজন ভারি বিচারমল্ল ছিলেন। তিনি শুভাকর গুপ্তের মত প্রচার করিতেন, সর্ববাদী প্রমথনে শুভাকর সিংহস্বরূপ ছিলেন। ইঁহারা দুই জনে শুভাকর গুপ্তের দ্বারা একখানা বৌদ্ধদের স্মৃতির গ্রন্থ লেখান। তাহার কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। কর উপাধিধারী অনেকেও বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কয়েক জন তৈলিকপাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। বণিকদের তো কথাই নাই। ইঁহারাই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন ও বিহারের অনেক খরচ চালাইতেন। তদ্ভিন্ন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন, মঠ প্রতিষ্ঠা করিতেন ও পুস্তক লিখিয়া মঠকে দান করিতেন। ঐরূপে সকল জাতির লোকেই তখন বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মাছ মারিয়া খায় যে কৈবর্ত সেও বাদ যায় নাই। পাল রাজারা তো বৌদ্ধ ছিলেনই। তাঁহাদের অধীন যত ছোটোছোটো রাজা ছিলেন তাঁহারাও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তবে মানতের বেলা তাঁহারা কোনো ধর্মই বাছিতেন না। রোগ শান্তি, ভূত শান্তি, যুদ্ধে জয়-পরাজয় এই-সকলের জন্য সব রকমের দেবতার মানত করিতেন, 'মহাভারতে'র পাঠ শুনিতেন, ব্রাহ্মণদের বাড়ি যজ্ঞে উপস্থিত থাকিতেন, হোমের ফোঁটা লইতেন, ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিতেন, বিষ্ণু শিব প্রভৃতির মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতেন। অথচ তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন। কারণ, ঐ সঙ্গে সকালে উঠিয়া তাঁহারা 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' 'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি' 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' বলিতেন, সংঘ-ভোজন করাইতেন, সম্যক্ সম্ভোজন* করাইতেন, স্তূপ নির্মাণ করাইতেন, বিহার নির্মাণ করাইতেন, বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করাইতেন এবং নানাবিধ বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করাইতেন।

বৌদ্ধধর্ম তো শুধু শীল ও বিনয় লইয়া—তাহার মধ্যে দেবদেবীর মূর্তি কোথা

* এক বিহারের সকল ভিক্ষুকে খাওয়ানোর নাম সংঘ-ভোজন আর নিকটবর্তী সকল বিহারের সকল ভিক্ষুকে খাওয়ানোর নাম সম্যক্ সম্ভোজন।

হইতে আসিল? ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশে এখনো দেবদেবীর প্রাদুর্ভাব তত নাই। কিন্তু বাংলায় খুব ছিল। যাহারা বাংলা হইতে বৌদ্ধধর্ম পাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও খুব আছে। যাঁহারা সিংহলের বৌদ্ধধর্ম দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের দেবদেবীর কথা শুনিলে আশ্চর্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক মহাযান মতে অনেক দেবদেবী আসিয়া জুটিয়াছিলেন। মহাযান মতটা বড়োই দার্শনিক মত কিনা—একেবারে সাংখ্য ভাঙিয়া অদ্বয়বাদে উপস্থিত কিনা—তাই উহাতেই দেবদেবী সকলেরা আগেই আসিয়া জুটিলেন। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ—মহাযান মতে এই তিনটি জিনিস সূক্ষ্ম হইয়া দাঁড়াইল প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধ হইলেন উপায়, ধর্ম হইলেন প্রজ্ঞা এবং সংঘ হইলেন বোধিসত্ত্ব। দেখিতে দেখিতে প্রজ্ঞা ঠাকুরাণী বুদ্ধের শক্তি হইয়া দাঁড়াইলেন; কারণ, উপায় পুংলিঙ্গ এবং প্রজ্ঞা স্ত্রীলিঙ্গ। উভয়ের সংযোগে বোধিসত্ত্বের উৎপত্তি হইল। প্রজ্ঞা নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়, উপায়ও নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়, সুতরাং সৃষ্টি-স্থিতি-লয় চলে না। বুদ্ধ ও ধর্মের অপেক্ষা বোধিসত্ত্বের পূজা বেশি বেশি হইতে লাগিল। কারণ, নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়ের উপাসনা করিয়া কী হইবে? সুতরাং সকাম সক্রিয় শক্তির উপাসনা হইতে লাগিল—অনেকগুলি বোধিসত্ত্ব ঠাকুর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর প্রধান। বর্তমান কল্পের ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ ও তাঁহার শক্তি পাণ্ডরা ইঁহাদের দুই জনের সংযোগে উৎপন্ন অবলোকিতেশ্বর—বর্তমান কল্পের প্রধান দেবতা। তাঁহার অনেক মূর্তি, অনেক মস্তক, অনেক হস্ত, অনেক পদ, অনেক নাম, অনেক মন্দির। তাঁহার ভক্তের সংখ্যাও অনেক বেশি। কারণ এই কল্পে কাহাকেও বুদ্ধ হইতে হইলে তাঁহার কৃপা ভিন্ন হইবার জো নাই। যাহা হউক, বুদ্ধাদির মূর্তিপূজা প্রচলিত হইবার সময় একটা বড়ো মুশকিল হইল—কারণ, এখন হইতে শক্তির সহিত জড়িত বুদ্ধমূর্তির উপাসনা আরম্ভ হইল। সুতরাং আমরা অর্থাৎ অভক্তেরা যাহাকে অশ্লীল বলি, সেই অশ্লীল মূর্তি সমূহেরও পূজা হইতে লাগিল। ঐ মূর্তির যে কত বিচিত্র ভঙ্গি আছে তাহা এখনকার লোকে কল্পনা করিতেই পারে না। অনেকে ইহাকে Tantric Buddhism বলেন। তন্ত্রে শিবশক্তি পূজা, যুগলাদ্য মূর্তির উপাসনা—এখানেও বুদ্ধ ও তাঁহার শক্তি পূজা, যুগলাদ্য মূর্তির উপাসনা। সুতরাং এই উপাসনারও নাম হইল তান্ত্রিক বৌদ্ধোপাসনা। বৌদ্ধধর্মে গোড়ায় যে কঠোরতা, কাঠিন্য ছিল এখন তাহা বেশ সরস হইয়া উঠিল। উহাতে লোকেরও মন ভিজিল। লোকে সহজে নির্বাণের পথ পাইল—ইহারই নাম সহজিয়া ধর্ম। সহজিয়া ধর্মের অর্থ ভগবান বুদ্ধ যখন সহজ ভাবে থাকেন। যখন তিনি শক্তির সহিত মিলিত, অথচ শক্তির সন্তান-সম্ভাবনা উপস্থিত হয় নাই। এই সময় ভগবানের কাছে যাহা বর চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। এই সময়েই তাঁহার করুণার পরমা স্ফূর্তি। সুতরাং ভক্তের পক্ষেও উপাসনার এই প্রশস্ত সময়। এই যে সরস মধুর ভাব, ইহা ক্রমে অন্য অন্য ধর্মেও ছড়াইয়া পড়িল। বৈষ্ণবের

যুগল মিলনও এই সহজরূপেরই রূপান্তর মাত্র; তবে বৈষ্ণবের সহজিয়া ও বৌদ্ধের সহজিয়া মতে একটু তফাত আছে। বৌদ্ধের সহজিয়া সম্পূর্ণভাবেই রূপক, এবং ঐ রূপক আপনাকে দিয়াও ফলাইতে পারা যায়। কিন্তু বৈষ্ণবের সহজিয়া ঠাকুর-ঠাকুরাণীর সহজিয়া—তাহাতে একটু ভক্তিরস থাকে। নিজের দেহের উপর উহার experiment চলে না।

এই যে দেশব্যাপী বৌদ্ধধর্ম, ইহা এখন কোথায় গেল? যখন সহজিয়া ধর্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাবে বাঙালি একেবারে অকর্মণ্য ও নির্বীর্য হইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই সময় আফগানিস্তানের খিলিজিরা আসিয়া উহাদের সমস্ত বিহার ভাঙিয়া দিল—দেবমূর্তি, বিশেষত যুগলাদ্য মূর্তি চূর্ণ করিয়া দিল—সহস্র সহস্র নেড়া ভিক্ষুর প্রাণনাশ করিল। বড়ো বড়ো বিহারে যে-সকল যথার্থ পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন তাঁহারাও ঐ সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন—তাঁহারাই ঐ ধর্মের অস্থি ও মজ্জাস্বরূপ ছিলেন। অস্থি ও মজ্জার নাশ হইলে দেহেরও নাশ হয়, সেইরূপ তাঁহাদের মৃত্যুতে সহজিয়া বৌদ্ধধর্মেরও নাশ হইল।

মুসলমান বিজয়ের এক বা দুই পুরুষ পূর্বে বল্লালসেন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সেন্‌সাস লইয়াছিলেন। সাড়ে তিন শত ঘর রাঢ়ী ও সাড়ে চারি শত ঘর বারেন্দ্র হইয়াছিল। ইহার উপর কিছু সাতশতী, কিছু পাশ্চাত্য ও কিছু দাক্ষিণাত্য ছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণসংখ্যা তখন সবসুদ্ধ দুই হাজার ঘরের অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এতদিন ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। কখনো তাঁহারা হঠিতেন, কখনো বা ইঁহারা হঠিতেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ প্রণীত বহু-সংখ্যক দার্শনিক পুস্তকে এই ঘোরতর বিচারের নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলমান বিজয়ে বৌদ্ধ-মন্দিরের ও বৌদ্ধ-দর্শনের একেবারে সর্বনাশ হইয়া গেল। উহাতে ব্রাহ্মণদের প্রভাব বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু বৌদ্ধের বদলে এখন মুসলমান মৌলবি ও ফকির তাহাদের প্রবল বিরোধী হইয়া উঠিল। সুতরাং দেশের যেখানে যাহার জোর বেশি সেখানে তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ঐরূপে বাংলার অর্ধেক বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গেল এবং অপর অর্ধেক ব্রাহ্মণের শরণাগত হইল আর বৌদ্ধদিগের মধ্যে যাহারা তখন নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল—মুসলমান ও ব্রাহ্মণ উভয় পক্ষ হইতেই তখন তাহাদের উপর নির্যাতন উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া দিলেন অর্থাৎ অসভ্য বাগদি, কৈবর্ত, কিরাতের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন—আর মুসলমানেরা তাহাদের উপর নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। কিন্তু এই ধর্মপ্রচার ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের একটু বাহাদুরি দিতে হয়। তাঁহারা বাংলার রাজশক্তির সাহায্য প্রায়ই পান নাই, তথাপি পাঁচটি মাত্র প্রাণী আসিয়া অর্ধেক দেশটাকে যে অল্পকালের মধ্যে হিন্দু করিয়া ফেলিয়াছিলেন ইহা অল্প বাহাদুরির কাজ নয়।

বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে যাহারা অনাচরণীয় ছিল এবং মুসলমানাধিকারের পরে নূতন সমাজে যাহারা অনাচরণীয় হইল—বৌদ্ধধর্ম শেষে তাহাদের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া পড়িল এবং তাহারা ক্রমে প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব ভুলিয়া গেল। শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, করুণাবাদ ভুলিয়া গেল; দর্শন ভুলিয়া গেল। শীল বিনয় ভুলিয়া গেল। তখন রহিল জনকতক মূর্খ ভিক্ষু অথবা ভিক্ষু নামধারী বিবাহিত পুরোহিত। তাহারা আপনার মতো করিয়া বৌদ্ধধর্ম গড়িয়া লইল। তাহারা কূর্মরূপী এক ধর্মঠাকুর বাহির করিল। এই যে কূর্মরূপ ইহা আর-কিছু নহে, স্তূপের আকার। কূর্মের যেমন চারিটি পা ও গলা—এই পাঁচটা অঙ্গ থাকে, স্তূপেরও তেমনি পাঁচটা অঙ্গ থাকিত। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চারিদিকে চারিটি ধ্যানীবুদ্ধ থাকিতেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আর-একটি ধ্যানীবুদ্ধ থাকিতেন—এইরূপে স্তূপটি পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের আবাসস্থান হইয়া ধর্মের সাক্ষাৎ মূর্তিরূপে পরিগণিত হইত। সুতরাং কূর্মরূপী ধর্ম ও স্তূপরূপী ধর্ম একই। পঞ্চ বুদ্ধের প্রত্যেকের যেমন একটি করিয়া শক্তি ছিল, ধর্মঠাকুরেরও তেমন একটি শক্তি হইলেন, তাঁহার নাম কামিণ্যা। তিনি সব দেবতার বড়ো। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ভগবতী, বিশালাক্ষী, বাশুলি, কালী, গণেশ, রাজা, কোটাল, মন্ত্রী, এই-সকল ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা। ধর্মঠাকুর আজও যে বাঁচিয়া আছেন, সে কেবল মানতের জোরে। নদীয়ার উত্তর জামালপুরের ধর্মঠাকুরের মন্দিরে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে বারো শত পাঁঠা পড়ে। ধর্মঠাকুর প্রত্যেক স্থানেই কোনো-না-কোনো রোগের ঔষধ দেন। সোঁয়াগাছির ধর্মঠাকুর পেটের অসুখের ঔষধ দেন। বৈঁচির নিকটে অচলরায় পিত্তফোটের ঔষধ দেন। তিনি অনাচরণীয় জাতির হাতে পূজা খাইতে ভালোবাসেন। তাঁহার সেবকেরা প্রায় ডোম, হাড়ি ইত্যাদি অনাচরণীয় জাতি। ধর্ম-মঙ্গলের কালুরায়কে লাউসেন যখন স্বর্গে নিতে চাহিলেন, কালুরায় (ডোম) তখন জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে মদ ও শুয়রের মাংস পাওয়া যায় কিনা। লাউসেন বলিলেন, "না।" কালুরায় উহা শুনিয়া বলিল, "আমি যাইব না।" লাউসেন তখন কালু ডোমের উপর ধর্মঠাকুরের পূজার ভার দিয়া গেল। সেই অবধি ডোমেরা তাঁহার প্রধান পূজক। বাংলা দেশে ইহাই বৌদ্ধ ধর্মের শেষ পরিণাম।

'উদ্বোধন' আষাঢ়, ১৩২৪।।

হিন্দু বৌদ্ধে তফাত

হিন্দু, দেবতা উপাসনা করেন। বৌদ্ধ, গুরুর উপাসনা করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধে এই প্রথম ও প্রধান তফাত। হিন্দু দেবতা উপাসনা করেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য—দেবতার সঙ্গে একলোকে বাস করেন, সমান আকার প্রাপ্ত হন, সমান অলৌকিক শক্তি লাভ

করেন, এমন-কি, একদেশে দেবতার দেহের সহিত মিলিত হন। পুরা মাত্রায় দেবতা হন, একথা তাঁহারা মনেও ধারণা করিতে পারেন না। বৌদ্ধেরা গুরু ভজনা করেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য—গুরু হইবেন, বুদ্ধ হইবেন, শূন্য হইবেন। শূন্যে শূন্য মিশিয়া যাইবে।

বৌদ্ধেরা দেবতাকে অত্যন্ত ছোটো বলিয়া মনে করেন। দেবতারা মানুষের চেয়ে একটু বড়ো হইতে পারেন, কিন্তু গুরুর চেয়ে তাঁহারা অনেক নিচে। শাক্যমুনি যখন বোধিমূলে বসিয়া বোধিলাভ করিলেন, ইন্দ্র ও ব্রহ্মা তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গের অধিপতি, ব্রহ্মা রূপলোকের অধিপতি; ইঁহারা দু' জনেই বুদ্ধের কাছে জোড়হস্ত। 'নারায়ণপরিপৃচ্ছা' নামক পুস্তকে আছে যে, নারায়ণ সাজিয়া-গুজিয়া, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া, গরুড় আসনে বসিয়া বুদ্ধদেবের নিকটে আসিলেন এবং গূঢ় দার্শনিক মতের মীমাংসা করিয়া লইয়া গেলেন। শাক্যসিংহ যখন জন্মাইলেন, তখন শাক্যদের নিয়ম অনুসারে খোকাটিকে মহেশ্বরের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। মহেশ্বর নিজে উঠিয়া ছেলেটিকে কোলে করিয়া লইলেন। এই-সকল দেখিয়া বেশ জানা যায় যে, আমাদের যে বড়ো বড়ো দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সকলেই বুদ্ধ অপেক্ষা অনেক ছোটো। কিন্তু বেদের সময় হইতেই আমরা ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছি। বেদে যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ, দেবতাদের আহার, আহারের স্থান, সব তৈয়ার করিতেন; ঋগ্বেদী তাঁহাদের হব বা আহ্বান করিতেন। তাঁহারা খাইতে বসিলে সামবেদী আহারের সময় তাঁহাদের স্তব উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন। দেবতারা আহারে তৃপ্ত হইয়া তাঁহাদের বর দিয়া যাইতেন, যথা—পুত্র, পশু, দ্রবিণ ইত্যাদি। বেদের পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমাদের উপাস্য দেবতা হইলেন। তাঁহাদের কাছেও আমরা বর চাহিতাম—ধন দাও, পুত্র দাও, পশু দাও। যাঁহারা পার্থিব সুখের জন্য ব্যগ্র নহেন, তাঁহারা সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য ও বড়ো জোর সাযুজ্য প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধদের চরম প্রার্থনা, নির্বাণ ও বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। অনুপাধিশেষনির্বাণ বা শূন্যে মিশিয়া যাওয়া।

আমরা ঠাকুরদের ধ্যান করি। বলি—"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং, ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী", অথবা বলি—"বন্দে শৈলসুতাসুতং", "ভজামি, প্রণমামি" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু বৌদ্ধেরা যখন তাঁহাদের দেবতাদের ধ্যান করেন, তাঁহারা "আত্মানং অমুকদেবতারূপেণ বিভাব্য" পূজা করেন, আমিই বজ্রযোগিনী হইয়াছি, আমিই লোকেশ্বর হইয়াছি, আমিই প্রজ্ঞাপারমিতা হইয়াছি বলিয়া পূজা করেন। এই-সকল দেবতা ইন্দ্র-চন্দ্রাদি দেবতা হইতে পৃথক্। ইঁহাদের কথা পরে বলিব। আমাদের দেবতারা অনেক বৌদ্ধ দেবতার পায়ের তলে থাকেন। অনেক সময়ে আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও ঐরূপ দুর্দশা বৌদ্ধেরা করিয়া থাকেন।

মহাযানের পর বৌদ্ধদের যেসব যান হইয়াছে, তাহাতে দেবতা আছে। কিন্তু সে-

সকল দেবতা দেব ও দেবী, আমাদের দেব ও দেবীদের মতো ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা ডিপার্টমেন্টের দেবতা নহেন; তাঁহারা সকলেই শূন্যের প্রতিমূর্তি। আপনারা পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের নাম শুনিয়াছেন। বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি; তাঁহারা পাঁচটি স্কন্ধের শূন্যমূর্তি। পাঁচটি স্কন্ধ কী কী? রূপস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ এই পাঁচটি স্কন্ধের শূন্যমূর্তির নাম পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ। ইঁহাদের পাঁচটি শক্তি আছেন, রোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা, আর্যতারিকা। ইঁহাদের আবার পাঁচ জন বোধিসত্ত্ব আছেন; গণেশ, মহাকাল, পদ্মপাণি, রত্নপাণি, বিশ্বপাণি। এই শক্তিগুলি ও এই বোধিসত্ত্বগণ সবই শূন্যমূর্তি। এই পনেরোটি শূন্যমূর্তি হইতে অসংখ্য অসংখ্য বুদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি হইয়াছে; সবই শূন্যমূর্তি। বৌদ্ধেরা—আমরা সেই সেই মূর্তি হইয়া গিয়াছি, এই বিভাবনা বা ধ্যান করিয়া তাঁহাদের পূজা করেন। আমরা শূন্যমূর্তির ধ্যানই করি না। আমরা আমাদের সম্মুখে যে মূর্তি, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহাকে দেবতা করিয়া লইয়া ধ্যান করি।

আমাদের শূন্য অন্ধকার তমোভূত। বৌদ্ধদের শূন্য প্রভাস্বর, স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংজ্যোতিঃ। আমাদের আদিসৃষ্টি আছে। বৌদ্ধদের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনাদিপ্রবাহ। উহার আদিও নাই, অন্তও নাই। বুদ্ধদেবকে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, তোমার আপনার চরকায় তেল দাও। তুমি কোথা থেকে এলে, কোথায় যাইবে, তাই ভাবো। পৃথিবীর কথা ভাবার তোমার দরকার নাই। আকাশ কোথা হইতে হইল, জিজ্ঞাসা করিলেও সেই কথাই বলিতেন। সুতরাং তাঁহার কাছে সৃষ্টিকথা শুনিবার আশা নাই। যখন বৌদ্ধদের মধ্যে যুবা বৃদ্ধে দলাদলি হইল, তখন যুবকেরা প্রথম যে বই লেখে, সেই 'মহাবস্তু অবদানে' লেখা আছে, আগে বহুদিন পূর্বে—কত কল্পকোটি বৎসর পূর্বে, তাহার ঠিকানা নাই, জীব ছিলেন—তাঁহারা স্বয়ংপ্রকাশ, তাঁহাদের শরীরে ভার ছিল না, তাঁহারা দিক, কাল, আকাশে ইচ্ছামতো ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহাদের দুঃখ ছিল না, নিরন্তর প্রীতি সুখে বিচরণ করিতেন। কিছুকাল পরে একটা হ্রদের মতো দেখা দিল। উহাতে অতি পাতলা অথচ অতি সুমিষ্ট জলের মতো একটা পদার্থ ছিল; তাই অনেকে খাইতে লাগিলেন, খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে একটু একটু ভার বোধ হইতে লাগিল। আবার বহুকাল পরে আর-একটা কী বাহির হইল, তাহা খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে তেজ বা আলো ক্রমে কমিতে লাগিল। ক্রমে গাছ দেখা দিল, সমস্ত গাছই ফলভরে অবনত, সেই ফল তাঁহারা খুব খাইতে লাগিলেন, শরীরের ভারও একটু বাড়িল, আলোও কমিয়া গেল। তাহার পর শস্যক্ষেত্র দেখা দিল, তাঁহারা তাহাও খাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্ত্রীত্ব ও পুংচিহ্ন আবির্ভূত হইল, ক্রমে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি হইতে লাগিল এবং ফসল তৈয়ারি করা দরকার হইল। যখন আমার খেতের ফসল তুমি খাইতে লাগিলে, তখন

সকলে একত্র হইয়া একজন মহাকায় পুরুষকে নিয়োগ করা হইল। তাঁহার বেতন নির্ধারণ করা ইল, উৎপন্নের ৬ ভাগের একভাগ। তাঁহার নাম হইল মহাসম্মত। এইসব পড়িয়া আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুরা যে অন্ধকার হইতে সৃষ্টি বলিয়াছেন, ইঁহারা তাহা বলেন না। ইঁহারা বলেন, আলো হইতেই অন্ধকার হইয়াছে। আর হিন্দুরা যে বলেন, "অষ্টাভির্লোকপালানাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতো নৃপঃ" অর্থাৎ রাজা দেবাংশ, ইঁহারা তাহাও বলেন না। ইঁহাদের রাজা গণদাস; লোকে তাঁহাকে বাছিয়া লইয়া বেতন দিয়া রাখিয়াছে। উত্তর অঞ্চলের বৌদ্ধেরা রাজাকে কখনোই বড়ো বলিয়া মানিত না। সেইজন্য ভারতবর্ষে ও চীনে রাজাদের হাতে তাহাদের অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সময়ে সময়ে সমস্ত বৌদ্ধ সংঘ বিনাশ করিয়া ফেলা হইত। রাজাদের হাতে হিন্দুদের এ দুর্ভোগ বড়ো ভুগিতে হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম নগরের পক্ষেই সুবিধা। হিন্দুধর্ম নগর ও গ্রাম, সর্বত্রই সমান ভাবে আদর পাইত। কৌটিল্য বৌদ্ধদের বড়ো ভালো চক্ষে দেখিতেন না। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, উহাদিগকে পাড়াগাঁয়ে, যেখানে লোক চাষবাস করিয়া খায়, সেখানে যাইতেই দিবে না। নূতন গাঁয়ে উহাদের প্রবেশ নিষেধ। উহারা সেখানে গেলে, লোককে ভিক্ষু করিতে চেষ্টা করিবে, চাষবাস বন্ধ হইয়া যাইবে। হিন্দুরা গৃহস্থ, তাঁহারা সংসারের উন্নতি চান, বৌদ্ধদের সেদিকে দৃষ্টিই নাই। সেজন্য হিন্দু ও বৌদ্ধে কখনোই ঠিক বনিবনাও হইত না। অথচ হিন্দু ভিক্ষা না দিলে বৌদ্ধদের ভিক্ষু হওয়াই চলিত না।

হিন্দুরা বর্ণাশ্রম ধর্ম মানিতেন, তাঁহাদের শেষ আশ্রম যতি বা ভিক্ষু। যে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ না হইয়া যতি হইত, হিন্দুরা তাহাকে ভালো চক্ষে তো দেখিতই না, বরং তাহাকে শাস্তিও দিত। কিন্তু বৌদ্ধেরা বর্ণ ও আশ্রম না দেখিয়াই সকলকে ভিক্ষু করিত। বুদ্ধদেবের সময়েই এই ব্যাপার লইয়া মহা-গোলযোগ উঠে। তিনি যখন কপিলবাস্তুতে ধর্ম প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, তখন দলে দলে শাক্যেরা বাল যুবা বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ ভিক্ষু হইতে লাগিল। শুদ্ধোদন দেখিলেন, ক্রমে শাক্যদের জাতি ও নাম লোপ হইতে চলিল। তখন তিনি বুদ্ধকে বলিলেন, তুমি ২১ বৎসরের আগে যদি কাহাকেও ভিক্ষু করো, তাহা হইলে তোমাকে তাহার পিতামাতার সম্মতি লইতে হইবে। তাই নিয়ম হইল, ২১ বৎসর বয়সের আগে কাহাকেও ভিক্ষু করা হইবে না। সে নিয়ম আজও আছে। বৌদ্ধদের যে কম্মবাচা আছে, তাহাতে কেহ ভিক্ষু হইতে আসিলে তাহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয়, "তোমার বয়স ২১ বৎসর হইয়াছে তো?" এইরূপে শুদ্ধোদন নাবালকদিগকে ভিক্ষু হওয়ার দায় হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুদের মতে, যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিল, সে চতুর্বর্ণ-সমাজ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার দেহ অশুচি। তাহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীরা ভাগ করিয়া লইবে। সে যদি আবার ফিরিয়া আসে, তাহাকে আর বর্ণাশ্রমের মধ্যে গ্রহণ করা হইবে না। সে ভ্রষ্ট

যোগী হইয়া থাকিবে। সংসারের প্রবেশ করিলে সে আর আপনার পূর্বপদ পাইবে না। বৌদ্ধেরা কিন্তু অনেককে সংঘ ত্যাগ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিতে দেয়। উহারা কয়েক বৎসরের জন্যও ভিক্ষু করিতে রাজি। অশোকরাজা একবার এক বৎসরের জন্য সংঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে সংঘে যায়, সে আপনার সমস্ত সম্পত্তি-স্বত্ব লইয়া সংঘে যায়। বৌদ্ধেরা হিন্দুদের ঠাট্টা করিত, হিন্দুদের তো সন্ন্যাস লওয়া নয়, পুত্র পৌত্রদের সম্পত্তি বাঁটিয়া দিবার একটা ফন্দি। আমাদের সংঘে আসা মানে, আপনার সমস্ত সম্পত্তি সাধারণীকরণ বা দুনিয়াকে দান করা। হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে এই ব্যাপার লইয়া সর্বদা বিবাদ-বিসংবাদ হইত। মনে করো, একজন বড়ো ধনী আছেন; তাঁহার একটি ছেলেকে উহারা ভিক্ষু করিল। তাহার পিতা মরিলে তাহার অংশ সংঘের হইয়া যাইবে। অন্য ভাইয়েরা রাজি হইত না। সর্বদা ঝগড়া বিবাদ হইত। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পতনের এও একটা প্রধান কারণ। ভিক্ষুদের দেখিলেই সম্পন্ন গৃহস্থেরা ভয় পাইত—ছেলে ধরিতে আসিয়াছে।

হিন্দুদের ভূসম্পত্তি সবই সপিণ্ডদের হইত। ছেলে জন্মাইলেই সে সম্পত্তির অংশাধিকারী হইত। বাপ আর সে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিতেন না। মিতাক্ষরা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে লেখা যে, জন্মমাত্রেই স্থাবর সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব হয়। কিন্তু বাংলায় এ মত চলে না। এখানে বাপ মরার সময় যে যে ছেলে, পৌত্র বা প্রপৌত্র বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা উত্তরাধিকারের স্বত্ব পাইবে। এটা অনেকে মনে করেন, বাংলায় বৌদ্ধ প্রাধান্য ছিল বলিয়া হইয়াছে। হিন্দুরা communal interest দেখিত, বৌদ্ধেরা personal interset দেখিত।

বুদ্ধদেব নিজে যে-সকল আইন করিয়া গিয়াছিলেন, সবই সংঘের জন্য। তাঁহার বিনয় সংঘের মধ্যেই চলিত। গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক উপাসিকাদের জন্য তিনি যে-সকল নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও সংঘ ও উপাসক উপাসিকার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, তাহারই উপর স্থাপিত। এই-সকল নিয়মের বাহিরে উপাসক উপাসিকাদিগকে অর্থাৎ গৃহস্থ বৌদ্ধদিগকে রাজার আইন মানিয়া চলিতে হইত। দেওয়ানি ও ফৌজদারি অথবা ধর্মস্থীয় ও কণ্টকশোধন রাজার হাতে ছিল। এ-সকল বিষয়ে বৌদ্ধেরা কোনো আইন-কানুন ভারতবর্ষে করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ভারতবর্ষের বৌদ্ধদিগকে চিরদিনই রাজার অধীন হইয়া চলিতে হইত। ইৎসিং এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছেন, কেমন করিয়া সংঘ রাজার সঙ্গে যাহাতে বিবাদ না হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন। একজন ভিক্ষুকে কোনো কারণে সংঘ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, সংঘাধিপ তাহার যাহা-কিছু ভিক্ষু-সম্পত্তি ছিল, তাহার কাপড়-চোপড় বিছানা প্রভৃতি তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে আর সেই জিনিস লইবার জন্য সরকারের সাহায্য লইবার সুবিধা পাইল না। অনেক রাজা বৌদ্ধ সংঘকে গ্রাম দান করিতেন। নালন্দার মঠগুলির ২০০ খানা গ্রাম ছিল।

গ্রামণীর যে কাজ, তাহা সংঘেরাই করিতেন। সুতরাং সংঘ যে একেবারে রাজার কথা মানিব না, তাহা বলিত পারিতেন না। অনেক রাজা আবার এই-সকল গ্রাম বাজেয়াপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়, এক সংঘের গ্রাম অন্য সংঘকে দেওয়া হইত। সংঘে আবার ব্যবসা ও বাণিজ্য চলিত। সুতরাং রাজার সঙ্গে তাঁহাদিগকে ভাব রাখিয়া চলিতে হইত। রাজা বৌদ্ধবিরোধী হইলে এবং তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণ প্রবল হইলে সংঘকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হইত। কিন্তু তথাপি সংঘের যথেষ্ট প্রতাপ ছিল। লোকে যখন সংঘের অনুরাগী থাকিত, রাজা সহজে তাহাদের উপর হুকুম চালাইতে বা তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে যাইতেন না।

রাজনীতি, সমাজ-শাসন ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ যে তফাত ছিল, তাহা কতক কতক দেখানো হইল। কিন্তু দার্শনিক মত বিষয়ে উহাদের তফাত বড়োই বেশি ছিল। হিন্দুরা এখন বলেন, তাঁহাদের ছয়খানি দর্শন—মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক। মীমাংসা বৌদ্ধদের থাকিতেই পারে না। কারণ, উহা বেদের ব্যাখ্যা লইয়া ব্যস্ত। এই শাস্ত্রকে দর্শন বলিতেই পারা যায়, নাও বলিতে পারা যায়। যখন উহা বেদের ব্যাখ্যা লইয়া নিয়ম করে, তখন উহা দর্শন নহে। কিন্তু যখন যজ্ঞ করিলে অপূর্ব হয় বলে, অপূর্বে বা অদৃষ্টের বলে স্বর্গ ও নরক হয় বলে, স্বর্গের লক্ষণ করে, প্রমাণ কয়টা ও তাহার লক্ষণ কী বলে, তখন উহা দর্শন। বেদান্ত, বেদের উপনিষৎগুলি প্রমাণ মনে করিয়া, তাহার উপর ব্রহ্ম, অপবর্গ প্রভৃতি কথার বিচার করে, তখন উহা নিশ্চয়ই দর্শন। যখন এ দুখানি দর্শন বেদকে ভিত্তি করিয়া তৈয়ারি হইয়াছে, তখন ইহার সহিত বৌদ্ধদের কোনো সম্পর্ক নাই।

পাতঞ্জল দর্শন যোগের কথা। যোগ সবাই করে বৌদ্ধেরাও করে, জৈনেরাও করে, হিন্দুরাও করে; সুতরাং উহাকে দর্শন না বলিলেও চলে। একজন দর্শনসমূহের ইতিহাস লেখক জৈন-পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, যোগ দর্শন নয়, উহা কতকগুলি নিয়ম মাত্র; সকল যোগীই উহা মানিয়া চলেন। পতঞ্জলির যোগসূত্রে আমাদের বা বৌদ্ধদের কোনোই আপত্তি নাই।

সাংখ্য লইয়া মহা-গোল। সকল দর্শনের চেয়ে সাংখ্য পুরানো। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় উঠিবার অনেক আগে সাংখ্যদর্শন হইয়াছিল। সকলেই উহা হইতে আপন আপন মতের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন। অশ্বঘোষ 'বুদ্ধচরিতে' স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের যে দু' জন গুরু ছিলেন, দু' জনেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের যে কৈবল্য, তাহা বুদ্ধদেবের পছন্দ হয় নাই। তাই তিনি উঁহাদিগকে ছাড়িয়া ছয় বৎসর ধ্যানধারণার পর পরমার্থ-জ্ঞান প্রাপ্ত হন। সে পরমার্থ-জ্ঞান কিন্তু ঐ সাংখ্য মতের উপরই দাঁড়াইয়া আছে। তবে সাংখ্যদের মূল কথা যে সৎকার্যবাদ, তাহা উনি ত্যাগ করিয়াছেন। কারণ সৎ, তাহা হইতে সৎ কার্যের উৎপত্তি অর্থাৎ কার্যকারণের পরিণাম মাত্র। বুদ্ধদেব

সৎকার্যবাদটিকে ঘুচাইয়া বলিলেন, "সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্।" গোড়ায় যদি সৎকার্যবাদ বন্ধ করিয়া ক্ষণিকবাদ হইল, আগায়ও তাহা হইলে কেবলবাদ ভাঙিয়া গিয়া শূন্যবাদ হইল। বুদ্ধদেব বলিলেন, "সর্ব্বং শূন্যং শূন্যম্।" সাংখ্যও সব জিনিসের সংখ্যা করিয়া থাকে বলিয়া সাংখ্য নাম পাইয়াছে। বৌদ্ধেরাও তেমনি সকল বিষয়েরই সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন। মূল সাংখ্য ২২টি সূত্র মাত্র। প্রত্যেক টিরই একটি করিয়া সংখ্যা আছে। যথা— ১. অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। ২. ষোড়শ বিকারাঃ। ৩. পুরুষ—ইত্যাদি। বৌদ্ধেরাও তেমনি বলেন, চতুরার্যসত্য, ষট্ পারমিতা, দশভূমি ইত্যাদি। যদিও বৌদ্ধদের সাংখ্যদের মতো সূত্রাবলী নাই, কিন্তু দার্শনিক পদার্থগুলির সংখ্যা করা সম্বন্ধে দু' জনই একপন্থী।

কপিলসূত্রগুলিতে বেদ যে প্রমাণ, সেকথা নাই। তাই হিন্দুরাও বইখানাকে নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। সাংখ্য বলিতে তাঁহাদের কাছে 'ষষ্টিতন্ত্র' বুঝাইত। 'ষষ্টিতন্ত্রে'র পুথি এখনো পাওয়া যায় নাই। কিন্তু উহার এক সূচি 'অহির্বুধ্ন পঞ্চরাত্রে' পাওয়া গিয়াছে। আর ঐ 'ষষ্টিতন্ত্র' সংক্ষেপ করিয়াই ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার কারিকা লিখিয়াছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাই হিন্দু সাংখ্যের প্রাচীনতম পুথি। উহাতে বেদ যে প্রমাণ, সে-কথা আছে। কিন্তু সে বেদ সাংখ্যজ্ঞান হইতে অনেক নিচে। "দৃষ্ট বদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়-যুক্তঃ"—দৃষ্ট পদার্থ হইতে যেমন একান্ত ও অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয় নাই, আনুশ্রবিক অর্থাৎ বেদোদিত ক্রিয়াকলাপ হইতেও সেইরূপ অত্যন্ত ও একান্ত দুঃখনিবৃত্তি হয় না। নাই হউক, তথাপি উহা বেদ মানে, উহাকে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কপিলকে গ্রহণ করা যায় না, সে বেদ মানে না। কপিলের উপর হিন্দুদের এত ঘৃণা যে, শ্রাদ্ধসভায় যদি কপিল বা লোকায়ত উপস্থিত হয়, উহাদিগকে শিয়াল কুকুরের মতো তাড়াইয়া দিতে হইবে। 'সাংখ্য-প্রবচনভাষ্য'ও সাংখ্যের একখানি নূতন পুথি। এখানিও হিন্দুরা গ্রহণ করিয়াছেন, যেহেতু ইহাতে বেদকে প্রমাণ বলিয়া মানে। সুতরাং দু-রকম সাংখ্য আছে; একরকম হিন্দুদের ও আর-একরকম বৌদ্ধদের। বৌদ্ধেরা কপিল-সূত্রের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরকৃষ্ণকারিকা চীন দেশের 'ত্রিপিটকে' পাওয়া যায়।

বৈশেষিক লইয়া আরো গোল। প্রবাদ আছে, বৈশেষিক আঠারো রকম। আমরা তো অত পাই নাই। একরকম সকলেই জানে, কণাদের ষট্পদার্থী—উহাতে বেদের কথা আছে—"বুদ্ধিপূর্ব্বো বাক্যকৃতির্বেদে"; সুতরাং হিন্দুরা উহা গ্রহণ করিয়াছেন। আর-একরকম দশপদার্থী বৈশেষিক চীন দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে, উহাতে বেদের উল্লেখ একেবারে নাই, হিন্দুরা উহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধেরা উহা রাখিয়াছে। বৈশেষিক একরকম "ফিসিকাল সায়েন্স"; সুতরাং উহাতে সকলেরই দরকার। লইতে সকলেরই হইবে, সকলেই আপন আপন মত করিয়া লইয়াছেন।

আরো বেশি গোল ন্যয়শাস্ত্র বা লজিক লইয়া। দু-পক্ষেই বলেন, উহা অক্ষপাদের লেখা। অক্ষপাদ দু' জনেরই ভরসা। কিন্তু টীকায় দু-রকম হইয়া গিয়াছে। আমি অনেক

প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, অক্ষপাদের সূত্রগুলি শুদ্ধ মাত্র তর্কশাস্ত্র। আমরা উহাতে কিছু কিছু প্রক্ষেপ করিয়া উহাকে দর্শনশাস্ত্র করিয়া তুলিয়াছি। সে-সকল কথা এখানে আর পুনরুক্তি করিব না। উহাতে চারিটি প্রমাণের কথা আছে, সেকথাও পরে বলিব। এখানে এই মাত্র বলি যে, বাৎস্যায়ন ঐ সূত্রের টীকা লিখিলে দিঙ্‌নাগ উহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। আবার উদ্যোতকর ঐ ভাষ্যের বার্তিক লিখিয়া দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডন করেন। আবার বৌদ্ধেরা ঐ মত খণ্ডন করেন। আবার বাচস্পতি মিশ্র তাহার খণ্ডন করেন। এইরূপ বহুবার খণ্ডন-মণ্ডনের পর দুই সম্প্রদায়ের মত দুই রকম হইয়া গিয়াছে। দিঙ্‌নাগের মত চীন ও জাপানে খুব চলিতেছে। ভারতবর্ষে বাৎস্যায়নের মতই প্রবল।

তর্কশাস্ত্রের ইতিহাস অতি বিচিত্র। চাণক্যের সময় বোধ হয়, গোতমের সূত্র চলিত না। কারণ, আমরা অনুমান বলি ও অনুমান শব্দ প্রয়োগ করি। তিনিও অনুমান শব্দ প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু আমরা যাহাকে অনুমান বলি এবং যাহার জন্য অনুমান শব্দ প্রয়োগ করি, তাঁহার মতে তাহা সাদৃশ্যজন্যজ্ঞানজন্য জ্ঞান। গোতমসূত্র চলিত থাকিলে উনি এরূপ করিতে পারিতেন না। অশোকের সময় 'কথাবস্তু' নামে একখানি বৌদ্ধদের বিচারগ্রন্থ লেখা হয়। উহাতে বিচার করিয়া বৌদ্ধদের সমস্ত মত স্থাপন করা হয়। উহা উঁহাদের তৃতীয় সংগীতির সময় রচিত হয় এবং সমস্ত স্থবিরবাদের আচার্যগণ উহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। উহার বিচার-প্রণালী বিচিত্র। মুসলমান আমলে আদালতে যেমন জবাব, হদ্দজবাব, রদ্দজবাব চলিত ছিল, ইহা কতকটা সেইরূপ। একটা কথা উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক ফেকড়ি উঠিল, সব ফেকড়ি উদ্ধার করিয়া তবে মূলকথার বিচার হইল। মীমাংসকদের বিচার-প্রণালী আর-একরকম। ১. সন্দেহ। ২. বিষয়। তাহার পর পূর্বপক্ষ, তাহার পর উত্তর। তাহার পর নির্ণয়। এই পাঁচটির নাম অধিকরণ। কিন্তু মহাযানীরা ঠিক ইংরাজি সিলজিসম (syllogism) মতো কথা কহিত, উহাকে তাহারা প্রয়োগ কহিত, উহাতে বিচারটা বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইত।

বিচার-প্রণালী হইতেই প্রমাণের কথা উঠে—উভয় সম্প্রদায়ের প্রমাণাবলী বড়ো বিচিত্র। বুদ্ধদেব সাত রকম প্রমাণ মানিতেন। পৌরাণিকেরা আট রকম, কেহ কেহ প্রতিভা বলিয়া আর-একটা প্রমাণও মানিতেন। মীমাংসকেরা ছয়টি মানিতেন। গৌতম একদিকে আর নাগার্জুন আর-একদিকে; দু' জনেই প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শাব্দ এই চাররূপ প্রমাণ মানিতেন। বৈশেষিকেরা দুইটি মাত্র প্রমাণ মানেন বলিয়া কথা আছে। কিন্তু কণাদের পুথিতে আগাগোড়াই আগমের কথা আছে। কণাদ, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা বায়ু প্রমাণ করিতে অক্ষম হইয়া, আগমের উপর নির্ভর করিয়া বায়ু নামক পদার্থ স্থাপিত করিয়াছেন। আকাশের স্থাপন সেইরূপে। সুতরাং বলিতেই হইবে, তিনি আগমও মানিতেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ এই তিনটি প্রমাণই মানিয়া গিয়াছেন। চার্বাকেরাই কেবল প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ মানিতেন না।

নাগার্জুনের ও বর্তমান আকারে গোতমসূত্রের পর চারিটি প্রমাণই পণ্ডিতসমাজে আদর পায়। কিন্তু ইহার একশত বৎসর পরে মৈত্রেয় নামে একজন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক উপমান প্রমাণ স্বীকারের প্রয়োজন দেখেন না। তিনি তিনটি প্রমাণই যথেষ্ট মনে করিতেন। তাঁহারো এক শত বৎসর পরে দিঙ্‌নাগ নামে একজন বড়ো পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিলেন, শব্দও প্রমাণ হইতে পারে না। প্রমাণ দুই বৈ নয়—প্রত্যক্ষ আর অনুমান। একেবারে বর্তমান ইউরোপীয় লজিকের মতো হইয়া গেল perception and inference। অনুমান প্রমাণ হইলেই কিরূপে অনুমান করিতে হয়, তাহাতে কয়বার বাক্য-প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লইয়া বিবাদ হয়। এই বাক্য-প্রয়োগের নাম "অবয়ব"। গোতমের পূর্বে দশ রকম অবয়ব ছিল। বাৎস্যায়ন বলেন, গোতম প্রথম পাঁচটি অবয়ব উড়াইয়া দিয়া, পাঁচটি অবয়বের অনুমান সাজান। দিঙ্‌নাগ কিন্তু আর-দুইটি তুলিয়া দিলেন। বলিলেন, তিনেই যথেষ্ট। প্রতিজ্ঞা, হেতু আর উদাহরণ। প্রথমটিতে পক্ষ ও সাধ্য নির্দেশ, দ্বিতীয়টিতে হেতু নির্দেশ ও তৃতীয়টিতে সাধ্য ও হেতুর মধ্যে ব্যাপ্তি দেখানো। অবয়ব কম হওয়ায় বৌদ্ধদের বিচার-প্রণালী পরিষ্কার ও সংক্ষেপ হইয়া উঠিল। উহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা ভার হইয়া উঠিল। দিঙ্‌নাগের সংস্কৃত বই এতদিনের পর পাওয়া গিয়াছে ও ছাপা হইতেছে। ['ন্যায়প্রবেশ; G-O-S; No. 38, 39; Baroda 1930]। বইখানি ছাপা হইলে উহাতে আমাদের ও বৌদ্ধদের ন্যায়শাস্ত্র বুঝিবার খুব সুবিধা হইবে।

বৌদ্ধদের মেটাফিজিক্‌সের ইতিহাস আছে। বুদ্ধদেবকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, নির্বাণের পর কী থাকিবে? তিনি তাহার জবাব দিতেন না। যদি বা কিছু বলিতেন তো বলিতেন, সে কথায় তোমার কী? তুমি তো জন্ম-জরামরণের হাত হইতে এড়াইয়া গেলে, তোমার তো ত্রিতাপ নাশ হইল, সে-ই যথেষ্ট। শূন্য জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি তাহাই বলিতেন। ৫০০ বৎসর পরে অশ্বঘোষও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রধান উক্তি—

দীপো যথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্।।
কৃতী তথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্।।

কিন্তু তাহার পর একশত বা দেড় শত বৎসরের পর নাগার্জুন সাহস করিয়া নির্বাণ বা শূন্যের লক্ষণ করিলেন—"সদসৎ তদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং শূন্যম্।" উহা সৎও নয়, অসৎও নয়। দুয়ে জড়াইয়াও নয়, দুই ছাড়াও নয় অর্থাৎ উহা অনির্বচনীয়। শূন্যই

পরমার্থ, শূন্যই সত্য, শূন্যই বজ্র। শূন্যবাদ ক্রমে দুই ভাগ হইয়া গেল।

দৃঢ়ং সারমসৌশীর্য্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্।
অদাহি অবিনাশি চ শূন্যতা বজ্রমুচ্যতে।।

এই একদল বলিল, শূন্য ছাড়া আর-কিছুই নাই। উহার নাম অপ্রতিষ্ঠিতসর্বধর্ম। আর-একদল মায়োপমাদ্বৈতবাদ। শূন্য ছাড়া সব বস্তু মায়ার মতো। শংকরাচার্য ইহার সাত শত বৎসর পরে মায়াবাদ প্রচার করেন। সে মত বৈষ্ণবেরা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করিয়া নানাবিধ ভক্তিমত প্রচার করিলেন। বিষ্ণুস্বামী বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে বৈষ্ণব মত প্রচার করেন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত মত, মধ্বাচার্য দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রচার করেন। শংকরের উপর কিন্তু সকলরেই রাগ—তিনি প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ। শংকরের দুই-তিন বৎসর পরে উদয়নাচার্য সমস্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া, আমাদের দেশের ন্যায়মত দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিয়া যান। তিনি শূন্যবাদ খণ্ডন করেন, ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করেন ও অদৃষ্ট-সহকৃত ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া যান।

দর্শনশাস্ত্র অতি কঠিন, সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমার এতক্ষণ ধরিয়া দর্শনের চর্চাটা ভালো হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, উহা শেষ করিয়া উঠা কঠিন। তবে কালচারের কথা বলিতে গেলে দর্শনশাস্ত্রের কথাটা না বলা ভালো নয়।

বৌদ্ধের গোড়ায় দেশীয় ভাষায়ই বই লিখিতেন। আমরা এখন যাহাকে পালি বলি, উহাতে কত ভাষা আছে, তাহা বলা যায় না। প্রাচীন পুথিগুলির ভাষা প্রায়ই পৃথক্ পৃথক্। বৌদ্ধেরা আর-এক ভাষায় পুথি লিখিতেন, তাহার নাম মিশ্রভাষা ; উহার কতক সংস্কৃত কতক প্রাকৃত। এই ভাষায় অনেক বই আছে। গদ্যে এই লেখা, মাঝে মাঝে প্রমাণস্বরূপ পদ্য। পদ্য ও গদ্যের ভাষা একরূপ নহে, পদ্যের ভাষা পুরানো। ক্রমে গদ্য অংশ সংস্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। সে সংস্কৃত পড়িলেই মনে হইবে, এ 'মহাভাষ্যে'র ভাষা নয়, কোনো প্রাকৃতের তর্জমা মাত্র। এসব কথা আগে কেহ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নামে একখানি বই আছে, উহার গদ্যটা ঐরকম সংস্কৃত, আর পদ্যটা মিশ্র। নেপাল হইতে যে কয়খানি পুথি পাইয়াছি, সব ঐ রকম। কিন্তু তকলামাকান মরু খুড়িয়া যে 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকে'র প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সবটাই ঐ মিশ্র ভাষায় লেখা।

শেষ অবস্থায় বৌদ্ধেরা অনেকেই সংস্কৃত লিখিতেন। দার্শনিকেরা ভালো সংস্কৃতই লিখিতেন। তথাপি কুমারিল তাঁহাদের অব্যুৎপন্ন শব্দ, অশুদ্ধ শব্দ লইয়া বিশেষ বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা দার্শনিক ছিলেন না, তাঁহাদের সংস্কৃত বুঝাই যায় না। তাঁহারা বলিতেন, আমরা ব্রাহ্মণদের মতো সুশব্দবাদী নই, আমাদের অর্থ বোধ হইলেই হইল। আমরা পুংলিঙ্গ স্থানে স্ত্রীলিঙ্গ লিখিব, প্রথমা স্থানে সপ্তমী লিখিব, আত্মনেপদের স্থানে স্ত্রীলিঙ্গ লিখিব, প্রথমা স্থানে সপ্তমী লিখিব, আত্মনেপদের স্থানে পরস্মৈপদ লিখিব, একবচন স্থানে বহুবচন লিখিব, যাহা খুশি করিব, অর্থ বোধ হইলেই হইবে।

বৌদ্ধদের ভিতর একদল পাণিনির টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত বাঙ্ময় পাণিনির সূত্র হইতেই বাহির করিতে চান, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দেন। পাণিনির সূত্র ভালো করিয়া বুঝিতে গেলে ইঁহারাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি পাণিনির সমালোচনা করিয়াছেন, অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি দেখাইয়াছেন। ইঁহারা তাহা করেন না। লক্ষ্মণসেন বৈদিক সূত্রগুলি বাদ দিয়া একখানি ব্যাকরণ করিতে চান। তিনি সে ব্যাকরণের ভার দিয়াছিলেন একজন বৌদ্ধ-পণ্ডিতের উপর। তাঁহার নাম পুরুষোত্তম।

ভাস্কারাচার্য বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের জ্যোতিষ বিচিত্র। তাঁহারা মনে করেন, চন্দ্র সূর্য, গ্রহ তারা দুই প্রস্থ, জোড়াজোড়া আছে। আজ যাহারা উদয় হয়, কাল তাহারা আসে না, পরশু দিন তাহারা আবার আসিবে। হিন্দুদের কিন্তু এরূপ নাই। সেই গ্রহনক্ষত্রই রোজ উদয় হয়।

ধর্ম ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও হিন্দুর ভিতর যে ভেদ আছে, তাহা কিছু বলিলাম। এখন আহার বিহার, আচার ব্যবহারে তাঁহাদের যে ভেদ আছে, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব। হিন্দুদের আহারের ব্যবস্থা চারায়ণ ঋষি করিয়া গিয়াছেন। লোকে পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ভোজন করিবে। কেহ কেহ বলেন, অপরাহ্নে না হইয়া সন্ধ্যার পর ভোজন করিবে। ইহা ছাড়াও সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাতঃকালে অনেকে একটা প্রাতরাশ করিয়া থাকিতেন। তাহার আর-একটা নাম ছিল কল্যবর্ত। ক্রমে এতবার খাওয়া উঠিয়া গিয়া একবার দিনে ও একবার রাত্রে খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এক সূর্যতে দুইবার খাইতে নাই। এ খাওয়ার মানে আচমনীয় দ্রব্য, অর্থাৎ যাহা খাইয়া আচমন করিতে হয়, অর্থাৎ মুখ ধুইতে হয় ; কিন্তু উহার এখন একটা পারিভাষিক অর্থ হইয়াছে। পাণিফলের জিলিপি, পাণিফলের কচুরি, এগুলিও ফলাহারের মধ্যে গণ্য হইয়াছে ; যখন তখন খাওয়া যায়। খাইয়া মুখ না ধুইলেও চলে।

বৌদ্ধদের খাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু আর-একরকম। তাঁহারা একবার খাইবেন ; বারোটার আগে সে খাওয়াটি হইয়া যাওয়া চাই। খাইতে খাইতে যদি বারোটা বাজে, অমনি উঠিয়া যাইতে হইবে। ছায়াটা দু' আঙুল পূর্বে হেলা পর্যন্ত সময়ে খাইতে চাহিয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধদের ভিতর ঘোর দলাদলি হইয়া যায়। অনেকে বারোটার পূর্বেও একটু আধটু জলযোগ করিতেন। বারোটার পর কিন্তু তরল পদার্থ ভিন্ন আর-কিছুই খাইবার নিয়ম ছিল না। তরল পদার্থ যথা—নারিকেলের জল, ফলের রস ইত্যাদি। দক্ষিণ দেশের বৌদ্ধেরা অর্থাৎ সিংহল, বর্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধেরা এখনো এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু উভয়ের বৌদ্ধেরা, গোড়াগুড়িই খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে একটু শিথিল ছিলেন। তাই নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ বৌদ্ধদের ভিতর ঝগড়া, তাই নিয়েই দলাদলি। ক্রমে যখন মহাযান মত প্রবল হইল, তখন খাওয়া দাওয়ার বাঁধাবাঁধিটা একেবারে উঠিয়া গেল। এখনকার

নেপালি ও তিব্বতি বৌদ্ধদের সম্বন্ধে একজন ইংরাজ বলিয়াছেন, সকল ধর্মেই আছে, fast and worship—এদের দেশে কিন্তু feast and worship ; না খাইয়া তাহারা কিছু করে না। আর আমাদের বাংলার ব্রাহ্মণদের "ভুক্তা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ"—আহার করিয়া কোনোরূপ ধর্ম কর্ম করিবে না; ভিক্ষুককে ভিক্ষামুঠাও দিবে না।

উপবাস॥

উপবাস শব্দের অর্থ কী? উপ উপসর্গ ও বস্ ধাতু। এ থেকে 'না খাওয়া' হল কেমন করে? এ সম্বন্ধে 'শতপথ-ব্রাহ্মণে' লেখা আছে যে, যজমান যেমন যজ্ঞ করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন অর্থাৎ যজ্ঞশালা বাঁধিলেন, দেবতারা অমনি রাত্রে আসিয়া সে যজ্ঞশালার নিকটে ঘুরিতে লাগিলেন। যজ্ঞশালার নিকটে দেবতারা বাস করেন বলিয়া তাহার নাম হইল উপবাস। তার পর দিন এই-সকল দেবতা অতিথিকে না খাওয়াইয়া যজমান খাইতে পারে কিনা, ইহা লইয়া বিচার উঠিল। একদল বলিলেন, "অনশন", আর-একদল বলিলেন, না, কিছু খাইতে হইবে। শেষের মত প্রবল হইল, অল্পবিস্তর বৃক্ষের ফল খাইতে পারিবে, কিন্তু সে পেট ভরিয়া খাইলে হইবে না। পিতৃকৃত্য করিতে গেলে কিন্তু একেবারেই খাইতে পারিবে না। আমাদের দেশে কিন্তু এ বিষয়ে বড়োই কড়াকড়ি। ভট্টাচার্য মহাশয়েরা সর্বদাই বলেন, "ভুক্তা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ।" বৈষ্ণবেরা কিন্তু কিছু আহার না করিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন না। তান্ত্রিকেরাও তাই করেন। স্মার্ত পঞ্চোপাসক কিন্তু কড়াকড়ি করিয়া "ভুক্তা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ" করেন।

বৌদ্ধেরা অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপবাস করেন। প্রথম প্রথম উহার নাম ছিল—উপোসথ, পোসধ। জৈনেরা কিন্তু তাহাও ছাড়িয়া দিয়া শুধু 'পো' করিয়াছেন। ঐ দিন তাঁহারা না খাইয়া বিহারে যাইতেন ও বৈকাল বেলাটা ধর্মকথা শুনিয়া কাটাইতেন। বারব্রত ইত্যাদিতে উত্তরের বৌদ্ধেরা বড়ো উপবাস করেন না। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনো নিয়ম নাই। আমরা যেমন অনেক বাছিয়া গুছিয়া খাই, তাঁহারা তেমন করেন না। যে বুদ্ধের অহিংসা প্রধান কথা, তাঁহার শিষ্যেরা এখন মাংস খাইতে কোনোরূপ দ্বিধাই করেন না। তবে অনেকে নিরামিষ ব্রত করিয়া থাকেন। চীনেরা আমিষ বলিয়া দুধ ঘি-ও খায় না। তাহারা উহাকে animal food বলে। পেঁয়াজ রসুনে বৌদ্ধদের কিছুমাত্র দ্বিধা নেই। মদেও তাহাদের আপত্তি নাই। আমার বন্ধু ইন্দ্রানন্দ বলিতেন, যে যত বড়ো পণ্ডিত হইবে, সে তত বেশি মদ খাইবে।

ক্ষৌরকার্য॥

প্রাচীনকালে হিন্দুরা কামাইতে হইলে দুজন নাপিত রাখিতেন; একজন নাভির উর্ধ্বটা কামাইত—আর একজন অধঃটা কামাইত। যে উপরের দিকটা কামাইত, সে আচরণীয় হইত, যে নিচের দিকটা কামাইত, সে অনাচরণীয় হইত। বাৎস্যায়ন 'কামসুত্র'

বলেন, দাড়ি ও গোঁপ কামানো চতুর্থ দিনে করিতে হয়, নখ কাটাও তাই। অধোদেশ উৎপাটন করিয়া কামাইলে দশ দিন, না হলে পাঁচ দিন। উরত কামাইতে হইলে ফেনা ব্যবহার করিতে হইত। সন্ন্যাসীদের ও স্ত্রীলোকদের বগল কামাইতে নাই। সন্ন্যাসীদের অধোলোম কামাইতে নাই। মাথার সব চুল রাখা সেকালে পুরুষের মধ্যেও চলিয়াছিল। এখনো দক্ষিণ দেশে পুরুষেরা সব চুল রাখে ও বিনুনি করিয়া খোঁপা কাটে। মাথাটি ওল করিয়া কামাইয়া মধ্যে খুব বড়ো রকমের টিকি রাখা আর্যাবর্তে চলিয়াছিল— সন্ন্যাসীরাই কেবল সমস্ত মাথাটা কামাইতেন, শিখা পর্যন্তও রাখিতেন না।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা মাথাটি তল করিয়া কামাইতেন, তাঁহারা মাথার চুল পনেরো দিনের বেশি রাখিতে পারিতেন না। নয় দিনের মধ্যেই কামাইতে হইত। যেখানে যেখানে বৌদ্ধ-মঠের ঢিপি পাওয়া গিয়াছে, সেখানে সেখানেই অনেক খুর পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, বৌদ্ধেরা নিজে নিজেই কামাইতেন। অনেকেই শরীরের সমস্ত লোম কামাইয়া ফেলিতেন। গৃহস্থ বৌদ্ধদের গ্রাম্য নাপিতেরাই কামাইত। হয়তো ভিক্ষুদেরও কামাইত। কিন্তু বিহারে মেলা খুর পাওয়ায় সে বিষয়েও একটু সন্দেহ হইয়াছে। নাপিতেরা পাটনি, চন্ডাল, মুচি, হাড়ি প্রভৃতি অনেক জাতিকেই কামাইত না। এইসব জাতির নিজের জাতির মধ্যেই নাপিত থাকিত। তাহারাই আপনাদের জাতিদের মধ্যেই কামাইত। গ্রাম্য নাপিতেরা মুসলমানদের কামাইত; এমন-কি, তাহাদের পায়ের নখ কাটিতেও আপত্তি করিত না। কিন্তু এই-সকল জাতিকে তাহারা কখনোই কামাইতে যায় না। অনেক সময় মজা হয়। একজন মুচি যদি মুসলমান হয়, গ্রাম্য নাপিতেরা তাহাকে কামাইবে; কিন্তু যদি সেই মুচি ভেক লইয়া বৈষ্ণব হয় তো তাহাকে কামাইবে না। হাড়িদের নাপিত নাই। তাহারা নিজে নিজেই কামায়। সেজন্য আমাদের দেশে একটা কথা আছে, হাড়ির খুরে তোকে কামাইয়া দিব, অর্থাৎ তোকে একেবারে অনাচরণীয়, অব্যবহার্য করিয়া দিব, অর্থাৎ কোনো নাপিত তোকে কামাইবে না।

বিছানা।।

হিন্দুরা অতি প্রাচীন কাল হইতে চারপাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। চারপাইয়ের নাম আসন্দী। দড়ির ছাওয়া, বাঁশের বা কাঠের চার-পা; ক্রমে খাট-পালং, তক্তপোষ প্রভৃতি নানারূপ শয্যাধার চলিতে লাগিল। এমন-কি, আমরা এখন শ্রাদ্ধের দানেও একখানা খাট, একখানা তক্তপোষ, অন্তত একখানা পিঁড়িও দিয়া থাকি। বৌদ্ধেরা কিন্তু উচ্চাসন এবং মহাসন একেবারেই বর্জন করেন। উচ্চাসন বর্জন করিলে তাঁহার খাট, পালং ও চৌকি, চারপাই চলে না। মাটিতে মাদুর বিছাইয়া শুইতে হয়। মহাসন ত্যাগ করায় গদি, তোশক, বিছানার চাদর, তাকিয়া, গিদ্ধে, বালিশ, পাশ-বালিশ, গাল-বালিশ,

পা-বালিশ, সব ত্যাগ করিতে হয়। বড্ড বড়োমানুষি করো, একখানি কার্পেটের উপর শুইয়া থাকো, না-হয় গালিচা কাঁথাই তাঁহাদের বেশি সম্বল। বিচিত্র বিচিত্র কারিকরি করা কাঁথা, ফুল-তোলা কাঁথা বৌদ্ধদের জন্য হইয়াছিল বোধ হয়। এখনো অনেক জাতীয় সন্ন্যাসীর কাঁথাই সম্বল।

পোশাক।।

বেদের সময় ব্রাহ্মণরা মাথায় একটা পাগড়ি দিতেন। এখনো কোনো বৈদিক কার্য করিতে গেলে একটা উষ্ণীষ লইতে হয়। তাঁহারা জুতাও ব্যবহার করিতেন। উপানহ না হইলে তাঁহাদের চলিত না। একখানা ধুতি ও একখানা চাদর থাকিত। তাহার উপর উপবীতও থাকিত। এখন তো উপবীত, কয়েক খেই কাপাশের সুতা হইয়াছে, কিন্তু পইতার সময় চামড়ার পইতা ব্যবহার করিবার কথা আছে। চামড়া পাওয়া যায় না বলিয়া অন্তত একটুকরাও কালসারের চামড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। আগে বোধ হয়, একখানা চামড়া দিয়া গাটা ঢাকিয়া রাখিতেন। জামা বোধ হয় থাকিত না। কারণ, সেলাই করা কাপড় লইয়া কোনো ধর্মকর্ম করিবার বিধি নাই।

বৌদ্ধদের কিন্তু এক ধুতি আর এক চাদর। এ ছাড়া আর কোনো পোশাকের কথা শোনা যায় না। চাদরখানা এক কাঁধে ফেলিয়া আর-কাঁধ হইতে খুলিয়া রাখা হইত। সে কাপড় ও উত্তরীয় আবার খুব সেলাই করা হইত। সেলাইয়ে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। সে কাপড়ও তাঁহারা সর্বদা যে পরিষ্কার রাখিতেন, এমন নহে কিন্তু ছোপাইয়া পরিতেন। কী দিয়া ছোপানো হইত, ঠিক জানা যায় না। কখনো কখনো বলে কাষায় বস্ত্র, কখনো বলে রক্ত বস্ত্র। রাঙা রঙ দিয়া ছোপাইতেন, কি কাষায় রঙ দিয়া ছোপাইতেন, অথবা হয় তো দুই রঙকেই তাঁহারা রক্ত বলিতেন। তবে দেশের নিয়মানুসারে তাঁহারা যে জামা বা চৌবন্দি ব্যবহার করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নেপালি বৌদ্ধেরা নেপালি গৃহস্থের মতোই কাপড় পরেন। তবে নেপালে এখন বিহারও নাই, মঠও নাই। যাঁহারা বিহারে বাস করেন, তাঁহারা যদিও আপনাদিগকে ভিক্ষু বলেন, তথাপি বিবাহ করেন ও ছেলেপিলে লইয়া সংসার করেন।

স্নান।।

ব্রাহ্মণদের অতি প্রাচীন কাল হইতেই নানা রকম স্নানের ব্যবস্থা আছে—ভস্মস্নান, গোময়স্নান, ঘৃতস্নান, দুগ্ধস্নান, দধিস্নান, অবগাহন স্নান, শিখামজ্জন স্নান, উষ্ণজলে স্নান, তোলাজলে স্নান। বৌদ্ধদের ভিতর এতরূপ স্নান ছিল না। হিন্দুরাও যে এত রকম স্নান সর্বদাই করিতেন, তা নয়, যজ্ঞে ব্রতী হইবার পূর্বে যজমানকে এরূপ স্নান করাইতেন, অভিষেকের পূর্বে রাজাকে এরূপ স্নান করাইতেন, অন্য সময় অবগাহন স্নানই প্রায় করিতেন। না পারিলে মাথা ধুইয়া ফেলিতেন। অথবা গা ধুইয়া ফেলিতেন।

বিবাহের সময় বরকন্যাকে তোলাজলে স্নান করাইতেন। বৌদ্ধদের স্নান জলে জলেই হইত, ভস্মাদির স্নান সম্বন্ধে বড়ো শুনা যায় না। কিন্তু স্নানের সময় তাঁহারা মন্ত্র পড়িতেন, "যথা হি জাতমাত্রেণ স্নাপিতাঃ সর্ব্বতথাগতাঃ। তথাহং স্নাপয়িষ্যামি শুদ্ধং দিব্যেন বাব্রিণা।। ওঁ সর্ব্বতথাগতাভিষেকসময়ম্প্রিয়ে হ্রীং হ্রীং।"

মুখ ধোওয়া।।

ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশ স্থানেই দাঁতন করিতেন। দাঁতনের কাঠি হয় আট আঙুল, না-হয় বারো আঙুল থাকিত। কিন্তু শ্রাদ্ধাদির সময় তাঁহারা দাঁতন করিতেন না, পাছে দাঁত দিয়া রক্ত পড়িয়া ক্ষতাশৌচ হয়। ক্ষতাশৌচ হইলে শ্রাদ্ধাদিতে অধিকার থাকে না, সেজন্য শ্রাদ্ধের দিন ১২টা কুলকোচা করিয়া মুখ ধোওয়া ব্যবস্থা করা আছে। মাজনে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। অনেক জিনিস দিয়া তাঁহারা মাজন তৈরি করিতেন। কিন্তু তর্জনী অঙ্গুলি দিয়া দাঁত মাজা অত্যন্ত নিষেধ। মধ্যমা আঙুলি দিয়া দাঁত মাজাই খুব প্রশস্ত। কারণ, অঙ্গুলির মধ্যে উহাই সর্বাপেক্ষা কমজোর। উহা দিয়া ঘষিলে দাঁতে চাড় লাগে না। তর্জনী দিয়া ঘষিলে চাড় লাগে ও উহাতে বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। দাঁতন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা অনেক গাছ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সকল স্মৃতির পুস্তকেই কোন্ কোন্ কাঠে দাঁতন করিতে হয় এবং কোন্ কোন্ কাঠে দাঁতন করিতে নাই, তাহার লম্বা ফর্দ আছে। যে কাঠ নরম, অনায়াসে চিবাইয়া তুলি করা যায়, তাহাই প্রশস্ত। বেশি বয়সে দাঁত পড়িয়া গেলে দাঁতন ছেঁচিয়া দাঁত পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। যে-সব গাছে কষ আছে, সেই গাছের ডালেই ভালো দাঁতন হয়, তাহাতে দাঁতের গোড়াও শক্ত হয়।

বৌদ্ধেরা দাঁতনি করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের দাঁতন প্রায়ই বারো আঙুল হইত। আট আঙুল দাঁতন তাঁহারা বড়ো ব্যবহার করিতেন না। দাঁতন বারো আঙুল হইলে উহা দ্বারা জিব-ছোলারও কাজ করিতে পারা যায়। বৌদ্ধেরা ধাতুদ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। কাজেই তাঁহাদের ধাতুনির্মিত জিবছোলা থাকিত না। সুতরাং তাঁহারা বারো আঙুল দাঁতনই পছন্দ করিতেন। আট আঙুল দাঁতন দিয়া জিব ছুলিতে গেলে দাঁতে আঙুল লাগিত এবং কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। মাজন দিয়া দাঁতন করিলে প্রায় দাঁতে পাথুরি হয়। মাড়ি ও দাঁতের মধ্যে একটা পাথরের মতন শক্ত জিনিস জন্মিয়া মাড়িকে আলগা করিয়া দেয়। সেজন্য মাজনটা সেকালে দন্তরোগ ব্যতিরেকে বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ, কেহই ব্যবহার করিতে চাহিতেন না। দাঁতন করিতে গেলে দাঁতনটি বার বার ধুইতে হইত; একবার মুখ হইতে বাহির করিলেই তাহা ধুইয়া আবার ব্যবহার করিতে হইত। ইৎসিং-এর পুস্তকে আমরা পড়ি যে, চীনেরা আমাদের কাছ থেকে দাঁতন করা শিখিয়াছিল। কিন্তু আমরা এখন দাঁতন করাটা অসভ্যতা বলিয়া মনে করি। দাঁতন

নিত্য নূতন হওয়ার কথা ছিল! না পাইলে একদিন কাটিয়া পাঁচ দিন ব্যবহারও চলিত।

মুখ ধোওয়ার সংস্কৃত নাম আচমন। আচমনে তিনবার জল মুখের মধ্যে দিতে হয়। তারপর দুইবার ওষ্ঠ ও অধর স্পর্শ করিতে হয়। তাহার পর চক্ষু কর্ণ নাসিকা স্পর্শ করিতে হয় অর্থাৎ ঐগুলি ধুইতে হয়। ততকরগুপ্ত বলেন, দাঁতন করিবার সময় মন্ত্র পড়িতে হয়, "ওঁ নমো রত্নত্রয়ায়, নমো হারিত্যৈ, মহাযক্ষিণ্যৈ, অন্নে পানে ফুঃ স্বাহা।"

কাপড়কাচা ও তেলমাখা।।

ধোবা বা রজকে ব্রাহ্মণের কাপড় কাচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা নিজ হাতে রোজই কাপড় ধুইয়া ফেলিতেন। ছেঁড়া কাপড় অথবা ময়লা কাপড় পরা তাঁহাদের নিষেধ ছিল। কয়দিন অন্তর তাঁহারা কাপড় ধোবাবাড়ি দিতেন, তাহা জানা যায় না। তবে রোজ কাপড় কাচায় তাঁহাদের কাপড় শীঘ্র ময়লা হইত না। বৌদ্ধেরা কিন্তু তাঁহাদের কাপড় ধোবাবাড়ি দিতেন, একথা শুনা যায় না। কিন্তু স্নানের পর যে রোজ তাঁহারা কাপড় কাচিতেন, সেটা ঠিক। নিজের হাতে কাপড়খানি নিঙড়াইয়া শুকাইয়া লইতেন। ব্রাহ্মণেরা গামছা ব্যবহার করিতেন এবং তেলও মাখিতেন। বৌদ্ধেরা তেল মাখিতেন ও গামছা ব্যবহার.করিতেন কিনা, কোনো পুস্তকে দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মণদের অভ্যঞ্জন অর্থাৎ স্নানের পূর্বে মাখিবার অনেক জিনিস ছিল। আমলকীবাটা তাহাদের মধ্যে একটা। তাঁহারা ঐ দ্রব্য একদিন তৈরি করিয়া দুই তিন দিন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু অনেক ধর্মকর্মের সময় তাঁহারা অভ্যঞ্জন স্নান করিতেন না। স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রীলোকেরা রুক্ষস্নান করিতেন।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের মঠে পাইখানা থাকিত। পাইখানার ভিতর কলসিভরা জল থাকিত ও একটি ছোট পাত্র (কুন্ডি) থাকিত। পাইখানার ভিতর দেয়ালে একটা ডান্ডা গোঁজা থাকিত। ভিক্ষুরা সেইখানে কাপড় রাখিতেন। তাঁহারা সেখানে তিনটি মাটির গুলি লইয়া যাইতেন। কার্য শেষ হইলে দুইটি গুলির দ্বারা দুইবার শৌচ করিতেন। আর তৃতীয়টি দ্বারা বাঁ হাতটি ধুইয়া ফেলিতেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া সেখানে একখানা ইটের উপর পনেরোটি গুলি সাজানো থাকিত। সাতটি দ্বারা সাতবার বাঁ হাত ধুইতেন আর সাতটি দ্বারা সাতবার দুই হাত ধুইতেন। অবশিষ্টটির দ্বারা জলপাত্র, বাহু, তলপেট এবং পা ধুইয়া ফেলতেন। তাহার পর তথা হইতে বাহির হইয়া আসিতেন। ততকরগুপ্ত তাঁহার 'আদিকর্ম্মরচনা'য় বলিয়াছেন—

"রত্নত্রয়শরণগতানাং বৌদ্ধানাং প্রত্যূষমাদায় বর্চ্চোমূত্রকরণাদি যা যা শিক্ষোক্তা ভগবতা বিনয়াদিসু সামান্যেন সা সর্ব্বা উচ্যতে। তথা চ—

কুর্য্যাৎ কৃত্যাং গূঢ়াং প্রাতঃ বর্চ্চপ্রস্রাবকর্ম্মকম্।
ততোঽপি বহুভিশ্চৈব মৃদ্ভিঃ প্রক্ষালয়েৎ গুদম।।

বামে পাণৌ ততঃ সপ্ত বিহিতা শুদ্ধয়ে মৃদঃ।
উভয়োরপি সপ্তৈব পৃথক্ পৃথগবস্থিতাঃ।।
ইতি হস্তাদি যত্নেন ক্ষালয়েৎ বহুনাম্বুনা।
শারীপুত্রাদিয়ং শিক্ষা দুষ্কৃতাত্ত্বন্যথা ভবেৎ।।"

তাহা হইলে বোধ হইতেছে যে, শারীপুত্রের সময় হইতেই ইৎসিং ও ততকরগুপ্তের সময় পর্যন্ত একই শিক্ষা চলিয়া আসিতেছিল। হিন্দুদের কিন্তু ব্যাপার অন্যরূপ। তাঁহাদের পাইখানার ব্যবস্থা ছিল না। নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, সেখান হইতে তীর ছুঁড়িলে যেখানে গিয়া পড়ে, সেখানে তাঁহারা শৌচ করিতে যাইতেন। শৌচ কার্যটা জলের দ্বাবা সাধিত হইত। তাঁহারা দুই হাতেই হাতমাটি করিতেন। কিন্তু যতক্ষণ তৈল ও গন্ধ দূর না হইত, ততক্ষণে হাতে মাটি করিতে ছাড়িতেন না। অন্তত বারো বার হাতে মাটি কবিতেন। এখনকার লোকের মতন মাটিতে বাঁ হাত ঘষিয়াই কাজ সারিতেন না। স্মৃতিতে যদিও পাইখানার নাম পাওয়া যায় না, অশোক রাজার পাইখানা ছিল। তিনি সেখানেও রাজকার্য করিতেন। বল্লালসেনেরও পায়ুক্ষালনমন্দির ও স্বেদাগার ছিল। প্রস্রাব করিয়া জল নেওয়া উভয় পক্ষেরই বিধি ছিল।

ব্রাহ্মণেরা ঘুম ভাঙিলেই ঠাকুর দেবতার নাম করিয়া উঠেন, অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।

বৌদ্ধেরা প্রাতঃকালে উঠিয়াই "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" ও এই সম্বন্ধীয় অনেকগুলি গাথা পাঠ করেন।

দিনের কাজে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের যে ভেদ, তাহা দেখাইলাম। এখন উভয়ের সংস্কারগুলি দেখাইব। হিন্দুদের দশবিধ সংস্কার—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। এখনকার নেপালি বৌদ্ধদের দুইটি মাত্র সংস্কার। একটি পাঁচ বছরে, তাহার নাম ভিক্ষু হওয়া। আর একটি ১৭ বৎসরে—তাহার নাম বজ্রাচার্য বা গুভাজু হওয়া। আমাদের সংস্কারের মানে যে, আমরা প্রথম যে কার্যটি করিব, সেটি মন্ত্রপূত করিয়া করিব। কোনো সংস্কার করিতে হইলে গণপতি পূজন, গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা, অয়ষ্য-মন্ত্র জপ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া, কুশণ্ডিকা বা বহ্নিস্থাপন করিতে হয়। সেই মন্ত্রপূত বহ্নিকে সাক্ষী করিয়া তাঁহারা প্রথম কার্যটি করিয়া থাকেন। গর্ভাধানও তাই, পুংসবনও তাই, সীমন্তোন্নয়নও তাই, বরাবরই তাই। কার্যটি যখন করি, তখন মন্ত্র পাঠ করি।

গর্ভাধানের অর্থ বলিয়া দিতে হইবে না। পুংসবনের অর্থ এই যে, সাত মাস গর্ভের সময়—যখন গর্ভস্থ শিশুর পুরুষ বা স্ত্রীচিহ্ন প্রকট হইবার সময় হয়, সেই সময় স্বামী গৌর্যাদি পূজা করিয়া, প্রাতঃকালে গ্রামের ঈশান কোণে যে বটগাছ থাকে, তাহারই ঈশান কোণে কোনো সুঁয়ার ঠিক নিচে দুটি ফল ধরিয়াছে দেখিয়া, ফলসুদ্ধ সেই সুঁয়াটি কাটিয়া, মাটিতে না ছোঁয়াইয়া, সেইটি বাড়িতে আনেন—আনিয়া এমন উঁচু জায়গায় রাখিয়া দেন, যেন মাটি না স্পর্শ করিতে পারে। তাহার পর কোনো কোনো জিঁয়াচ পোয়াতি আসিয়া সেটি বাঁটিয়া দিলে স্বামী অগ্নির সমীপে স্ত্রীর পিছনে দাঁড়াইয়া, সেই বাটা বটের সুঁয়া প্রথমে তাহার ডান নাকে ও তৎপর তাহার বাঁ নাকে শোঁকান। সংস্কার, এই কাজ করিলেই পুত্রসন্তান হইবে। জাতকর্মেও এইরূপ নাড়িচ্ছেদের পূর্বে বহ্নিস্থাপনান্ত সমস্ত কার্য করিতে হয়। তাহার পর নাড়িচ্ছেদ। কিন্তু ইহাতে প্রায়ই বিলম্ব হওয়া প্রযুক্ত নাড়ি মোটা হইয়া যায়, ছেদেও কষ্ট হয়—বালকেরও প্রাণনাশ হয়। তাই নাড়িচ্ছেদের পর এসব কার্য হয়। যখন ব্রাহ্মণেরা অগ্নিহোত্রী ছিলেন, অর্থাৎ বাড়িতে অগ্নিশালা থাকিত এবং সেখানে গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়, এই তিন প্রকার আগুন থাকিত, তখন এ-সকল দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া বহ্নিস্থাপন পর্যন্ত তাঁহাদের করাই থাকিত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বাঁশের চেঁচাড়ি মন্ত্রপূত করিয়া, সেই অগ্নিতে তাতাইয়া অবিলম্বেই নাড়িচ্ছেদ করা হইত। যতদিন ব্রাহ্মণেরা সাগ্নিক ছিলেন অর্থাৎ এক অগ্নি রক্ষা করিতেন, তাঁহাদেরও এ দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। এ-সকল দুর্ভোগ শুধু নিরগ্নিক হইয়াছি বলিয়াই ভুগিতে হয়। নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণও ঠিক এইরূপ সংস্কার। বহ্নিস্থাপন পর্যন্ত করিয়া, সেই বহ্নির সম্মুখে বসিয়া, মন্ত্র পড়িয়া করিতে হয়। এক উপনয়নের মধ্যে আমরা চারিটা সংস্কার সারিয়া লই। উপনয়ন মানে ছেলেকে গুরুর কাছে লইয়া যাওয়া। গুরু তাহাকে প্রথমে সাবিত্রী উপদেশ দেন—দিন কতক পরে তাহার বেদারম্ভ হয়। বহুকাল পরে তাহার বেদপাঠ সমাপ্ত হইলে তাহার সমাবর্তন হয়, অর্থাৎ সে আবার ঘরে ফিরিয়া আসে। আমরা কিন্তু এই চারিটি সংস্কারকেই এক উপনযন নাম দিয়া ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে সারিয়া দিই। বিবাহও এইরূপই সংস্কার। বিবাহ শব্দের আসল মানে—বৌটিকে পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে বহিয়া লইয়া যাওয়া। কন্যাদান, স্ত্রী-আচার, কুশণ্ডিকা, লাজাহোম, অরুন্ধতী দর্শন—এ-সকলগুলিই বিবাহটিকে সংস্কার করিবার জন্য, উহাকে মন্ত্রপূত করিয়া পবিত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য। নেপালি বৌদ্ধদের মধ্যে এত সব সংস্কার কিছুই নাই। উহাদের একটা সংস্কার আছে গর্ভপরিহার, অর্থাৎ সুপ্রসব হইবে, তাহার জন্য প্রার্থনা। তাহার পর ছেলে ৫/৬ বৎসর হইলে, সে যে বিহারের ছেলে, সেই বিহারের যিনি সর্বাপেক্ষা বয়সে বড়ো ভিক্ষু, তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে হয়। সে বলে, আমি ভিক্ষু হইব। বুড়াটি বলেন, তুমি হইও না, বড়ো কষ্ট

করিতে হয়—বড়ো বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, তুমি ও কাজ পারিবে না, তুমি ছেলে মানুষ। সে বলে, আমি নিশ্চয়ই করিব, নিশ্চয়ই পারিব, আমি শাক্যপুত্র—আমি পারিব না কেন? বুড়াটি তখন একখানি রূপার খুর বাহির করিয়া, তাহার মাথাটি মুড়াইয়া দেন, আপনার কাছে রাখেন ও হবিষ্য খাওয়ান। পাঁচ-সাতদিন হবিষ্য খাইবার পর সে বলে, মহাশয়, আমি আর পারি না, আমি মা-র কাছে যাব। বুড়া তাহাকে আবার বুঝান, তোমার যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু সে কিছুতেই মানে না। তখন তাহাকে একটু মদ ও শূকরের মাংস খাওয়াইয়া মায়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এখান থেকেই সে ভিক্ষু হয়, ঠাকুরঘরে যেতে পারে, ঠাকুর ছুঁতে পারে, পুষ্পপাত্রে ফুল সাজাইতে পারে ও পূজার আয়োজন করিয়া দিতে পারে। ইহার পর তাহার আর-এক সংস্কার আছে—সেটা সতেরো বছরে সময়। যদি সে সতেরো বছরের মধ্যে একেবারে স্ত্রী-সংসর্গ না করে, তাহা হইলে তাহাকে আবার মাথা মুড়াইয়া কতগুলি মন্ত্র পড়িতে হয়, তাহা হইলে সে বজ্রাচার্য বা গুভাজু হয়। সে তখন ঠাকুরঘরে পূজার অধিকারী হয়, তাহার পাঁচটি অভিষেক হয়—মুকুটাভিষেক, ঘন্টাভিষেক, মন্ত্রাভিষেক, সুরাভিষেক, পট্টাভিষেক। তখন সে পুরা বজ্রাচার্য হয় এবং সকল প্রকার ধর্মকার্যেই তাহার অধিকার হয়। কিন্তু যদি সতেরো বছরের আগে স্ত্রী-সংসর্গ করে, তাহা হইলে সে কখনো বজ্রাচার্য হইতে পারে না, তাহার বংশও ভিক্ষু থাকিয়া যায়। উহাদের বিবাহ সংস্কার নহে। বিবাহ মানে শক্তিগ্রহণ, অর্থাৎ যোগমার্গে ও জ্ঞানমার্গে যাইবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করা। মোটামুটি ভিক্ষুদের বিবাহ আগে একটা গাছের সঙ্গে হয় অথবা ফলের সঙ্গে হয়। তাহার পর সে যাহাকে শক্তিবলিয়া গ্রহণ করে, তাহারই সঙ্গে থাকে, স্ত্রীপুরুষের ন্যায় থাকে; ছেলেপুলে হয়, গৃহস্থালি করে। দুই প্রকার বিবাহের বা শক্তি-গ্রহণের প্রণালী আমি পাইয়াছি—একটি তো ভদ্রসমাজে প্রকাশ করিবার মতো নহে। বৌদ্ধেরা কিন্তু বলে, এসব কেতাবি কথা, কাজের নয়; আমাদের আসল শক্তিগ্রহণ ওরূপ নয়।

এই তো গেল নেপালি ভিক্ষুদের কথা—ইহারা সব গৃহস্থ হইয়া গিয়াছে, একটিও আসল সন্ন্যাসী নাই। শেষ আসল ভিক্ষু একশত বৎসরের উপর হইল মরিয়া গিয়াছেন—তাঁহার পর সবই এক হইয়া গিয়াছে। ভিক্ষুর ছেলে ভিক্ষু হয়—বজ্রাচার্যের ছেলে বজ্রাচার্য হয়, কিন্তু বৌদ্ধদের আসল বজ্রাচার্য অনেক উচ্চে। যে কেহ বৌদ্ধ হইবে—গৃহস্থই হউক, ভিক্ষুই হউক, তাহাকে প্রথম পঞ্চ শীল গ্রহণ করিতে হইত। আমি প্রাণিহিংসা করিব না, না দিলে পরের জিনিস লইব না, ব্রহ্মচর্য খন্ডন করিব না, মিথ্যা কথা বলিব না, সুরা, মৈরেয় ও মদ্য পান করিব না। যাহারা এই-সকল শীল গ্রহণ করিয়া অভ্যস্ত হইয়া যাইত, তাহাদিগকে আরো তিনটি শীল দেওয়া হইত—কটুবাক্য বলিব না, গান-বাজনা করিব না, স্রক্‌চন্দনাদি ব্যবহার করিব না। গৃহস্থেরা

কিন্তু ইহার অধিক শীল লইতে পারিবে না। ইহার অধিক আর দুইটি শীল শুধু ভিক্ষুদের জন্য—একটি উচ্চাসন ও মহাসন ত্যাগ ও একটি রজতকাঞ্চন ত্যাগ, স্থবিরবাদে, অর্থাৎ দক্ষিণী বৌদ্ধদের শেষ ও চরম; কিন্তু উত্তর দেশের বৌদ্ধদের ইহার উপরও কিছু আছে। তাঁহারা শীলকে সম্বল বলেন—এই দশটা শীল তাঁহারা অষ্ট সম্বল করিয়া তুলিয়াছেন; নবম সম্বলের নাম বোধিসত্ত্বসম্বল।

ততকরগুপ্ত রত্নত্রয় শরণের কথা বলিয়া বলিতেছেন, "অনেনৈব রত্নত্রয়শরণেন বৌদ্ধ ইতি গীয়তে। ইদঞ্চৈতৎ রত্নত্রয়শরণং বৌদ্ধদর্শনস্য উপাসকাদিসর্ব্বসম্বলানাং বীজভূতম্। সম্বলাশ্চৈতানি (?) কতিসংখ্যাস্তে সম্বলা উচ্যন্তে বিভাষায়াম্। উপাসকাদিপোষধান্তা অষ্টৌ। বোধিসত্ত্বমহাযানে পূর্ব্বোক্তা এব অষ্টৌ বোধিসত্ত্বসম্বলো নবমঃ অগ্রনয়মহাযানে পূর্ব্বোক্তা এবং নব বজ্রব্রতসম্বরো দশমঃ তত্র উপাসক উপাসিকা শ্রামণের ভিক্ষু শ্রামণেরী শিক্ষমাণা ভিক্ষুণী ত্রিসপ্তানাং স্ত্রীপুরুষাশ্রয়ভেদাৎ সপ্তসম্বরাঃ।।"

তাহা হইলে বুঝা গেল, হীনযানী বৌদ্ধ অপেক্ষা মহাযানীদের আরো দুইটা সম্বল আছে। একটা বোধিসত্ত্বসম্বল, আর-একটা বজ্রব্রতসম্বল।। বোধিসত্ত্বসম্বল বলিতে গেলে নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব লাভ করিব, এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। বজ্রব্রতসম্বল অর্থাৎ আমি শূন্য হইয়া গিয়াছি, এই ধারণা। বজ্র বলিতে গেলে শূন্যতাকেই বুঝায়।

বৌদ্ধ ও হিন্দুদের সংস্কারের কথা সব বলা হইল। এখন উহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণেরা উহাকে ইষ্টি বলিতেন। অগ্নিত্রয়সাধ্য যাগের নাম ইষ্টি। সাগ্নিকেরাও ইষ্টি করিতেন, কিন্তু তাঁহারা একাগ্নিতেই কার্য করিতেন। আমাদের এখন বহ্নিস্থাপন করিয়া, উহাকে মন্ত্রপূত করিয়া দাহ করিতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত শবদাহ না হয়, ততক্ষণ সেই শব আত্মীয় স্বজন ভিন্ন কেহ স্পর্শ করিতে পারে না, অন্তত আপনার জাতির লোক ভিন্ন অন্য কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। শব স্পর্শ করিলেই অশৌচ হয়, যাহারা দহন বহন করে তাহাদেরও অশৌচ হয়। চুল্লিটি ভালো করিয়া পরিষ্কার করা, যাহারা শবদাহ করে, তাহাদের প্রধান কর্তব্য। যদি একখানি কয়লা চুল্লিতে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের প্রত্যবায় হয়। সাধারণ লোকের সংস্কার, চুল্লিটি পরিষ্কার করিলে আর-জন্মে লোকটি ফর্সা হয়, আর যদি একখানিও কয়লা পড়িয়া থাকে, তবে তাহার গায়ে তিল হয়। চুল্লি অপরিষ্কার রাখিলে সে লোকটা কালো হয়। দাহকারীদের আর-একটা প্রধান কর্তব্য, শবের যে অংশ পোড়ে না, সে অংশ গভীর জলে ফেলিয়া দেওয়া ও অস্থি সঞ্চয় করিয়া দূর জলে ফেলিয়া দেওয়া।

আমরা শবকে অশুচি মনে করি, অস্থিকেও অশুচি মনে করি। তাই হাড় ছুঁইলেই আমাদের স্নান করিতে হয়। বৌদ্ধেরা কিন্তু সেরূপ করেন না। শুধু হাড় নয়—আমরা নখ, চুল কাটা হইয়া গেলে তাহাকে অস্পৃশ্য মনে করি—তাহা ছুঁইলেও আমাদের অশৌচ হয়। বৌদ্ধেরা কিন্তু এই নখ, চুল ও হাড়কে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করেন,

তাহাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য পাথরের বাক্স বা কৌটায় পুরিয়া রাখেন এবং তাহার উপরে বড়ো বড়ো স্তূপ নির্মাণ করেন, স্তূপের চারি দিকে প্রদক্ষিণ করেন, স্তূপের পূজা করেন, স্তূপের চারিদিকে দিঙ্‌মালা দেন। এই জায়গায় বৌদ্ধ হিন্দুতে বড়োই তফাত। বৌদ্ধদের শব অনেক সময় ফেলিয়া দেয়, অনেক সময়ে শ্মশান-রক্ষকের নিকট পোড়াইবার জন্য কিছু পয়সা দিয়া আসে। কিন্তু বড়লোক মরিলে খুব জাঁক করিয়া, সে দেহ তৈলদ্রোণীতে পুরিয়া দাহ করে এবং হাড়গুলি পুঁতিয়া, তাহার উপর স্তূপ নির্মাণ করে। বুদ্ধদেবের হাড়গুলি প্রথম আট ভাগ হইয়া যায় ও আট জায়গায় স্তূপ হয়। রাজা অশোক তাহাদের মধ্যে সাতটির "সলিলনিধান" উঠাইয়া, তাহার চৌরাশি হাজার ভাগ করেন এবং তাহার উপর চৌরাশি হাজার স্তূপ নির্মাণ করেন। নেপালে এখনো অনেকগুলি স্তূপ অশোক-স্তূপ বলিয়া পরিচিত। সাহেবেরা বলেন, ওগুলিকে অশোকের বলিতে দ্বিধা করা উচিত নয়। কারণ, উহাদের পরিমাণ অশোক-স্তূপের মতো ও উহাদের মাল-মসল্লাও অশোক-স্তূপের মতো। তাহার পর শ্রাদ্ধ। অগ্নিহোত্রীরা পিতৃপিণ্ড নামে যজ্ঞ করিতেন। উহা অগ্নিত্রয়সাধ্য। সাগ্নিক ও নিরগ্নিকেরা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ মানে—মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্বক অন্ন, বস্ত্র ও পিণ্ডদান। ইহা সমস্তই বেদমন্ত্রে হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ নানা রকম আছে— প্রেতশ্রাদ্ধ, মাসিক শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, পার্বণ শ্রাদ্ধ, অমাবস্যা শ্রাদ্ধ, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। ভূতের ভয়ে অনেকরূপ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সে শ্রাদ্ধ যে কেহ করিতে পারে—তাহার অধিকারী, অনধিকারী নাই। ইহার মধ্যে প্রধান ত্রিপিণ্ড শ্রাদ্ধ। যব, মাষ ও তিল—এই তিনের ত্রিপিণ্ড করিতে হয়। ততকরগুপ্তের মতে বৌদ্ধেরাও নানারূপ শ্রাদ্ধ করেন। তিনি বলেন, ভগবান্ গৃহস্থাশ্রমীদের জন্য শ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব তাহার বিধি বলিতেছি। নিত্যশ্রাদ্ধের সময় বলিতে হয়। বোধিসত্ত্বচর্যা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধেরা যেমন পূর্বে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব—"ওঁ অদ্য অমুক মাসে, অমুক তিথিতে, অমুক গোত্রে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, তাহাদের পত্নীদের ও অতিথিদের জন্য বজ্রতণ্ডুল হইতে উৎপন্ন সঘৃত অন্ন আঃ হুং স্বাহা।" এইটি তিনবার পাঠ করিয়া দিবেন। তাহার পর সেই বুদ্ধেরা যেমন সকল পুণ্য-কর্মের পরিণামস্বরূপ সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব। আমার এই পুণ্য মোক্ষের হেতু হইবে। পার্বণশ্রাদ্ধ ও অপরপক্ষের শ্রাদ্ধেও এই বিধান। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে যাহার শ্রাদ্ধ, কেবল তাহারই নাম গোত্র উচ্চারণ করিবে, আর-সকলই পূর্বের মতো। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধও এইরূপে করা যায়। কোথায় হাঁটু পাতিতে হইবে, কোথায় হাত মুখ রাখিতে হইবে, কোথায় তিল কুশ গ্রহণ করিতে হইবে—এইসব নিজেই বিচার করিয়া লইতে হইবে।

ব্রাহ্মণভোজন ও সংঘভোজন।।

ব্রাহ্মণেরা ছোঁয়া লেপাটা বড়োই দোষ মনে করেন। পইতা হওয়ার দিন হইতে ব্রাহ্মণের ছেলেরা ব্রাহ্মণ হয়। সেইদিন থেকে তাহারা কাহারো এঁটো খায় না এবং কেউ ছুঁলেও খায় না। সুতরাং ব্রাহ্মণভোজনে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন দিতে হয় ও মাঝখানে একটু ফাঁকও রাখিতে হয। জলপাত্র ডান দিকে দিতে হয়। যাতে ছোঁয়া লেপা না হয়, সেজন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

ইৎসিং বলেন, সেকালে ভারতবর্ষে সংঘভোজনেও এরূপ করা হইত। সাত ইঞ্চি উঁচু পিঁড়ির উপর বসিয়া, উবু হইযা (আসনপিঁড়ি হইয়া বসা দোষ) বসিয়া তাঁহারা খাইতেন। দুখানা পিঁড়ির মধ্যে অন্তত এক ফুট জায়গা খালি থাকিত। ব্রাহ্মণভোজনে সকলের পাতে পরিবেষণ না হইলে ব্রাহ্মণেরা খাইতে পারিতেন না। এবং খাইতে বসিয়া মাঝে কেউ উঠিয়া যাইতেন না। কিন্তু সংঘের লোকেরা যাঁর পাতে যখন পরিবেষণ হইত, অমনি খাইতে পারিতেন, অন্য লোকের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত না। ব্রাহ্মণেরা খাইতে বসিয়া জল খাইতে হইলে ঘটি বাঁ হাতে ধরিয়া আলগোছে জল খান, অথবা ডান হাতে ধরিয়া চুমুক দিয়া খান। বৌদ্ধেরা বাঁ হাতে চুমুক দিয়া জল খাইতেন। ইৎসিং বলেন, তিনি বৌদ্ধদের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, সমস্তই বুদ্ধদেবের বহি হইতে বলিতেছেন। তাহলে সংঘভোজনেও ব্রাহ্মণদের মতো এত ছোঁয়া লেপা ছিল না কিন্তু আমি ১৮৯৮ সালে এক সম্যক্ সম্ভোজনে উপস্থিত ছিলাম। নেপালের সমস্ত বিহারে যত সংঘ ছিল সব সেখানে উপস্থিত ছিল—প্রায় ১৩ হাজার ভিক্ষু একত্র খাইতেছিলেন। তাঁহাদের কিন্তু সব ছোঁয়া লেপা। সারি সারি চাদর বিছাইয়া বসিয়াছেন। একের চাদরের উপর আর-একজনের চাদর পড়িয়াছে। যত বড়ো মানুষের সারি, চাদরও তত বড়ো। চাদরে যা পড়িতেছে, খাওয়ার হইলে ভিক্ষুরা তাহা তখনই খাইতেছেন ; ভাত, ব্যঞ্জন, লুচি, পরটা, মুলো সিদ্ধ, ডাল—সব সেখানে বসিয়াই খাইতেছেন—কড়ি, পয়সা, চাল, সুপারি, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি যাহা বসিয়া খাবার জিনিস নয়, সেগুলি পাতে রহিতেছে—যাবার সময় সঙ্গে লইয়া যাইবেন। তাহা হইলে আর ছোঁয়া লেপার বাকি কী রহিল? আমাদের দেশে পালি-পার্বণে গঙ্গাতীরে দেখিয়াছি—ভিখারি বৈষ্ণবেরা ওরূপ করিয়া চাদর বিছাইয়া বসে, তাহাদের কিন্তু রান্না খাবার কেউ দেয় না ; দেয়—চাল, ডাল, কড়ি, পয়সা, ফল। ইহাদিগকে যেমন সকলেই কিছু কিছু দেয়, সম্যক্ সম্ভোজনে কিন্তু ঠিক সেরূপ নহে। দানপতি (আমরা ইঁহাকে কৃতী বলি) সকলকেই পরিতোষ করিয়া দিবেন, একজনকেও ফাঁক রাখিতে পারিবেন না। অন্যান্য বৌদ্ধেরা—তাঁহারা গৃহস্থই হউন, ভিক্ষুই হউন বা গুভাজুই হউন, সকলেই দান করিবার জন্য কিছু কিছু লইয়া আসিবেন। একজনে হয় তো এক মণ চাউল লইয়া আসিয়াছেন ; তাহাতে যত জনকে দেওয়া হয়, দেওয়া হইল। তারপর তিনি

চলিয়া গেলেন। একজন হয় তো সুপারি লইয়া আসিয়াছেন। পাঁচ হাজারটি সুপারি পাঁচ হাজার লোককে দিলেন। বাকি ৭ হাজারকে দিতে পারিলেন না—তিনি চলিয়া গেলেন। সম্যক্ সম্ভোজনের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক-একজন লোক কী পাইল? তিনি বলিলেন, রান্না জিনিস তো তাহারা খাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর নগদে ও জিনিসে প্রত্যেকে সাড়ে দশ আনা করিয়া পাইয়াছে।

আমি এ পর্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধদের যে তুলনামূলক সমালোচনা করিলাম, ইহার উদ্দেশ্য, এ দুয়ে কতটুকু তফাত, তাহার কিছু সন্ধান দেওয়া। পূর্ণ সমালোচনা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। কারণ, আচার-ব্যবহার সব দেশে সমান নয়—এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে কত জায়গায় যে কত বদল হইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। হিন্দু বলিতে গেলেও অসংখ্য জাতি, অসংখ্য ধর্ম বুঝায়। বৌদ্ধ বলিতে গেলেও তাই। তবে মোটামুটি কথা এই, বৌদ্ধেরা গুরু মানে, গুরুকে দেবতার চেয়ে বড়ো বলে মানে, গুরুপদ পরমপদ বলে মনে করে। গুরুকে তন-মন-ধন কিছুই দিতে দ্বিধা করে না, আর সম্পূর্ণরূপে গুরুর মতো হইতে চায়, গুরুই শূন্য, গুরুই পরমার্থ। শূন্য যেমন শূন্যে মিশাইয়া যায়, গুরুও তেমনি শূন্যে মিশাইয়া গিয়াছেন। আমরাও তেমনি গুরুতে—শূন্যে মিশাইয়া যাইব। এরূপ মত—আমরা এখন যাঁহাদিগকে হিন্দু বলি, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক আছে।

ততকরগুপ্ত বলিয়াছেন, "গুরুর্ব্বুদ্ধো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুঃ সঙ্ঘঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। স্বয়ং তথাগতির্যস্মাৎ গুরুরেবাত্র কারণম্। সংবুদ্ধেভ্যো যথাদত্তে [...] ফলং তথা। তেনৈব সূত্রতন্ত্রেষু গুরুপূজা প্রকাশ্যতে। প্রদত্তে পুনরন্যেভ্যঃ ফলং পাত্রানুরূপকম্। বিনয়েষ্বপি সূত্রেষু তন্ত্রেষ্বপি জগৌ মুনিঃ॥"

'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৩১

বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন?

আজিকার বক্তৃতার বিষয় এই যে, বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন? একে ভাষার কথা, তার পর ব্যাকরণের কথা, পাণিনির কথা—কাব্য নহে, ধর্ম নহে, ভক্তি নহে ; একথা নিশ্চয়ই নীরস হইবে, কঠিন হইবে। কিন্তু ব্যাকরণের কথা গোড়ায় না বলিলে বৌদ্ধ সাহিত্য বিষয়ে বুঝা কষ্ট হইবে। সেইজন্য যদিও আপনাদের কষ্ট হইবে, বুঝিতে পারিতেছি, তথাপি আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করি, ধীরভবে কথাগুলি শুনিবেন।

বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, ইহা লইয়া অনেক বিবাদ-বিসংবাদ আছে, এবং এখন পর্যন্ত কত ভাষায় বৌদ্ধধর্মের বই লেখা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও আমাদের দেশের লোক খবর বড়ো কম রাখে। বর্মা, শ্যাম, আনাম, চাটগাঁ আরাকান

দেশে বৌদ্ধধর্ম সিংহল দ্বীপ হইতে আসিয়াছে। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের পুথি এখন প্রায়ই পালি ভাষায় লেখা। সিংহলি পণ্ডিতেরা বলেন, বুদ্ধদেব পালি ভাষাতেই ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

কথাটা অত সহজ নয়। তিনি যে পালিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তার কোনো প্রমাণ নাই। পালি ভাষাটা কী, কোথা হইতে আসিল, কোন্ দেশে ইহার উৎপত্তি হইল, সে সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিংহলের লোকে বলে, "সা মাগধী মূলভাসা নরেয় আদিকপ্পিতা।" মাগধী যে মূল ভাষা, একথা বিশ্বাস করিতে পারি না ; সিংহল দেশের লোক বিশ্বাস করিতে পারে ; ভারতবর্ষের লোক—বিশেষত ব্রাহ্মণেরা পারে না। এই পালি ভাষাটা কোন্ দেশের ভাষা, কেহ বলিতে পারে না, কোন্ সময়ে হইয়াছে, তাও কেহ বলিতে পারে না, পালি শব্দের অর্থ যে কী, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কেহ ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করেন—"পল্লী" হইতে পালি হইয়াছে। অনেকে দেখাইয়া দিয়াছেন—"পল্লী" হইতে "পালি" হয় না—আর বাস্তবিক পল্লীর ভাষাও পালি নয়। তারপর একটা মীমাংসা হইয়াছে। এ মীমাংসা সকলে গ্রহণ করিয়াছেন কিনা, জানি না ; আমি তো গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই। মীমাংসাটা এই—শাস্ত্রের পংক্তিকে পালি বলে। সুতরাং পালি ভাষা মানে শাস্ত্রের পংক্তির ভাষা অর্থাৎ মোটামুটি শাস্ত্রেয় ভাষা। আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যেমন বচন বলেন, কোনো একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই শাস্ত্রের বচন তুলিয়া উত্তর দেন—যাহাকে বাংলায় পাঁতি দেওয়া বলে। কেহ কেহ বলেন, পংক্তি হইতে পাঁতি হইয়াছে। সেইরূপ পাঁতি অর্থে "পল্লী" ব্যবহার হইত। সেইরূপ "পল্লী" হইতেই "পালি" হইয়াছে। কথাটা বিশ্বাস হয় না। তারপর কোন্ সময়ে পালি ভাষা হয়, তাহা নিয়া বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছে। অনেকে বলেন, পালি ভাষা অশোকের দুই-তিন শত বৎসর পরে চলিয়াছে। এখন সংস্কৃত ভাষায় যেমন (কথাবার্তা হয় না, কিন্তু) পুথি লেখা হয়, তেমনি পালি একটা ভাষা—তাহাতে বই লেখা হইত ; কিন্তু কথাবার্তা হইত না। কার্ন সাহেব [Johann Hedrick Kasper Kern] বলেন, পালিভাষা হইতেছে মগধ দেশের সরকারি কাগজের (court language) ভাষা। সেটা দুই শত বৎসর পরে শাতকর্ণীদের সময়, অন্ধ্র দেশে গিয়া পড়ে। তখন ইহা যে আকার ধারণ করে, তাহারই নাম পালিভাষা। সেই সমস্ত হইতেছে কল্পনা মাত্র। ইহাতে কোনো বিষয় ভালো করিয়া প্রমাণ হয় না। প্রমাণের মধ্যে এইমাত্র পাওয়া যায়, অশোক রাজার যে-সকল শিলালেখ আছে, তার চেয়ে এ ভাষাটা অনেক নূতন। আর-একটি জিনিস পাওয়া যায়, সেটি হাতিগুম্ফার শিলালেখ। এই শিলালেখের ভাষা পালির অনেক কাছাকাছি। ইহার তারিখ চন্দ্রগুপ্তের ১৬৫ বৎসর পরে। আর-একটা কথা আছে। যতগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে, তার মধ্যে চণ্ডের লেখা ব্যাকরণখানি সকলের চাইতে পুরানো। হরন্‌লি সাহেব ১৮৮০ হইতে ১৮৯০ বৎসরের মধ্যে

ব্যাকরণখানি যত্ন করিয়া ছাপিয়াছিলেন। তার ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, এই ব্যাকরণের ভাষা পালির খুব কাছাকাছি সুতরাং দেখিতে গেলে যিশু খৃস্টের দুই শত বৎসর পূর্বে ও দুই শত বৎসর পরে—এই চারি শত বৎসরের মধ্যে পালিভাষা যেভাবে এখন আছে, সেইভাবে উপস্থিত হইয়াছে। এক জায়গায় পড়িলাম, যিশু খৃস্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে খাঁটি পালি সাহিত্য শেষ হইয়া যায়। তারপর যা কিছু পালি আছে, সেটা হইতেছে টীকা-টিপ্পনী ও প্রকরণ ; এগুলি পরে লেখা হইয়াছে। তাহা হইলে এটা মনে করিয়া নেওয়া যাইতে পারে যে, যিশু খৃস্টের জন্মাবার দুই শত বৎসর আগে হইতে দুই শত বৎসর পর পর্যন্ত পালিভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন্ জায়গায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তা জানি না। বোধহয়, দক্ষিণ দেশে—অন্ধ্র দেশে, সে দেশের রাজধানীর নাম ধান্যকটক ছিল—যাহাকে আমরা অমরাবতী বলি, যেখানে হইতে অনেক ভালো ভালো পাথরের কাজ বাহির হইয়াছে। ভারতবর্ষের অনেক অমরাবতী আছে, এ অমরাবতীর নাম নূতন। একটা বন ছিল—জঙ্গল-টঙ্গল হইয়া গিয়াছিল। একশত বৎসর আগে একজন জমিদার সেখান হইতে পাথর লইয়া একটা নগর তৈরি করেন। জমিদার সে নগরের নাম রাখেন অমরাবতী। সেই অমরাবতী অর্থাৎ প্রাচীন ধান্যকটকে পালিভাষার উৎপত্তি হয়। এই প্রাচীন ধান্যকটকই অন্ধ্র দেশের প্রথম রাজধানী। পাইটানা অথবা প্রতিষ্ঠান এবং বিলবাইকুর, অন্ধ্র দেশের আর দুইটি রাজধানী ছিল। কিন্তু আদত বা মূল জায়গা ছিল ধান্যকটক।

যাহা হউক, পালিভাষা লইয়া আমাদের কথা নয়। আমাদের কথা, বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন, কোথায় করিয়াছেন। দেখিতে গেলে বুদ্ধদেবের বাড়ি গোরক্ষপুরের উত্তরে—নেপাল-প্রান্তে। সেখানে তিনি বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। তাঁর বক্তৃতার সীমা একদিকে অঙ্গরাজ্য—যার রাজধানী চম্পানগর বা ভাগলপুর ; আর একদিকে শ্রাবস্তী—লক্ষ্ণৌ হইতে দুই শত মাইল উত্তরে। আর-একটা সীমা হইতেছে গয়া, আর-একটা সাঙ্কাশ্য। মথুরায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন, কিনা জানি না, তবে তাঁর শিষ্যেরা অনেকে মথুরায় বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রাবস্তী হইতে গয়া—ইহার মধ্যে অনেক জায়গায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন। তার ভিতরে যেটুকু বেহারে—গয়া, রাজগৃহ, বৈশালী, পাবাপুরী, কুশীনগর ; কোশলে—কাশী, শ্রাবস্তী, সাকেত, সাঙ্কাশ—এখন এইটুকুতেই আটটি বিহারি ভাষা আছে ; তা ছাড়া মিথিলার ভাষা আছে, অযোধ্যার অনেক ভাষা আছে ; এখনো আছে, তখনো ছিল।

এ সম্বন্ধে একটি বিষয় বোঝার দরকার। এখন নানা রকম গতায়াতের সুবিধা হইয়াছে—রেলওয়ে আছে, নৌকা আছে, স্টিমার আছে, গাড়ি ঘোড়া মোটরকার হইয়াছে, এখন ভাষা অনেকটা এক হইয়া গিয়াছে। ব্যবহারের জিনিস যেমন এক হইয়া গিয়াছে, তেমনি ভাষাও এক হইয়া গিয়াছে। সেকালে তাহা ছিল না—সেকালে

ছিল যোজনান্তর ভাষা, চারি ক্রোশ অন্তর ভাষা। কলিকাতার লোকের ভাষা কলিকাতার চারি ক্রোশ তফাতের লোক বুঝিতে পারিত না। এমনি করিয়া এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ভিন্ন ভাষা ছিল। সেকালে এত ভাষা ছিল, বুদ্ধদেব এত লোককে কী করিয়া এক ভাষায় বুঝাইতেন, এ প্রশ্নের সমাধান হয় না। সমাধান করিতে গিয়া কার্ন সাহেব একটা কথা বলিয়াছিলেন, সেটাও মজার কথা। বুদ্ধদেব যে জেলায় যাইতেন, সেই জেলার ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। জেলা কতগুলি ছিল, জানি না ; ডায়েলেক্‌ট কী, তাও জানি না ; ডিস্ট্রিক্‌ট ডায়েলেক্‌টে বক্তৃতা করিতেন বলিলে বেশি খবর পাওয়া গেল না। ইহার চাইতে বলিয়া দেওয়া ভালো, "জানি না ; বলিতে পারিলাম না।" তবে রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবাস্তু, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, এই সকল নগরের লোকে পরস্পরের ভাষা অনেকটা বুঝিতে পারিত। নগরে নগরে যাতায়াতের দরুন পরস্পরের সম্পর্কে অনেক জিনিস তাঁদের জানা থাকিত। পাড়াগাঁয়ে তাহা থাকিত না। সেখানে গিয়া কী করিয়া তিনি বক্তৃতা করিতেন? পাড়াগাঁয়ে রীতি ছিল, যেখানে চাষবাস হয়, সেসব জায়গায় বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের ঢুকিতে দেওয়া হইত না। যেমন নট, নর্তকী, গাইয়ে, বাজিয়ে ইত্যাদি—কোনো গ্রামে গেলে গ্রামের লোককে কাজকর্ম ফেলিয়া, ইহাদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে মিশিয়ে থাকিতে হয়, চাষবাস হয় না। সেইরূপ বৌদ্ধ-ভিক্ষুকেরা গ্রামে গেলে গ্রামবাসীরা কাজকর্ম বন্ধ করিত ; তাঁহারা গ্রামের ভিতর গিয়া ধর্মের বক্তৃতা করিতেন। গ্রামের লোকের কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাইত। তাই ভিক্ষুদের গ্রামে ঢুকিতে দেওয়া হইত না ; একথা চাণক্যের পুথিতে লেখা আছে। পূর্বে যাহা বলিয়াছি, এই কয়টা নগর পরস্পরের ভাষা এক রকম করিয়া বুঝিত। তাহারা যে ভাষায় কথা কহিত, সে ভাষার শিলালেখও বড়ো একটা পাওয়া যায় না। অনেক কষ্টে একটি ছোট্ট শিলালেখ বাহির হইয়াছে ; কোথায় সেটি পাওয়া যায়? সেটি পিপ্রাহায় পাওয়া যায়। পেপিস্‌ সাহেব তাঁর জমিদারিতে একটা প্রকাণ্ড স্তূপ ভাঙিয়া, তাহার ভিতর হইতে একটা বড়ো পাথরের সিন্দুক পান। সিন্দুক খুলিয়া অনেক কৌটা পাওয়া যায়—একটা স্ফটিকের কৌটা, আর-একটা পাথরের কৌটা পাওয়া যায়। পাথরের কৌটায় বুদ্ধদেবের অস্থি ছিল, ছাই ছিল। সেই ছাই লইয়া নানা রকম মতামত আছে ; তন্মধ্যে দুইটি মত প্রধান। একটা মত এই বুদ্ধদেব যখন মরিয়া যান, কুশীনগরে ডান হাত গালে দিয়া মরেন, সে সময় তাঁহাকে দাহ করা হয়, সৎকার করা হয়। সৎকারে যে ছাই হয়, তাহা আট ভাগ করিয়া আট জন রাজা লইয়া যান। এক ভাগ শাক্যেরা পায় ; অশোকরাজা তার সাত ভাগ লইয়া গিয়া চুরাশি হাজার স্তূপ করেন। ইহার মধ্যে এখন ১৬৫টা নেপালে আছে। তার মধ্যে পাঁচটা ঠুনো চৈত্য অর্থাৎ স্থূল চৈত্য, আর বাকি সানু চৈত্য অর্থাৎ ছোটো চৈত্য। অশোকরাজা শাক্যদের ভাগের ছাই তুলিয়া লইয়া যান নাই, তাহা যথাস্থানে ছিল। পেপিস সাহেবের জমিদারি হইতে তাই বাহির

হইয়াছে। অনেকে বলেন, পেপিস সাহেবের জমিদারিতে যে সিন্দুক বাহির হইয়াছে, সেই সিন্দুকের কৌটার ভিতর যে ছাই ছিল, তাহাই হইতেছে আসল ছাই—শাক্যদের ভাগের ছাই; অনেকে বলেন—তা নয়। কিন্তু বুদ্ধদেবের নির্বাণের কিছুদিন পরে শ্রাবস্তীর রাজা বিরূঢ়ক শাক্যদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া একটা হত্যাকাণ্ড করেন এবং শাক্যদের মৃতদেহের সৎকার করিয়া, সেই ছাই পেপিস সাহেবের জমিদারিতে পুতিয়া রাখেন। সেই ছাই এখন বাহির হইয়াছে। কথাটি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা জানি না।

যাহাই হউক, ছাই বুদ্ধের নিজেরই হউক বা তাঁহার জ্ঞাতিদেরই হউক, যে শিলালেখটি পাওয়া গিয়াছে, সেটি একটি বাক্যমাত্র (sentence)। পাথরের (কৌটার) উপর যে লেখ আছে, সে লেখটি বুদ্ধদেবের নির্বাণের ২০/২৫ বৎসরের মধ্যে লেখা, এটা স্বীকার করিতে পারা যায়। তার অক্ষরগুলি অশোকের অক্ষর হইতে অনেক পুরানো। সে শিলালেখটি এই—"ইয়ং সলিলনিধনে বুধস ভগবতে সকিয়নং সুকিতিভতিনং সভগনিকনং সপুতদলনং।" অর্থাৎ এই যে শরীরনিধান অর্থাৎ ছাই বা হাড়গোড় ভগবান্ বুদ্ধের, শাক্যদের, ভাই ভগিনী ও সুত দারার সহিত।"

যাহা হউক, এই ছাইটা যে বুদ্ধদেবের বা তাঁর জ্ঞাতিদের, তা নিশ্চয। যেখানে লেখা, সেটা কোটার চারি পাশে আটা, গোল হইয়া গিয়াছে। কোথা হইতে পড়া আরম্ভ হইবে, তাহা নিয়া নানা রকম মতামত আছে। এটা যে সময়কার ভাষা, তাহাতে বলিতে পারা যায়, ভাষাটি চমৎকার ; ইহাব ভিতর একটিও সংযুক্ত বর্ণ নাই, সংযুক্ত অক্ষরের নাম নাই। আর ট, ঠ, ড, ঢ, শ, ষ, হ, ক্ষ নাই। সুতরাং সংস্কৃত হইতে ভাঙিয়া যে অসংখ্য বুলি (dialect) হইয়াছে, এ ভাষাটি তাহাবই একটি। এ ভাষাটিকে আমরা মনে করিতে পারি, সে সময়কার ভাষা। আর-একটা আশ্চর্য রকম উদাহরণ আমরা পাইয়াছি, বুদ্ধদেবের জন্মাবার কিছু পূর্বেই হউক, কিংবা কিছু পরেই হউক।

আপনারা জানেন, 'মহাভারতে'ব সময় মগধ দেশে জরাসন্ধ নামে এক রাজা ছিলেন। ভীম তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলে তাঁহার ছেলে সহদেব মগধের রাজা হন। তাঁহার বংশে এই রাজত্ব বহু শত বর্ষ থাকে। বুদ্ধদেবের জন্মের কিছু পূর্বে সেই বংশ ধ্বংস করিয়া শিশুনাগ মগধে রাজ্য স্থাপন করেন। বুদ্ধদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন মগধ দেশে রাজা তিনিই। শিশুনাগ সম্বন্ধে একটা ভাষার কথা আছে—

"শ্রূয়তে হি মগধেষু শিশুনাগো নাম রাজা ; তেন দু' চ্চারান্ অষ্টৌ বর্ণান্ অপাস্য স্বান্তঃপুর এব প্রবর্ত্তিতো নিয়মঃ। টকারাদয়শ্চত্বারো মূর্দ্ধন্যাঃ তৃতীয়বর্জ্জং উষ্মানস্ত্রয়ঃ ক্ষকারশ্চেতি।"

শুনা যায়, মগধ দেশে শিশুনাগ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি আপনার অন্তঃপুরে (court) নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন যে, যে-আটটি অক্ষর উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয়, তাহা বর্ণমালা হইতে তফাত করিয়া দিতে হইবে। যথা—ট, ঠ, ঢ, ণ, শ, ষ, হ্ আর ক্ষ।

আরো—"শ্রূয়তে হি শূরসেনেষু কুবিন্দো নাম রাজা। তেন পরুষসংযোগক্ষরবর্জ্জং অন্তঃপুর এবেতি।" ইত্যাদি। শূরসেন অর্থাৎ মথুরায় কুবিন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অন্তঃপুরের মধ্যে নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন যে, যে-সকল সংযুক্ত অক্ষর কর্ণকঠোর হয়, তাহাদের ব্যবহার চলিবে না।

সংস্কৃত হইতে সহজ করিয়া নিয়া যে সময় অনেক প্রাকৃত হইয়াছে, সে সময় একটি ভাষা হইয়াছে শাক্যদের দেশে—যাহাতে একটিও সংযুক্ত বর্ণ নাই ; শ, ষ, ক্ষ নাই ; দুই-একটি সংযুক্ত বর্ণ হইলেও সেগুলি অসংযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। অসংযুক্ত বর্ণ ককারাদি হকারান্ত। তাহা হইলে এ রকম একটা ভাষা ছিল, সে ভাষা আমরা বুদ্ধদেবের ভাষা বলিয়া নিতে পারি। তাহার উদাহরণের মধ্যে এই একটি বাক্যমাত্র পাইয়াছি। আর এই একটি খবর পাইলাম, এটি বিশ্বাসযোগ্য। কেন-না, রাজশেখর সমগ্র আর্যাবর্তে প্রায় ১১ শত বৎসর আগে প্রবলপ্রতাপ লোক ছিলেন। রাজশেখরের নাম আপনারা সকলেই জানেন ; তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা'য় এই সকল কথা আছে।

এই দুইটি প্রমাণ ছাড়া বুদ্ধদেব কী ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন, তা জানি না। কিন্তু জানি না বলিলে তো হইবে না ; তিনি বক্তৃতা তো করিতেন। অশোকের আগে এবং অশোকের সময়ে অনেক শিলালেখ আছে, কতকগুলি পাথরের থামে, আর-কতকগুলি আছে পর্বতের গায়ে। সেগুলি আবার আশ্চর্য ব্যাপার ; সব প্রায়ই এক জিনিস—এগুলি তৈয়ারি হইত অশোক রাজার দপ্তরে। সেখান হইতে গিয়া যে জায়গায় পৌঁছিত, সেখানকার উচ্চারণ, সেখানকার বানান, সেখানকার বোল (ইডিয়ম) বদল হইত। খাইবার পাসে দুইখানি এক রকম, আর উড়িষ্যা কলিঙ্গ দেশে দুইখানি আর-এক রকম ; তাহাদের ভাষা এক, প্যারাগ্রাফ এক, শুধু বানানের তফাত—এখানে প, ওখানে প্র ; একটু তফাত। সুতরাং এটা মনে করিতে হইবে, রাজভাষা—কোর্টভাষা ; সেটা একটু বদল করিয়া লইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সে আজ্ঞাপত্র বুঝা যায় ও চলে। বুদ্ধদেবের সময়কার শিলালেখ পাওয়া গেল, অশোক রাজার সময়েরও পাওয়া গেল। অশোকরাজা ও বুদ্ধদেব আড়াই শত বৎসরের তফাত ; সুতরাং অশোকের ভাষা বুদ্ধের ভাষা বলা ঠিক নয়।"

সংস্কৃত বরাবর ছিল। আপনারা অবশ্য অনেকে শুনিয়াছেন, অনেকে বিশ্বাস করেন এবং একজন খুব জোর গলায় বলিয়াছেন যে, যেই বৌদ্ধধর্ম প্রচার আরম্ভ হইল, অমনি সংস্কৃত ঘুমাইল। তারপর সংস্কৃত জাগিল, সাত শত বৎসর পরে। এ-কথা তখন অনেকে খুব বলিতেন, আমাদের দেশে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও একথা বলিয়াছেন। কিন্তু এ কথাটা একেবারেই সত্য নয়। সংস্কৃত ঘুমায় নাই। যদি সংস্কৃত ঘুমাইত, তবে ব্রাহ্মণ জাতি লোপ হইত। কিন্তু সে জাতি বরাবর জাগিয়া

আছে। তারপর আমি সাহিত্য হইতে দেখাইয়া দিয়াছি যে, এই সাত শত বৎসর ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে সংস্কৃতে অনেকগুলি বড়ো বড়ো বই বাহির হইয়াছে—পাণিনির ব্যাকরণ, পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য', কৌটিল্যের সূত্র, 'মহাভারত' ও 'রামায়ণ' (যে ভাবে এখন পাইতেছি), ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র', বাৎস্যায়নের 'কামশাস্ত্র', বাৎস্যায়নের 'ন্যায়ভাষ্য' ইত্যাদি। এই সময় বৌদ্ধেরাও সংস্কৃতে অনেক বই লেখেন। জৈনেরাও অনেক সংস্কৃত বই লিখিয়াছেন। তারপর পুরাণ সম্বন্ধে অনেক কথা এই সময়ে আলোচনা হইয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত ঘুমায় নাই ; বরং তাহার ক্রিয়া অধিক হইয়াছে। এই সাত শত বৎসরের প্রথম তিন-চারি শত বৎসর সংস্কৃত ভাষাকে মার্জিত করিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে ; সে চেষ্টা এই ব্যাকরণশাস্ত্র। পাণিনি, কাত্যায়ন, বররুচি, ব্যাড়ি, শাকবন্দী, পতঞ্জলি— এই কয়জনের নাম করিলাম, আরো অনেক নাম আছে। যে সময় একদিকে বুদ্ধেদেবের দল বৌদ্ধধর্মে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছে, সে সময় ব্রাহ্মণেরা সর্বপ্রযত্নে যত সংস্কৃত বই ছিল, কাটিয়া কুটিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। একজন দুই জনের চেষ্টা নয় ; তাঁহারা সম্প্রদায় ছিল, তাঁহাদের বংশানুক্রমে ব্যাকরণ তৈরি করিয়াছেন। তাই যদি হইল, তবে পাণিনির পূর্বে যে আর্য ব্যাকরণ ছিল, সংস্কৃত ব্যাকরণ ছিল, পাণিনি যখন সূত্রের পাঠ পরিষ্কার করিলেন, কী রকম করিয়া করিলেন? তিনি পূর্ব-পূর্ব ব্যাকরণকারদের মত, তাঁহাদের নাম তুলিয়া, হয় খণ্ডন করিলেন, নয় নিলেন।

পাণিনির সঙ্গে বুদ্ধদেবের একশত বৎসরের তফাত। পাণিনি হইয়াছেন ৪৫০-৫০০, আর বুদ্ধদেব ৫০০ থেকে ৫৪৩ খৃ. পূ.। ইহার আগে কী ছিল? ইহার আগে একখানি ব্যাকরণের কতকটা সন্ধান পাইয়াছি ; সেখানি শাকটায়ন ব্যাকরণ। পাণিনির তিন শত বৎসর আগে শাকটায়ন ব্যাকরণ তৈরি করেন। শাকটায়নের পরিচয় এইমাত্র দেওয়া আছে যে, তিনি হইতেছেন শ্রুতকেবলীদেশীয়। শ্রুতকেবলী— মহাবীরের নিকট না শুনিয়া তাঁহার শিষ্যদের কাছে শুনিয়া যিনি কেবলী হইয়াছেন; ইহাই হইতেছে শ্রুতকেবলীর অর্থ ; শ্রুতকেবলীদেশীয় মানে শ্রুতকেবলী হইতে একটু কম। তা যদি হয়, তাহা হইলে শ্রুতকেবলী শাকটায়ন বর্ধমানের শ্রুতকেবলীদেশীয় হইতে পারেন না। কেন-না, বর্ধমান, পাণিনির সময় হইতে ৫০/৬০ বৎসর আগে হইতে পারেন। তাহার মধ্যে শ্রুতকেবলী হইতে পারেন ; কিন্তু শ্রুতকেবলীদেশীয় হইতে পারেন না। তাহা হইলে বলিতে হইবে এই যে, শাকটায়ন পার্শ্বনাথের শ্রুতকেবলীদেশীয়। এই পার্শ্বনাথ, বর্ধমানের ২০০/২৫০ বৎসর আগেকার লোক। তাঁহার বাড়ি কাশীতে ; তিনি ৩০ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হন—হইয়া নানা দেশে ঘুরেন। তার ২০০/২৫০ বৎসর পরে বর্ধমান। তিনি বৈশালীতে জন্মেন এবং ৩০ বৎসর পরে সন্ন্যাসী হইয়া জৈনমন্দিরে থাকেন, সেখান হইতে গিয়া রাঢ়ে ১২ বৎসর থাকেন। বর্ধমানের শ্রুতকেবলীদেশীয় হইতে গেলে তাঁহার নির্বাণের অন্তত ১০০/১৫০ বৎসরের পর

না হইলে হয় না। তাহা হইলে শাকটায়ন পাণিনির তুল্যকালে হইয়া পড়েন। কিন্তু শাকটায়ন পাণিনির অনেক পূর্বে। পাণিনি শাকটায়নের সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন। এখন দক্ষিণ দেশ হইতে একখানা শাকটায়ন ব্যাকরণ প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে পাণিনি যাহা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা আছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলেন, উহা আসল শাকটায়ন নহে ; সেই শাকটায়ন অবলম্বন করিয়া আর-কেহ বই লিখিয়াছে। যাহাই হউক, দক্ষিণের শাকটায়ন পুরানো শাকটায়ন হউন, আর নাই হউন, শাকটায়ন যে পূর্বেকার একজন ব্যাকরণকার, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শাকটায়নের মতো, আরো কয়েকজন ব্যাকরণকারকে পাণিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং পাণিনির পূর্বেও সংস্কৃত ভাষা ছিল এবং ব্যাকরণ ছিল। তাঁহাদের ব্যাকরণ কাটছাঁট করিয়া পাণিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন।

পাণিনির যে ব্যাকরণ, তাকে আমরা সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ বলি। তার একটা বিশেষ নাম দিতে গেলে আমরা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি। পাণিনি কিন্তু নিজে "ভাষা" শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন, "সংস্কৃত ভাষা" ব্যবহার করেন নাই। পাণিনির ব্যাকরণে কিন্তু আর-একটা ভাষার বহু উল্লেখ আছে ; তাহাকে বলে ছান্দস্ ভাষা। উহাকে বেদের ভাষা বলিতে পারি কিনা, জানি না। কেন না, ছান্দসের মধ্যে ঋকের জন্য স্বতন্ত্র সূত্র আছে, যজুর জন্য স্বতন্ত্র সূত্র আছে, ব্রাহ্মণের জন্য স্বতন্ত্র সূত্র আছে, মন্ত্রের জন্য স্বতন্ত্র সূত্র আছে। তাহা হইলে ঋক্, যজু, ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র ইহা ছাড়া সেকালে আর একটা ভাষা ছিল, এই ভাষাটা ছান্দস্। আমার বোধ হয়, ব্যাস এই ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

ব্যাসের ভাষা অনেকটা পাণিনির কাছাকাছি। বৈদিক ভাষার ছন্দ ভাঙিয়া বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। পাণিনির ব্যাকরণের ভাষা, যাহা পাণিনি বাঁধিয়া দিয়া গেলেন, তাহা পরিষ্কার করিয়া দিলেন পতঞ্জলি। পতঞ্জলির উপর পাণিনির প্রভাব ছিল। পতঞ্জলি আট শত বৎসর পরের বৌদ্ধেরা বলিলেন—আমরা ভালো সংস্কৃত লিখিব, পাণিনিকে নিব—ব্যাড়ি কিংবা পতঞ্জলিকে নিব না ; সব জিনিসই পাণিনির সূত্র হইতে বাহির করিব। সেজন্য তাঁহাদের দরকার হইল টীকা করা। তাঁহারা পাণিনির সূত্র ও কাত্যায়নের বার্তিক নিয়া তাহারই উপর টীকা করিতে লাগিলেন। সেই টীকার নাম 'কাশিকা' ; টীকাকারের নাম জয়াদিত্য ; তিনি টীকা শেষ করিয়া যান নাই, শেষ করিলেন বামন। দুই জনেই বৌদ্ধ। 'কাশিকার' আবার একজন টীকা করিলেন ; তার নাম 'কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা' ; সেটা বৌদ্ধদের লেখা—পতঞ্জলিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া শুধু পাণিনি ও কাত্যায়নের উপর টীকা। এই রকম করিয়া বৌদ্ধেরা পাণিনির অনেক টীকা করিয়াছেন। কেন বৌদ্ধদের নতুন করিয়া পাণিনির টীকা করা দরকার হইল, জানি না। বোধ হয়, তাঁহাদের সমাজের যে অবস্থা ছিল, তাহাতে তাঁহাদের দরকার হইয়াছিল। তাঁহারা একখানি বই—ছোটো সংস্কৃত ব্যাকরণ—লিখাইয়াছেন, তার নাম 'ভাষাবৃত্তি',

গ্রন্থকার পুরুষোত্তম। তাহাতে ছন্দঃসূত্র নাই। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, ছন্দের যতগুলি সূত্র ছিল, তাহা বাদ দিয়া সে বইখানি লেখা হইয়াছে।

পাণিনির পাঁচ-ছয় শত বৎসর পরে বৌদ্ধেরা খাঁটি সংস্কৃতে বই লিখিতে আরম্ভ করেন। এই-সকল বইয়ের মধ্যে অশ্বঘোষের দুই খানি মহাকাব্য প্রধান। একখানির নাম 'বুদ্ধচরিত', আর-একখানির নাম 'সৌন্দরানন্দ'। প্রথমখানি বিলাত হইতে কাউয়েল সাহেব সম্পাদন করিয়াছেন, দ্বিতীয়খানি আমি বিব্‌লোথিকায় সম্পাদন করিয়াছি। এ সংস্কৃত ঠিক পাণিনির সংস্কৃত নয়, অনেক অ-পাণিনেয় প্রয়োগ আছে এবং অনেক প্রয়োগই ভাষ্যবিরুদ্ধ অর্থাৎ পতঞ্জলির অনুমোদিত নয়।

কিন্তু অশ্বঘোষ কোন্ ভাষায় বই লিখিয়াছেন, সেটা তো আমাদের কথা নয়। বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চেলারা কোন্ ভাষায় সেই-সকল বক্তৃতা লিখিয়াছেন, সেইটাই হইতেছে আমাদের আজিকার বক্তৃতার বিষয়। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন—এইটাই কার্ন সাহেবের মত। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? কলিকাতার লোক কি ঢাকার ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে, না ঢাকার লোক কলিকাতার ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে? তবে সাবধান হইয়া বক্তৃতা করিলে, এমন ভাষায় বক্তৃতা করা যায় যে, সারা বাংলার লোক বুঝিতে পারে। বুদ্ধদেবও বোধ হয়, সেইরূপ ভাষাতেই বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার ভাষা চম্পা অর্থাৎ ভাগলপুর হইতে শ্রাবস্তী অর্থাৎ বলরামপুর পর্যন্ত সমস্ত দেশের লোকেই বুঝিতে পারিত।

কিন্তু সে ভাষায় কেহ তাঁহার বক্তৃতা লিখিয়া লয় নাই। তখন সর্টহ্যাণ্ড টাইপিস্টও ছিল না, ছাপাখানার মামলাও ছিল না। লেখার উপকরণ, এখন যেমন সস্তা কাগজ হইয়াছে, তাহাও ছিল না। সুতরাং তাঁহার বক্তৃতাগুলি শুনিবার অনেক পরে, তাঁহার চেলারা আপনার মনে বুঝিয়া লিখিয়াছে ; যে যে-ভাষায় পারিয়াছে, সে সেই-ভাষায় লিখিয়াছে। কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে, সংস্কৃত ভাষায় যে-ছন্দে একটি কবিতা আছে, ঠিক সেই ছন্দে পালি ভাষাতেও সেই কবিতাটি আছে এবং প্রাকৃত ভাষাতেও সেই ছন্দে সেই কবিতাটি আছে। এইরূপে 'ধর্ম্মপদ' নামে যে বইখানি আছে, তাহা একটা সংস্কৃত, একটা পালি এবং একটা প্রাকৃত—তিন ভাষাতেই পাওয়া যায়। এখন এই যে তিনটা জিনিস, ইহাকে তিনটা ভিন্ন ভাষা বলিব কী?

আমার বোধ হয়, না বলাই ভালো। আমরা উহাকে পাঠ বলিব। এবং তাহার প্রমাণ আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে' ১৭ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে আছে—

ভাষা চতুর্ব্বিধা জ্ঞেয়া দশরূপে প্রয়োগতঃ।
সংস্কৃতং প্রাকৃতং চৈব তত্র পাঠ্যং প্রযুজ্যতে॥

অর্থাৎ ভাষা চার রকম, প্রত্যেকেরই দুই রকম করিয়া পাঠ ; একটার নাম সংস্কৃত,

আর-একটা পাঠের নাম প্রাকৃত। চারিটা ভাষা কী? তাহা ২৬-এর শোকে আছে—

অভিভাষার্য্যভাষা চ জাতিভাষা তথৈব চ।
তথা জাত্যন্তরী চৈব ভাষা নাট্যে প্রকীর্ত্তিতা॥

অর্থাৎ ভাষা চারিটি—অভিভাষা, আর্যভাষা, জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষা।

অভিভাষা কাহাকে বলে?—অভিভাষা তু দেবানাং।
আর্যভাষা কাকে বলে?—আর্যভাষা তু ভূভুজাম্।
এই দুই ভাষার লক্ষণ কী?
সংস্কৃতপাঠসংযুক্তা সম্যক্ গ্রামপ্রতিষ্ঠাতা।

অর্থাৎ উহাতে সংস্কৃত পাঠই বেশি এবং বড়ো বড়ো গ্রামে উহা প্রতিষ্ঠিত।

জাতিভাষা কাহাকে বলে?—

বিবিধা জাতিভাষা চ প্রয়োগে সমুদাহৃতা।
ম্লেচ্ছশব্দোপচারা চা ভারতং বর্ষমাশ্রিতা॥

অর্থাৎ জাতিভাষা বিবিধ, তাহাতে অনেক ম্লেচ্ছশব্দ থাকিবে। কিন্তু সে ভাষা ভারতবর্ষেরই ভাষা।

জাত্যন্তরী ভাষা কাহাকে বলে?—

অথ জাত্যন্তরী ভাষা গ্রামারণ্যপশূদ্ভবা।
নানাবিহঙ্গজা চৈব নাট্যধর্ম্মিপ্রয়োগজা॥

জাত্যন্তরী ভাষা গ্রামে পাওয়া যায়, বনে পাওয়া যায়, পশুদের মধ্যে পাওয়া যায়। এমন কি, বিহঙ্গদের মধ্যে পাওয়া যায়।

জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষার লক্ষণ কী?—

জাতিভাষাশ্রয়ং পাঠ্যং দ্বিবিধং সমুদাহৃতং।
সংস্কৃতং প্রাকৃতঞ্চৈব চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাশ্রয়ম্॥

অর্থাৎ জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষার দুই রূপ পাঠ আছে ; এক সংস্কৃত, আর এক প্রাকৃত। ইহা চারি বর্ণের মধ্যেই চলে।

মোটামুটি এই সকল কথা বলিয়া, নাটকে কোথায় সংস্কৃত ও কোথায় প্রাকৃত পাঠ দিতে হইবে, 'ভরতনাট্যশাস্ত্রে' তাহার বিশেষ বিবরণ আছে। বক্তৃতা বাড়িয়া যায় বলিয়া, সেকথা আমি আর উল্লেখ করিব না। যাঁহাদের ইচ্ছা হয়, তাঁহারা 'ভরতনাট্যশাস্ত্রে'র সতেরো অধ্যায়ের একত্রিশ হইতে তেতাল্লিশ পর্যন্ত তেরটি কবিতা পড়িয়া লইবেন। 'ভরতনাট্যশাস্ত্রে'র চুয়াল্লিশ কবিতা কী বলে শুনুন—

ন বর্ব্বরকিরাতান্ধ্রদ্রবিড়াদ্যাসু জাতিষু।
নাট্যযোগে তু কর্ত্তব্যং কাব্যাং ভাষাসমাশ্রয়ম্॥

অর্থাই বর্বর, কিরাত, দ্রবিড়াদি জাতির ভাষা লইয়া কাব্য করিবে না। কেন-না, সে-

সমস্ত ভাষা বোঝা যায় না।

পূর্বে জাতিভাষার কথা বলা হইয়াছে ; তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ জাতির ভাষা লইয়া কাব্য হইতে পারে? এ সম্বন্ধে 'ভরতনাট্যশাস্ত্র' বলিতেছেন—

মাগধ্যবন্তিয়া প্রাচ্যা শূরসেন্যর্দ্ধমাগধী।
বাহ্লীকা দাক্ষিণ্যাত্যা চ সপ্ত ভাষা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

(১৭ অধ্যায়, ৪৮ শ্লোক)

অর্থাৎ মাগধী, অবন্তিয়া, প্রাচ্যা, শূরসেনী, অর্ধমাগধী, বাহ্লীকা, দাক্ষিণ্যাত্যা—এই সাতটি ভাষা অর্থাৎ জাতিভাষা। আবার—

শবরাভীরচণ্ডালসচরদ্রবিড়োড্রজা।
হীনা বনেচরাণাঞ্চ বিভাষা নাটকে স্মৃতা॥

অর্থাৎ শবর, আভীর, চণ্ডাল, সচর, দ্রবিড়, ওড্র ইহাদের ভাষাও বুনো লোকের ভাষা, নাম বিভাষা। তাহা হইলে বুঝা গেল যে, জাতিভাষা—মাগধী, আবন্তী, প্রাচ্যা, শূরসেনী, অর্ধমাগধী, বাহ্লীকা ও দাক্ষিণ্যাত্যা এই ভাষাগুলিই প্রশস্ত। আর শবর, আভীর, চণ্ডাল, সচর, দ্রবিড়, ওড্র ও বুনোদের ভাষা প্রশস্ত নয় ; তবে দরকার হইলে ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু বর্বরাদি কয়েকটি জাতির ভাষা একেবারেই ব্যবহার হইবে না।

এসব হইল জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষা। ইহারো দুই রূপ পাঠ—সংস্কৃত ও প্রাকৃত। আর তাহা হইলে দাঁড়াইল এই শৌরসেনীর সংস্কৃত পাঠও আছে ; প্রাকৃত পাঠও আছে ; মাগধীর সংস্কৃত পাঠও আছে, প্রাকৃত পাঠও আছে ; আবন্তীর সংস্কৃত পাঠও আছে, প্রাকৃত পাঠও আছে ; এইরূপ সব জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষার সংস্কৃত ও প্রাকৃত, দুই রূপই পাঠ আছে।

অভিভাষা ও আর্যভাষার পাঠ সংস্কৃতেই অধিক। যিশু খৃস্টের জন্মের পাঁচ-ছয় শত বৎসর পূর্বে আর্যাবর্তে ভাষার এইরূপ একটা বিভ্রাট ছিল ; তাহার উপর একটা পাঠেরও বিভ্রাট ছিল। আমরা যেমন এখন সংস্কৃত বলিতে একটা ভাষা বুঝি, তখন দেখিতেছি, সেইরূপ কেহ বুঝিত না। সকল জাতি বা সকল দেশের ভাষাতেই দুইটা করিয়া পাঠ ছিল। ইহাতে বিভ্রাট আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। 'ভরতনাট্যশাস্ত্রে' বলে, বন্য পক্ষীরও ভাষা ছিল এবং তাহারো দুই রকম পাঠ ছিল।

আর-একটা ব্যাপারে এই বিভ্রাট আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের জন্মের একশত বৎসরের পর, দুই শত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধদের ভিতরে একটা মস্ত দলাদলি হয়। অনেক চেষ্টাতেও সে দলাদলি মিটিল না, দুইটা দল হইয়া গেল। একটা হইল থেরবাদ বা স্থবিরবাদ ; ইঁহারা বই লিখিতে লাগিলেন চলিত ভাষায়—প্রাকৃত পাঠে। ইহা তিন-চারি শত বৎসর পরে পালিতে গিয়া দাঁড়াইল। আর-একদল হইল মহাসাংঘিক অর্থাৎ ইঁহারা দলে পুরু। ইঁহারা বই লিখিতে লাগিলেন, একটা নূতন রকম ভাষায় ; তাহার

নাম সেনার সাহেব [Emile Charles Marie Senart] লিখিয়াছেন—mixed Sanskrit। কেহ কেহ বলেন, Sanskritized vernacular। কেহ কেহ বলেন, venacularised Sanskrit। 'কাব্যাদর্শে' আমরা দেখিতে পাই, মিশ্রভাষা বলিয়া একটা ভাষা ছিল। আমরা মহাসাংঘিকদিগের বইগুলি মিশ্রভাষায় লিখিত বলিয়া বলিব। একই বাক্যের মধ্যে কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র মানিয়া চলে, আর কতকগুলি শব্দ প্রাকৃতের সূত্র মানিয়া চলে। আবার কোথাও কোথাও কোনো সূত্রই মানে না। এ ভাষায় প্রথম বই 'মহাবস্তু'। উহা মহাসাংঘিকদের "বিনয়"। কিন্তু উহাতে ধর্ম, বিনয়, সূত্র সব একত্রে মিশানো আছে। বইখানি বোধ হয়, দলাদলির পর লেখা হইয়াছিল। কিন্তু সেনার সাহেব বলেন, উহাতে যোগাচার সম্প্রদায়ের নাম আছে। সুতরাং উহা যিশু খৃস্টের পাঁচ শত বৎসর পরের লেখা। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, যে-যে স্থানে যোগাচার শব্দ আছে, সে-সে স্থানে উহা যোগাচার সম্প্রদায়ের নাম নহে, যোগ ও আচারের কথা। সুতরাং সেনার সাহেবের কথা এখানে মানিয়া চলা যায় না। আর যদি না যায়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে, দলাদলির পর এই বই লেখা হয়। বুদ্ধের জীবনচরিত 'ললিতবিস্তর' নামে বই যদিও অ-পাণিনেয় ও ভাষা-বিরুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা, তথাপি উহার প্রতি অধ্যায়ের শেষে মিশ্রভাষায় কতকগুলি কবিতা দেওয়া থাকে। সেই কবিতাই মূল সংস্কৃত অংশের প্রমাণস্বরূপ। 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক' নামে আর-একখানি সংস্কৃত বই আছে, উহাও ঐরূপ সংস্কৃতে লেখা, উহারো প্রতি অধ্যায়ের শেষে প্রমাণস্বরূপ মিশ্রভাষায় কতকগুলি শ্লোক আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাক্‌লামাকান মরুভূমি খুঁড়িয়া 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকে'র যে-সকল পাতা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অধ্যায়ের গোড়াটাও সংস্কৃতে নয়, মিশ্রভাষায়। 'রত্নসঞ্চয়গাথা' নামে আর-একখানি পুথি আছে, সেখানি 'শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র সারসংগ্রহ। সেখানি সমস্তটাই মিশ্রভাষায় লেখা। অনেক জায়গার ছোটো ছোটো শিলালেখ মিশ্রভাষায় লেখা। মিশ্রভাষার দুই-চারিটা উদাহরণ গদ্যেও দিতেছি, পদ্যেও দিতেছি—

"কল্পান শতসহস্রং সংধাবিত্বান বোধিপরিপাকং।
সুচিরস্যন্তরতনো বুদ্ধো লোকস্মিং উপপন্নো॥

ইত্থং বদিত্বান তে সংবহুলাঃ শুদ্ধাবাসকায়িকা দেবপুত্রা মম পাদৌ শিরসা বন্দিত্বা প্রক্রামি।" (মহাবস্তু ৫৬ পত্র)।

"অদ্দশাসি মহামৌদ্‌গলায়ন মেঘো মাণবা ভগবতং দীপংকরং দূরতো যেন আগচ্ছন্তং দ্বাত্রিংশতীহি মহাপুরুষলক্ষণেহি সমন্বাগতমশীতিহি অনুব্যঞ্জনেহি উপশোভিতশরীরং অষ্টাদশেহি আবেণিকেহি বুদ্ধধর্ম্মেহি সমন্বাগতং দশহি তথাগতবলেহি বলবং চতুর্হিবৈশারদ্যেহি সমন্বাগতং।" (মহাবস্তু, ২৩৭ পত্র)।

ঐ পাতে—"চিরস্য চক্ষু উদপাসি লোকে

চিরস্য উৎপাদো তথাগতানাং।
চিরস্য মহ্যং প্রণিধে সমৃদ্ধা।
বুদ্ধো ভবিষ্যামি ন মে চ সংশয়ঃ॥

এই মিশ্রভাষা লইয়াও আর-একটা বিভ্রাট হইল। মহাসাংঘিকেরা বলেন, বুদ্ধদেব এই ভাষাতেই বক্তৃতা করিতেন ও উপদেশ দিতেন। মহাসাংঘিকদিগেরই উত্তরাধিকারী মহাযান মতাবলম্বীরা বলেন, বুদ্ধদেব সংস্কৃত ভাষাতেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'প্রজ্ঞাপারমিতা' নামে বইগুলি সংস্কৃতে লেখা, বহুদিন লুকানো ছিল, নাগার্জুন পাতাল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং এ কথাটায় বিভ্রাট আরো বাড়িয়া গেল।

এতক্ষণ যে-সকল কথা বলিলাম, সে-সমস্ত অতি প্রাচীন কালের কথা। খৃস্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধদের মধ্যে একটা মত প্রচলিত ছিল যে, বুদ্ধদেব সর্বজ্ঞ ভাষায় ধর্ম উপদেশ দিয়াছিলেন, সে ভাষায় হরি, হর, ব্রহ্মা কেহই ধর্ম উপদেশ দিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষা ইতর প্রাণীরাও বুঝিতে পারিত—"এবং দ্বাদশখণ্ডেষু স্বর্গমর্ত্তপাতালেষু নানাসত্ত্বরুতৈঃ সঙ্গীতিকারকৈঃ যানত্রয়ং লিখিতং * * * * * ভগবান সর্ব্বজ্ঞভাষয়া ধর্ম্মদেশকঃ নান্যো হরিহরাদিনাং।"

সুতরাং আমাদের দেশেও অনেক দিন হইতে একটা মত চলিতেছিল যে, বুদ্ধদেব যে ভাষায় কথা কহিতেন, তাহা সকল দেশের লোকেই বুঝিতে পারিত, ইতর প্রাণীরাও বুঝিতে পারিত। ইতব প্রাণীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও বুদ্ধদেব যে ভাষায় কথা কহিতেন, আর্যাবর্তে সমস্ত দেশের লোকই তাহা বুঝিতে পারিত। সে ভাষা যে কী, তাহা জানিবার উপায় নাই। বুদ্ধদেবের সময়ে যে ভাষা চলিত ছিল, তাহার একটি মাত্র বাক্য (sentence) পাওয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার সময়ে রাজবাড়িতে ট, ঠ, ড, ঢ, শ, ষ, হ, ক্ষ উচ্চারণ হইত না এবং সংযুক্ত অক্ষরও চলিত না। বুদ্ধদেবের নির্বাণের পর তাঁহার বড়ো বড়ো চেলারা আপনার আপনার দেশের ভাষায় স্মৃতিশক্তির সাহায্যে বুদ্ধদেবের বক্তৃতাগুলি লিখিয়া রাখিতেন। ক্রমে বৎসরের পর বৎসর এবং শত বৎসরের পর শত বৎসর যাইতে যাইতে সেই লেখাগুলি কোথাও পালিতে, কোথাও প্রাকৃতে, কোথাও মিশ্রভাষায় লেখা হইল। তাহার পর আর্যাবর্তে যিশু খৃস্টের জন্মের সময় এক রকম সংস্কৃতে সেই বক্তৃতাগুলি লেখা হইত। পূর্বেই বলিয়াছি, সে সংস্কৃত অ-পাণিনেয় ও ভাষ্য-বিরুদ্ধ। ক্রমে এই অ-পাণিনেয় ও ভাষ্য-বিরুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার কী আকার হইয়াছিল, তাহার একটা উদাহরণ দিই, "তেষাং চ সুশব্দ বাদিনাং সুশব্দগ্রহবিনাশায় অর্থশরণতাং আশ্রিত্য ক্বচিৎ বৃত্তে অপশব্দ। ক্বচিৎ বৃত্তে যতিভঙ্গ, ক্বচিৎ অবিভক্তিকং পদং। ক্বচিৎ বর্ণস্বরো লোপ, ক্বচিৎ বৃত্তে দীর্ঘে হ্রস্ব। হ্রস্বেঽপি দীর্ঘ। ক্বচিৎ পঞ্চম্যর্থে সপ্তমী, চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। কুত্রচিৎ পরস্মৈপদিনাং ধাতৌ আত্মনেপদং। আত্মনেপদিনি পরস্মৈপদং। ক্বচিৎ একবচনে বহুবচনং, বহুবচনে একবচনং।

পুংলিঙ্গে নপুংসকলিঙ্গং, নপুংসকলিঙ্গে পুংলিঙ্গং। ক্বচিৎ তালব্যশকারে দন্ত্যমূর্দ্ধন্যে। ক্বচিৎ মূর্দ্ধন্যে দন্ত্যতালব্যৌ। ক্বচিৎ দন্ত্যে তালব্যমূর্দ্ধন্যৌ এবং অন্যেপি অনুসর্ত্তব্যাঃ। তন্ত্রদেশকোপদেশেন ইতি।" ('লঘু কালচক্রতন্ত্ররাজটীকা', 21A)।

ঐ পত্রেই আরো আছে, "এবং টীকায়ামপি সুশব্দভিধাননাশায় লিখিতব্যং ময়া অর্থশরণতামাশ্রিত্য ইতি। অথ যেন যেন প্রকারেণ কুলবিদ্যা সুশব্দাভিমানক্ষয়ো ভবতি তেন তেন প্রকারেণ অর্থশরণতামাশ্রিত্য বুদ্ধানাং বোধিসত্ত্বানাং ধর্ম্মদেশনা দেশভাষান্তরেণ শব্দশাস্ত্রভাষান্তরেণ মোক্ষার্থং।"

অর্থাৎ আমরা ব্যাকরণশাস্ত্র মানিব না, আমাদের মানেটা লোকে যাহাতে বুঝিতে পারে, তাহাই করিয়া লিখিব। সুশব্দটা কেবল অভিমান মাত্র ; ওটা ক্ষয় না হইলে মোক্ষ হইবে না।

কত ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ লেখা হইয়াছে, তাহার একটা তালিকা প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক হইতে দিয়া আমি এ বক্তৃতা শেষ করিব—

'ইহ তথাগতাভিসংবুদ্ধ আর্য্যবিষয়ে ভগবতি পরিনির্বৃতে সতি সঙ্গীতিকারকৈঃ যানত্রয়ং পুস্তকে লিখিতং। তথাগতনিয়মেন পিটকত্রয়ং মগধভাষয়া। সিন্ধুভাষয়া সূত্রান্তং। সংস্কৃতভাষয়া পরিমিতানয়ং। মন্ত্রনয়ং তন্ত্রতন্ত্রান্তরং সংস্কৃতভাষয়া প্রাকৃতভাষয়া অপভ্রংশভাষয়া অসংস্কৃতশবরাদিম্লেচ্ছভাষয়া। ইত্যেবমাদিঃ সর্ব্বজ্ঞেন দেশিতো ধর্ম্মঃ সঙ্গীতিকারকৈঃ লিখিতঃ। তথা ভোটবিষয়ে যানত্রয়ং ভোটভাষয়া লিখিতং। চীনে চীনভাষয়া। মহাচীনে মহাচীনভাষয়া। পারসীকদেশে পারসীকভাষয়া। সীতানদ্যুত্তরে চম্পকবিষয়ভাষয়া। বানরবিষয়ভাষয়া। সুবর্ণাক্ষবিষয়ভাষয়া। তথা নীলানদ্যুত্তরে রুম্মাখ্যবিষয়ভাষয়া। তথা হিমবন্ত তস্যোত্তরে সূরম্মবিষয়ভাষয়া। এবং কোটিকোটিগ্রামাত্মকেষু ষণ্ণবতিবিষয়েষু ষণ্ণবতিবিষয়ভাষয়া। এবং দ্বাদশখণ্ডেষু স্বর্গমর্ত্তপাতালেষু নানাসত্ত্বরুতৈঃ সঙ্গীতিকারকৈঃ যানত্রয়ং লিখিতমিতি। শ্রাবকৈঃ শ্রাবকযানং। প্রত্যেকৈঃ প্রত্যেকযানং। বোধিসত্ত্বৈঃ পারমিতামহাযানং মন্ত্রমহাযানং হেতুফলাত্মকং নানাসঙ্গীতিকারকৈঃ সত্ত্বানাং বৈনেয়ার্থং। অনয়া নানাসঙ্গীতিকারকৈঃ নানাবিষয়ভাষয়া লিখিতাগমযুক্ত্যা বিচার্য্যমানো বুদ্ধভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞভাষয়া ধর্ম্মদেশকঃ নান্যো হরিহরাদীনাং।"

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৩৩॥

বাংলার বৌদ্ধ সমাজ ঃ হিন্দু ও বৌদ্ধ

বাংলা দেশে কিরূপে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে গিলিয়া ফেলিয়াছে, সেই কথাটা আজ

কিছু বলিব। যখন আফগানেরা বাংলা দখল করেন, তখন পূর্বভারতের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ছিল। তাহার পূর্বে পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরাই বাংলা ও বিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেনেরা ইহার মধ্যে একশত বৎসর ধরিয়া বাংলার একাংশে রাজা ছিলেন মাত্র। পালেরা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা যে সুদ্ধ বাংলা ও বিহারে রাজত্ব করিতেন, এমন নহে ; এ দুয়ের বাহিরে অনেক দেশে তাঁহাদের অধিকার ছিল। একশত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা পেশোয়ার হইতে গোদাবরীর মুখ পর্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। বাংলা ও মগধের বৌদ্ধ সাহিত্য, বৌদ্ধ ব্যাকরণ, বৌদ্ধ কোষ, বৌদ্ধ শাস্ত্র, বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধ শিল্প ও বৌদ্ধ সভ্যতা সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ ছাইয়া গিয়াছিল।

ইংরাজি ৭৩২ অব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বাংলায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি বাংলায় বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক সভ্যতা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কুমারিলের প্রভাবে তাঁহারা বাংলায় আসিয়াছিলেন এবং আসিয়া অবধি তাঁহারা প্রভাব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কয়জন ছিলেন? বল্লালসেন তাঁহাদের সংখ্যা করিয়াছিলেন ; দেখিয়াছিলেন, ৩৫০ ঘর রাঢ়ী ও ৪৫০ ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মাত্র বাংলায় ছিলেন। তাহার উপর আর ৭০০ ঘর সাতশতী, আর ৫০০ ঘর বিদেশীয় ব্রাহ্মণ ধরিলেও ২০০০ ঘরের বেশি ব্রাহ্মণ এ দেশে ছিলেন না। ২০০০ ঘর ব্রাহ্মণে বাংলায় ২৫টা জেলা হিন্দু করা যায় না, উহার দশ ভাগের এক ভাগও হিন্দু করা যায় না। সুতরাং এ অঞ্চলে অধিকাংশ বৌদ্ধ ও সামান্য অংশ হিন্দু ছিলেন।

কেমন করিয়া এই ২০০০ ঘর ব্রাহ্মণে এই বিশাল দেশকে ৭০০ বৎসরের মধ্যে হিন্দু করিয়া তুলিয়াছেন, বৌদ্ধের নাম পর্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছেন, তাহা একটা মহা-সমস্যা, একটা বিরাট ব্যাপার, একটা রহস্যময় ঘটনা। বাংলা দেশ যে বৌদ্ধময় হইয়া গিয়াছিল, তাহা এখন রিসার্চ করিয়া বাহির করিতে হয়। প্রথম তো বিশ্বাসই হয় না, তাহার পর ঘাড় পাতিয়া লইতে হয়। একবার ঘাড় পাতিয়া লইলে চক্ষু ফুটে—তখন বাংলার অনেক রহস্য জলের মতো বুঝিতে পারা যায় ; বৌদ্ধদের অমিত শক্তি অনুভব করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বাঙালি ব্রাহ্মণের অমিত শক্তি, অমিত ধৈর্য ও অমিত পরাক্রম স্মরণ করিয়া আশ্চর্য হইতে হয়।

বাংলায় যদি কোনো ইতিহাসের গূঢ় কথা থাকে, যদি কোনো নিগূঢ় কথা থাকে, তবে তাহা এই। রহস্য-জাল ভেদ করিয়া এই কথাটি খুলিয়া দিলে বাঙালির চক্ষু স্পষ্ট দেখিতে পায়—তাহারা কী ছিল, কী হইয়াছে ও ভবিষ্যতে কী হইতে পারে। অতীতে তাহাদের অগৌরবের কিছুই নাই, সবই গৌরবময়। ভবিষ্যতের গৌরব অগৌরবের কথা তাহাদের নিজের হাতে।

ছেলেবেলা গল্প শুনিতাম, যদি একটি কাঁচপোকা ও একটি আরশুল্লাকে একটা শিশি বা বোতলের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা যায়,তাহা হইলে কিছুদিন পরে দেখিতে পাওয়া

যাইবে, আরশুল্লাটা কাঁচপোকা হইয়া গিয়াছে; দুইটাই কাঁচপোকা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের ইতর বিশেষ করা যায় না। মুসলমান অধিকাররূপ শিশিতে বা বোতলে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই জাতিকে বন্ধ রাখিয়া এই সাত শত বছরের পর দেখা যাইতেছে, দুই-ই এক হইয়া গিয়াছে, ইতর বিশেষ করা যায় না। আবার ইংরাজ অধিকাররূপ বোতলে হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি বন্ধ হইয়া থাকিলে, কয়েক শত বৎসর পরে তাহারা যে এক হইয়া যাইবে না, ইহা কে বলিতে পারে? এখনই তো অনেকে বলেন যে, এই যে মুসলমান জাতি এখন বাংলা দেশে অর্ধেকের উপর বলিয়া গর্ব করিতেছেন, ইঁহারা সেই বিশাল বৌদ্ধসমাজের একদেশ মাত্র। অর্থাৎ বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান একজাতি মাত্র।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে?

হিন্দু ও বৌদ্ধ, এই দুই জাতি লইয়া যখন বাংলা দেশ, তখন হিন্দু কাহাকে বলে ও বৌদ্ধ কাহাকে বলে, এটা ঠিক করিয়া লওয়া বড়ো দরকার। লোকে বলিবে, এ তো সহজ কথা, এর আবার ঠিক করা কী? সহজ কথাই বোঝা যায় না। সকলেই মনে জানে, আমি ঠিক বুঝি; কিন্তু জেরায় টিকে না। অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা মনে করেন যে, বৌদ্ধ বলিতে সুদ্ধ ভিক্ষুসমাজ বুঝায়; কেন-না, বুদ্ধদেব নিজে ভিক্ষুসমাজ লইয়াই থাকিতেন। তাঁহার বিনয় ভিক্ষুদের জন্য, তাঁহার যত কিছু আইন-কানুন, পাচিত্তিয় পারাজিকা ভিক্ষুদের জন্য। সুতরাং বৌদ্ধ বলিতে গেলে ভিক্ষুসম্প্রদায় ছাড়া আর-কিছু বুঝায় না।

আর-একদল বলেন, না। গৃহস্থ-বৌদ্ধও ছিল, যাহারা ব্রাহ্মণ মানিত না। ভিক্ষুদের কাছে ধর্ম ও নীতি উপদেশ লইত। ভিক্ষুদের খাওয়াইত, আদর করিত, ভিক্ষুদের জন্য বিহার, সংঘারাম তৈয়ার করিয়া দিত, ভিক্ষুদের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিত, তাহাদের অন্তর্বাস বহির্বাস জোগাইত, তাহারাই গৃহস্থ-বৌদ্ধ। ভিক্ষুরা তো রোজগার করিত না, ভিক্ষা করিয়া খাইত। যাহারা তাহাদের ভিক্ষা দিত, তাহারাই গৃহস্থ-বৌদ্ধ। একজন ভিক্ষু তিন বাড়ির অধিক চারি বাড়িতে ভিক্ষা লইতে পারিত না। যে বাড়িতে একবার ভিক্ষা পাইয়াছে, এক মাসের মধ্যে আর সে বাড়িতে যাইতে পারিত না। সুতরাং একজন ভিক্ষুর জন্য ৯০ ঘর গৃহস্থ-বৌদ্ধের দরকার হইত। ইহার উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, হিন্দুরাও তো ভিক্ষা দিত; তাহারাও ভিখারি ফিরাইত না। সুতরাং গৃহস্থ-বৌদ্ধ না থাকিলেও গৃহস্থ হিন্দুর দ্বারাই ভিক্ষুদের ভরণ-পোষণ হইতে পারিত।

আর একদল বলেন যে, না। বুদ্ধদেব ভিক্ষুর জন্য দশ শীল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু ধার্মিক-গৃহস্থের জন্য অষ্ট শীল, আর অপরাপর গৃহস্থের জন্য পঞ্চ শীল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সুতরাং গৃহস্থ-বৌদ্ধ অনেক ছিল। বৌদ্ধ-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য—সংসার ত্যাগ বা ভিক্ষু হওয়া। সুতরাং যে-গৃহস্থ সেই উদ্দেশ্যের দিকে যত অগ্রসর হইতে

থাকিবে, তাহার তত সম্মান ও আদর হইবে। তাহা হইলেও পঞ্চ শীল লইবার জন্য যে শিক্ষা দীক্ষা প্রয়োজন হইত, তাহাই বা কজনের ছিল? অথচ শুনিতে পাওয়া যায়, গ্রামকে গ্রাম, নগরকে নগর, দেশকে দেশ বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা কিরূপে হইতে পারে?

অতএব সব বৌদ্ধকে ভুক্ত করিয়া লইতে পারে, এমন একটা বৌদ্ধের লক্ষণের দরকার হইল। সে লক্ষণ দেখা দিল এগারো শতকে। তিন জন গুপ্ত একখানি বই লিখিয়া বইখানির নাম দিলেন—'আদিকর্ম্ম-রচনা'। তাঁহারা বলিলেন, যে-কেহ প্রাতঃকালে উঠিয়া বলিবেন—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি ও সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, তিনিই বৌদ্ধ। অনেক দিন ধরিয়া এই তিনটি মন্ত্র শিখাইবার জন্য পুরোহিত দরকার হইত না, কিন্তু পরে হইয়াছিল। সুতরাং যাহার জন্য পুরোহিত দরকার হইত না, উপাসক নিজেই ইচ্ছা করিলে মন্ত্র লইতে পারিতেন, তাহার দ্বারা যে ধর্মের শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে আশ্চর্য কী? আপামর সাধারণ আপনি আপনি এই তিনটি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতেন। বৌদ্ধের সংখ্যা বাড়িয়া যাইত।

কিন্তু "শীল" দিবার সময় বড়ো গোল বাধিত। যাহারা মাছ ধরিয়া খায়, মাছ ধরা, শিকার করা যাহাদের জাতীয় ব্যবসায়, চুরি করা যাহাদের জাতীয় ব্যবসায়, তাহারা শীল লইতে পারিত না। বৌদ্ধধর্মে তাহাদের ধর্ম বিষয়ে উন্নতি লাভের আশা থাকিত না। তবে তাহারা জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, হালিকাদি ব্যবসায় আরম্ভ করিলে, তাহাদিগকে শীল দিবার কোনো আপত্তি থাকিত না। যাহারা জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িত না, তাহারা হয় বৌদ্ধধর্মের সর্বনিম্ন স্তরে পড়িয়া থাকিত, অথবা তাহাদের জন্য ধর্মান্তরের ব্যবস্থা হইয়াছিল। যথা—কৌলধর্ম, মৎস্যেন্দ্রনাথের ধর্ম, মীননাথের ধর্ম, গোরক্ষনাথের ধর্ম ইত্যাদি।

একবার বৌদ্ধ হইলে, সে পঞ্চ শীল লইতে পারিত, অষ্ট শীল লইতে পারিত, দশ শীল লইয়া ভিক্ষু হইতে পারিত; ভিক্ষু হইলে ক্রমে উন্নতি করিয়া স্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী, অনাগামী, অর্হৎ এবং পরে বোধিসত্ত্ব হইয়া বুদ্ধ বা জগদ্‌গুরু হইতে পারিত। কিন্তু সে-সকল জন্ম-জন্মান্তরসাধ্য।

হিন্দু কাহাকে বলে?

যাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন দেবতার পূজা হয় না, ধর্ম উপদেশ পাওয়া যায় না, তাঁহারাই হিন্দু। হিন্দুরা জাতিভেদ মানেন। এক জাতিতে জন্মিলে এ জন্মে আর উচ্চ জাতিতে যাওয়া যায় না, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহারাই হিন্দু। যাঁহারা দেবতা মানেন, কিন্তু দেবতা হইতে চান না, তাহারাই হিন্দু। ব্রাহ্মণ হিন্দুদের মধ্যে সকলের উঁচু। ধর্ম নীতি তাঁহাদেরই হাতে। ক্ষত্রিয়েরা দেশ শাসন করেন। বৈশ্যেরা কৃষি, পশু-

পালন ও বাণিজ্য করেন। শূদ্রেরা উপরের তিন জাতির সেবা করেন। বাংলায় কিন্তু ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ভিন্ন জাতি নাই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বাংলায় লোপ পাইয়াছে অর্থাৎ তাঁহারা বৌদ্ধ হইয়া জাতিভেদের হাত এড়াইয়াছেন।

ব্রাহ্মণের সকল বই-ই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সংস্কৃত ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ পড়িতে পারিবে না ' যাঁহারা হিন্দু হইয়া শূদ্র-শ্রেণীভুক্ত, তাঁহারা সংস্কৃত শিখিতে পারিবেন না। কিন্তু বৌদ্ধেরা—বিশেষ বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা সংস্কৃত পড়িতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের সংস্কৃত পড়া বন্ধ করিতে পারেন নাই। অনেক সময় বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের লেখা বই তাঁহাদিগকে পড়িতে হইত ও পড়াইতে হইত; তাহা তাঁহারা অম্লানবদনে করিতেন। কিন্তু তাঁহারা বৌদ্ধদের সংস্কৃতকে অশুদ্ধ বলিতেন ও তাহা পড়িয়া নাক সিটকাইতেন। বৌদ্ধেরা বলিতেন, আমরা সুশব্দবাদী নহি সত্য, কিন্তু আমরা যাহা বলি, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত ও সত্য। বৌদ্ধেরা অন্য ভাষায়ও বই লিখিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত ছাড়া প্রধানত অন্য ভাষায় বই লিখিতেন না।

ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-দলভুক্ত লোকদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি সামাজিক সম্বন্ধ রাখিতেন। এবং নিতান্ত নীচধর্মী ও নীচকর্মী লোক ভিন্ন আর-কাহাকেও অস্পৃশ্য বলিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের মতে হিন্দু ভিন্ন আর-সকল জাতিই অনাচরণীয় ছিল। অর্থাৎ যুদ্ধের সময় যেমন শত্রুপক্ষকে বড়ো এবং ছোটো সকল প্রকার সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করা হয়, তেমনি হিন্দুরা বিধর্মীদিগকে অনাচরণীয় মনে করেন। তাঁহাদের মতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বলাইলেও তাহারা অনাচরণীয়। কারণ, তাহারা বিদেশী ও বিধর্মী। মুসলমানেরা অনাচরণীয়, যেহেতু তাহারা বিধর্মী। বৌদ্ধেরাও অনাচরণীয়। এই-সকল অনাচরণীয় জাতিরা অনেকে এখন ব্রাহ্মণ লইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা সেই-সকল ব্রাহ্মণকে পতিত ও অনাচরণীয় মনে করেন।

পূর্বকালে যখন বৌদ্ধেরা প্রবল ছিলেন, তাঁহারাও হিন্দুদিগকে অনাচরণীয় মনে করিতেন। এ সম্বন্ধে 'চতুঃশতিকা' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকায় চন্দ্রকীর্তি একটি গল্প দিয়াছেন—একটি যুবক সর্বদা এক বৌদ্ধ বিহারে যাতায়াত করিত এবং বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের খুব সম্মান করিত। ভিক্ষুরা তাহাকে দীক্ষা দিবার জন্য বড়োই আগ্রহ করিতেন। সে দীক্ষা লইত না, বলিত—এখনো দেরি আছে। তিন-চারি মাস পরে সে একদিন আসিয়া বলিল, আমার দীক্ষা লইবার সময় হইয়াছে। ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন হয় নাই, এখন হইয়াছে কেন? সে বলিল, এখন আমার ব্রাহ্মণ দেখিলেই মনে হয়, ইহাকে এক কোপে কাটিয়া ফেলি; সুতরাং আমার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ঠিক সময় হইয়াছে। সুতরাং অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় করার জন্য এখন যে ব্রাহ্মদিগকেই দোষী করা হয়, সেটা ঠিক নয়। সকল ধর্মের লোকই বিরুদ্ধ ধর্মের লোককে অনাচরণীয় করিয়া থাকে। অনেক জায়গায় একেবারে তাহাদের বিনাশ সাধনও করিয়া থাকে।

যাহারা সংসার ধর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, হিন্দুরা তাহাদের খুব সম্মান করেন। কিন্তু যদি সে আবার সংসারে আসিতে চায় অথবা আসে, তাহাকে তাঁহারা মনে করেন— পতিত ও অনাচরণীয়। অনেক জাতীয় যোগী এইরূপ হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের চক্ষে অনাচরণীয় হইয়া আছে। যাহারা সংসার ছাড়িয়া গেল, তাহারা চতুর্বর্ণ সমাজও ছাড়িয়া গেল। আবার ফিরিয়া আসিলে তাহারা চতুর্বর্ণ সমাজের বাহির অর্থাৎ অনাচরণীয় হইয়া রহিল।

বৌদ্ধ-সাহিত্য।।

যখন বৌদ্ধধর্মের খুব প্রাদুর্ভাব, তখন তাঁহারা সংস্কৃতে বই লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা প্রথম চলিত ভাষায় বই লিখিতেন। প্রবল প্রতাপের সময় তাঁহারা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করিবার জন্য চলিত ভাষা ছাড়িয়া সংস্কৃতে বই লিখতেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা ব্রাহ্মণের ব্যাকরণ পাণিনি লয়েন নাই। অন্য নানা ব্যাকরণের সাহায্যে বই লিখতেন। পরে তাঁহারা নিজেদের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং এইরূপ ব্যাকরণ কয়েকখানা খুব চলিয়াও যায়। তাহার পর তাঁহারা পাণিনির টীকা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই টীকায় তাঁহারা পতঞ্জলির মহাভাষ্যকে এক হিসাবে ছাঁটিয়া ফেলিতে চান। তাঁহাদের পাণিনির টীকা বাংলায় খুব চলিয়া যায়।

কোষে তাঁহাদের অসীম প্রভুত্ব। তাঁহাদের 'অমরকোষ' সকলকেই লইতে হইয়াছিল। 'অমরকোষে'র যত পরিশিষ্ট আছে, প্রায় সবই তাঁহাদের। আরো অনেক কোষ তাঁহাদের লেখা। কোষের তিন অঙ্গ—পর্যায়, অনেকার্থ ও লিঙ্গ। তিন বিষয়েই তাঁহাদের অনেক বই আছে। ব্রাহ্মণেরাও সেই-সকল বই পড়েন, পড়ান ও তাহাদের টীকা লিখেন।

ছন্দেও তাঁহাদের ভালো ভালো বই আছে। তাঁহারা পিঙ্গল নাগের অনুসরণ করিয়া ছন্দের বই লিখিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, ভামহ বৌদ্ধ ছিলেন। তাহা হইলে অলংকারে তাঁহাদের প্রভুত্ব খুবই বলিতে হইবে। কারণ, ভামহ অতি প্রাচীন। তাঁহারই বই অনেকে অলংকারের চলিত বইয়ের মধ্যে প্রথম বলিয়া মনে করেন। কাশ্মীরে ব্রাহ্মণেরা কিন্তু অলংকারে সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন।

বানানের বই বৌদ্ধদের ঢের বেশি। আমার বোধ হয়, বাঙালি বৌদ্ধেরাই বেশি বেশি বানানের বই লিখেন এবং তাহাদের প্রভাব এখনো চলিতেছে। কারণ, বাঙালির সংস্কৃত উচ্চারণ অন্য দেশের সংস্কৃত উচ্চারণ হইতে অনেক তফাত। তাই এইখানে বানানের বইয়ের বেশি দরকার হয়।

এ তো গেল শব্দশাস্ত্রের কথা। দর্শনেও বৌদ্ধদের প্রভাব ঢের বেশি। তাঁহাদের দর্শন সমস্ত এশিয়া এখনো পড়িতেছে, পড়াইতেছে ও তাহার টীকা-টিপ্পনী লিখিতেছে। তাঁহাদের তর্কশাস্ত্রেরও সেইরূপ এশিয়ায় সর্বত্র আদর। এখনো জাপানে বৌদ্ধ-মন্দিরে

বৌদ্ধ-তর্কশাস্ত্র পড়া হয়, এবং ইউনিভার্সিটিতে ইউরোপীয় লজিক পড়ানো হয়। এই দুই দলে সময়ে সময়ে তর্ক বাধে, কিন্তু ভারতীয় বৌদ্ধ-তর্কশাস্ত্রেরই প্রায় জয়লাভ হইয়া থাকে, এবং শিক্ষিত লোকে এই বাদানুবাদের খুব উৎসাহ দিয়া থাকেন।

বৌদ্ধদের গল্পের বইগুলি অতি চমৎকার। পালিভাষার কথা আমার এখানে বলার কোনো দরকার নাই। সংস্কৃতে বৌদ্ধদের দুই জাতীয় গল্প আছে—১. জাতক. ২. অবদান। জাতক বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের কথা, আর অবদান বুদ্ধদেব ও তাঁহার চেলাদের পূর্বজন্মের কথা। সকল দেশের গল্পই একটা কাঠামোতে গাঁথা থাকে। 'আরব্য উপন্যাসে'র একরূপ কাঠামো, 'কথাসরিৎসাগরে'র আর-একরূপ কাঠামো। বৌদ্ধদের কাঠামো নাই; সব গল্পগুলিই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। বৌদ্ধদের গল্পে পশুপক্ষী ও ইতর জন্তুর কথাও আছে। 'কথাসরিৎসাগর' ও 'আরব্য উপন্যাসে' তাহা নাই। বরং আমাদের 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র', 'বেতালপঁচিশী' ও 'বত্রিশ সিংহাসনে' জন্তু জানোয়ারের কথা অনেক। সেগুলিরই একটা কাঠামো আছে। খুব আঁট কাঠামো নহে; বড়ো আলগা। বৌদ্ধদের কাঠামোই নাই।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক যদি কাব্য নাটক লিখিতে বসেন, জিনিসটা একঘেয়ে হইয়া যায়। বৌদ্ধদের কাব্য নাটক যে এরূপ একঘেয়ে নয়, সেকথা বলা যায় না। তবে তাহাতে কল্পনার খুব দৌড় আছে এবং সৌন্দর্যও খুব সৃষ্টি হইয়াছে। অন্য সম্প্রদায়ের লোকও তাহা পড়িলে তাহার মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদগুণে মুগ্ধ হইয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের কাব্য নাটক পড়িতেন, তাহাতে মনোনিবেশ করিতেন এবং ব্যাকরণশুদ্ধ বলিয়া অনেক সময় উদ্ধারও করিতেন।

বুদ্ধদেবের নিজের বচন বলিয়া যে-সকল বই আছে, বৌদ্ধেরা তাহারই অধিক দোহাই দেন। সেগুলি বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষের উক্তি—অনেক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা এবং তাহার সংস্কৃতও বিভিন্ন রকমের। 'প্রজ্ঞাপারমিতা'য় ভাব এক, ভাষা এক, উপদেশ এক এবং ধর্ম এক। আর 'চণ্ডমহাবোধন তন্ত্রে'র ভাব আর-এক, ভাষা আর-এক, উপদেশ আর-এক, আর ধর্মও আর-এক। দুই-ই কিন্তু বুদ্ধবচন।

বৌদ্ধদের এমনি কোনো স্মৃতির পুস্তক ছিল না, যাহাতে উপাসক ও সংঘ, দুইয়েরই কাজ চলিতে পারে। তাঁহাদের বিনয় শুদ্ধ সংঘের জন্য। দশ ও এগারো শতকে তাঁহারা স্মৃতির বই লিখতে আরম্ভ করেন। তাহাতে অবৌদ্ধকে দীক্ষা দেওয়া, বৌদ্ধকে দীক্ষা দেওয়া, মন্দির নির্মাণ, মূর্তিপ্রতিষ্ঠা, নিত্য কর্ম, দিনের কাজ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

বুদ্ধবচনে তন্ত্রের উৎপত্তি। কিন্তু সে শেষের দিকের বুদ্ধবচনে। ইহাতে মূলমন্ত্র, মন্ত্রোদ্ধার, মন্ত্রসাধনা, দেবতা-মূর্তি প্রভৃতির অনেক কথা লেখা আছে। ইহা হইতেই বৌদ্ধদের দেবমূর্তি সমূহের উৎপত্তির ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়।

এ সাহিত্য গেল কোথায়?

এ বৌদ্ধ-সাহিত্য গেল কোথায়? এ জিজ্ঞাসার এক উত্তর—হয় হিন্দুরা তাড়াইয়া দিয়াছে, নয় গ্রাস করিয়াছে। কেমন করিয়া গ্রাস করিয়াছে বা গিলিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কতক কতক আভাস এখন দিব, ও তাহার পর কেমন করিয়া প্রকাণ্ড বৌদ্ধ সমাজটা গ্রাস করিয়াছে বা গিলিয়াছে, তাহারো কতক কতক আভাস দিব।

বৌদ্ধ-ব্যাকরণ গেল কোথায়?

গোড়ায় ব্যাকরণ ধরিয়াছি। ব্যাকরণ গ্রাসের কথাটাই আগে বলি। আমরা জানি, পাণিনিই সংস্কৃতের ব্যাকরণ। ইহার সঙ্গে কাত্যায়নের বার্তিক, ব্যাড়ির সংগ্রহ ও পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য', এই পণ্ডিত-ব্রাহ্মদিগের ব্যাকরণ। ব্যাড়ির সংগ্রহ এখন আর পাওয়া যায় না, তাই এই ব্যাকরণশাস্ত্রকে ত্রিমুনি ব্যাকরণ বলে। কিন্তু ইহা ছাড়া সাধারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের জন্য ছোটো ছোটো ব্যাকরণ ছিল এবং সে ব্যাকরণ সিদ্ধ উদাহরণ দিয়া শেখানো হইত; সূত্রের সঙ্গে তাহাদের বড়ো একটা সম্পর্ক ছিল না। কৌমার ব্যাকরণ এইরূপ উদাহরণ দিয়া শেখানো হইত ; সর্ববর্মা সেই উদাহরণগুলি লইয়া, কতকগুলি সূত্র করিয়া 'কাতন্ত্র ব্যাকরণ' ছয় মাসের মধ্যে সাতবাহন রাজাকে শিখাইবার জন্য প্রস্তুত করেন। তাহাতে সাধারণ লোকের কার্য চলিত। ক্ষত্রিয়গণ, ব্যবসাদারেরা ও অন্য অন্য ভদ্রলোকের কাজ এইরূপ ব্যাকরণ দিয়াই চলিত। 'গরুড়পুরাণে' ব্যাকরণের উপর দুটি অধ্যায় আছে, তাহা দেখিলে এ কথাটি বেশ বুঝা যায়। বৌদ্ধেরা প্রথম যখন খাঁটি সংস্কৃতে বই লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন এইরূপ ব্যাকরণ দিয়াই কাজ চালাইতেন।

পরে তাঁহাদের নিজের একখানি ব্যাকরণ লেখা দরকার হয়। তাঁহারা যে ব্যাকরণ তৈয়ারি করেন, তাহার নাম 'চান্দ্র ব্যাকরণ'। গ্রন্থকার চন্দ্র গোমী। তিব্বতীয় ভাষায় 'পগ্‌-সম্‌-জোন্‌-জঙ্‌' নামে যে বই আছে, তাহাতে বলে যে, চন্দ্র গোমীর বাড়ি বরেন্দ্রভূমে, তিনি থাকিতেন চন্দ্রদ্বীপে, তাঁহার সময় ৪৫০ হইতে ৫০০ ইংরাজি সন। কেন-না, তিনি বলিয়াছেন, গুপ্তেরা হুনদের জয় করিয়াছে। এ স্থলে তিনি লঙ্‌ ব্যবহার করিয়াছেন। লঙ্‌ ব্যবহারের অর্থ, ঘটনাটি তাঁহারই সময়ে ঘটিয়াছিল, তিনি ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারিতেন। হুনেরা ঐ সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল।

চান্দ্র ব্যাকরণ—ধাতুপাঠ, লিঙ্গানুশাসন, সূত্রপাঠ, বৃত্তি প্রভৃতিতে চারিদিকে পাণিনির মতো পূর্ণ ব্যাকরণ হইয়াছিল; উহার বহু সংখ্যক টীকা ছিল, সেগুলিও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত; টীকাকারেরা প্রায়ই বৌদ্ধ। এখন সে ব্যাকরণ ভারতবর্ষে একেবারে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ ব্যাকরণ তিব্বতীয় তর্জমায় পাওয়া যায়। প্রোফেসর বেণ্ডল নেপাল হইতে ও বিউলার সাহেব কাশ্মীর হইতে ইহার কোনো কোনো অংশ পাইয়াছিলেন।

আমি উহার একখানি পুরা সূত্রপাঠ পাইয়াছিলাম; সেখানি জার্মানিতে ছাপা হইয়াছে। এত বড়ো ব্যাকরণখানা লোপ হইল কিরূপে?

'সংক্ষিপ্তসার' নামে একখানি ব্যাকরণ আছে; সেখানি বাংলায় রাঢ়দেশে চলে— এখনো চলিতেছে। ইহার সূত্রকার ক্রমদীশ্বর একজন শৈব ছিলেন। তিনি হিন্দুদের জন্য বই লিখেন। যেখানে যেখানে চান্দ্র ও পাণিনি দুই রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে সেখানে তিনি আপন সূত্রে বিকল্প শব্দ যোজনা করিয়াছেন। যেখানে যেখানে পাণিনি-সূত্রে, পাতঞ্জল ভাষ্য ও বৌদ্ধবৃত্তি দুই রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে তিনি প্রায়ই বিকল্প বিধান করিয়াছেন। অথবা বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করিয়া ভাষ্যের মত প্রবল করিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি পাণিনির সংক্ষিপ্তসার; কিন্তু তিনি বাস্তবিক সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের সংক্ষিপ্তসার। চান্দ্রের প্রতি তিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন, কাতন্ত্রের প্রতিও তিনি সেই ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ সংক্ষিপ্তসারে চান্দ্রের ও কাতন্ত্রের যাহা কিছু ভালো, সব লওয়া হইয়াছে। তাই চন্দ্র ভারতে একেবারে লোপ পাইয়াছে আর কাতন্ত্র কাশ্মীর ও পূর্ব্ববঙ্গে লুকাইয়া আছে।

চাঙ্গুদাস নামে একজন কায়স্থ-বৌদ্ধ একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন; তাঁহার বইখানি লোপ পাইয়াছে। কিন্তু ব্যাকরণ বা ব্যাকরণেব টীকা লিখিয়া যেমন গ্রন্থকার বা টীকাকার কারক, সমাস, তদ্ধিতের জন্য কতকগুলি কারিকা করেন, চাঙ্গুদাসও সেইরূপ কতকগুলি কারিকা করিয়াছিলেন। চাঙ্গুদাসের সেই কারিকাগুলি এখনো উড়িষ্যায় পড়া হয়। কারিকার টীকাকার একজন বৈষ্ণব। তিনি বলিয়াছেন, চাঙ্গুদাস বুদ্ধদেবকে নমস্কার করেন কেন? তিনি বলেন, গ্রন্থকারেরা প্রায়ই নিজ নিজ ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। ব্রাহ্মণেরা নিজ ইষ্টদেব বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। কায়স্থেরা নিজ ইষ্টদেব বুদ্ধকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। বৈশ্যেরা স্মরণ করে সূর্যদেবকে, শূদ্রেরা শিব ও অন্যান্য দেবতাকে স্মরণ করে। যেমন চাঙ্গুদাসের কারিকা আছে, তেমন বৌদ্ধ রভস নন্দীরও কতকগুলি কারিকা আছে। সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ব্যাকরণও লোপ পাইয়াছে।

এই-সকল হেতুতে বোধ হয়, সংক্ষিপ্তসারের প্রভাবে চান্দ্র, কাতন্ত্র, রভস, চাঙ্গু লোপ পাইয়াছেন। বাংলায় চান্দ্রের যদিও বা কিছু আলোচনা হইত, 'প্রয়োগরত্নমালা' তাহা একেবারে লোপ করিয়া দিয়াছে। এই গ্রন্থখানি কোচবিহারে তৈয়ারি হয়। কামতাপুর রাজ্য ভাঙিয়া দিয়া গৌড়ের বাদশাহ্ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ যখন সমস্ত কামতাপুর রাজ্য আপন রাজ্যভুক্ত করিতে পারিলেন না, তখন কোচ ও হাজোরা বাংলার উত্তরে এক প্রকাণ্ড রাজ্য স্থাপন করিল। সেই কোচবিহারে রাজাদের অনুরোধে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত 'প্রয়োগরত্নমালা' নামে ব্যাকরণ লিখিলেন খৃ. ১৫৮০ [১৫৬৮?] সালে। চন্দ্রের যাহা কিছু জ্যোতি ছিল, 'রত্নমালা'র আলোতে

তাহা আরো ম্লান হইয়া গেল। 'রত্নমালা' বাংলা ও আসামের অনেক অংশে পুরাদমে চলিতেছে।

পাণিনির বৌদ্ধ টীকাগুলির খুব আদর ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভট্টোজী দীক্ষিত ও তাঁহার শিষ্যেরা সেই-সকল পুস্তকে অনেক অপাণিনেয় ও ভাষ্যবিরুদ্ধ প্রয়োগ দেখিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিলেন। তাহাতে ২/৩ শত বৎসরের মধ্যে তাহাদের প্রচার এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসিল। শেষে এমন হইল যে, পঠনপাঠন তো দূরে যাক, তাহাদের পুথি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। যে কষ্ট করিয়া লোকে সেই-সকল টীকা সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছে, তাহা পড়িলে আশ্চর্য হইতে হয়। আমার সুযোগ্য সহযোগী স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় 'ন্যাস' বা 'কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা'র পুরা পুথি কোথাও পাইলেন না; সমস্ত ভারতভ্রমণ করিয়া, টুকি টুকি করিয়া সংগ্রহ করিয়া, অনেক বৎসর খাটিয়া পুরা পুথিখানি ছাপাইয়াছেন। এই-সকল পুথি বারেন্দ্রদেশে কিছু ছিল। তাহাতেই বারেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির উদ্বোধ হয়, এ-সকল পুথি ছাপানো উচিত। একখানি বৌদ্ধের লেখা পাণিনি মতের ব্যাকরণ বারেন্দ্র অঞ্চলে কোথাও কোথাও চলিতেছিল, কিন্তু উহার পঠনপাঠনও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।-

এইরূপ বাংলা দেশে বৌদ্ধ ব্যাকরণকারদের নাম পর্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। যাঁহারা এই লোপের মূল, তাঁহারা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—রাঢ় দেশে বাড়ি। 'সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণের যত টীকাকার আছেন, প্রায় সবই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বিশেষত গয়ঘড় বাঁড়ুরী। ইহার উপর আবার মহারাষ্ট্রদেশের 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ মহারাষ্ট্রে স্থান না পাইয়া, গঙ্গার দু'ধার আশ্রয় করিল এবং মিথিলার 'সুপদ্ম-ব্যাকরণ' মিথিলায় স্থান না পাইয়া যশোর, খুলনা ও ২৪ পরগণা আশ্রয় করিল। বৌদ্ধ ব্যাকরণগুলি লুপ্ত হইয়া গেল। 'মুগ্ধবোধের' বহু-সংখ্যক টীকাকার আছেন, এক ভরত মল্লিক ছাড়া সবই বাঙালি ব্রাহ্মণ। একজন ছাড়া 'সুপদ্মে'র টীকাকারগুলি সব বাঙালি ব্রাহ্মণ। এইরূপে বাঙালি ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ-ব্যাকরণগুলিকে তাঁহাদের শেষ আশ্রয়স্থান বাংলা হইতে লোপ করিয়া দিয়াছেন। অথচ তাহাদের যা-কিছু ভালো ছিল, সব আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন।

বৌদ্ধ অভিধান।।

অভিধানের ব্যাপার কিন্তু আর-এক রকম। সংস্কৃত অভিধান তিন জিনিস লইয়া—পর্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ। পর্যায় মানে, এক মানের অনেক শব্দ। নানার্থ মানে, এক শব্দের নানা অর্থ। লিঙ্গ শব্দে—কোন্ শব্দের কোন্ লিঙ্গ। বররুচি, ব্যাড়ি, কাত্য, কালিদাস, অমর প্রভৃতি অনেকেই ইহার এক-একটি অংশের বই লিখিয়া যান। কিন্তু বৌদ্ধ অমর সিংহ এই তিনটি অংশ লইয়াই 'নামলিঙ্গানুশাসন' এবং 'ত্রিকাণ্ড' নামে

একখানি সরল ও সুন্দর পুস্তক লেখেন; আগেকার সব পুথি কানা হইয়া যায়; উহার এত প্রচার হয় যে, উহার তিন-চারখানি পরিশিষ্ট লেখা হয়। একখানির নাম 'শেষামর', একখানির নাম 'ত্রিকাণ্ডশেষ' ও আর-একখানির নাম 'বিশ্বলোচন' বা 'মুক্তাবলী'। স্বয়ং নৈষধকার উহার এক ভীষণ তীব্র, কিন্তু ছোটো সমালোচনা করেন। উহার বহু সংখ্যক টীকা লেখা হয়। অমর ও তাঁহার গ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণেরা লোপ করিতে পারেন নাই।

অমরের পর 'বিশ্বপ্রকাশ' অভিধান বৌদ্ধের লেখা; উহা কিন্তু নানার্থ শব্দ মাত্র। গ্রন্থাকার আপনার অনেক পুরুষের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা সাহসাঙ্ক নরপতির চিকিৎসক ছিলেন এবং কান্যকুব্জের রাজাদেরও চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বোধ হয়, বাঙালি ছিলেন। কেন-না, তাঁহার বইয়ে এক অংশ আছে বানানের জন্য। অভিধানে বানানের কথা এই প্রথম। বইখানি লেখা ১১১১ খৃঃ অব্দে।

আর একজন বৌদ্ধ অভিধানকার পুরুষোত্তমদেব; তিনি অমরের পরিশিষ্ট লিখেন। অমরের পর বৌদ্ধধর্মের অনেক সম্প্রদায় হয়। সেই-সকল সম্প্রদায় কত নূতন নূতন শব্দ চলিত করিয়া দেয়; সে সব তিনি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পরিশিষ্টে জুড়িয়া দিয়াছেন

তাঁহার আরো একখানি বৌদ্ধ অভিধান আছে, তাহার নাম 'হারাবলী'। যেখানে যত অপ্রচলিত শব্দ আছে, 'হারাবলীতে' তাহার মানে দেওয়া আছে। তাঁহার একখানি ব্যাকরণ আছে, নাম 'ভাষাবৃত্তি'। 'অষ্টাধ্যায়ী'র সূত্রগুলি হইতে স্বর ও বৈদিক অংশ বর্জন করিয়া যাহা থাকে, তাহারই বৌদ্ধমতে ব্যাখ্যা। লোকে বলে, লক্ষ্মণসেনের আজ্ঞায় এই বই তিনি লিখিয়াছিলেন।

তাঁহার আর-এক কার্য আছে—সেটা বানান দুরস্ত করা। অন্যান্য দেশে সংস্কৃত বানানের বইয়ের দরকার হয় না; কিন্তু বাংলায় আমরা অন্ত্যস্থ "য" ও বর্গীয় "জ", এই উভয়ের উচ্চারণ-ভেদ করিতে পারি না। অন্ত্যস্থ "ব" বর্গীয় 'ব'-এর উচ্চারণ-ভেদ করিতে পারি না। মূর্ধন্য "ণ" ও দন্ত্য "ন"-কার উচ্চারণ-ভেদ করিতে পারি না। তিনটা "শ" "ষ" "স"-ও আমরা একই ভাবে উচ্চারণ করি। এজন্য বানানে আমাদের অনেক গোলমাল হয়। তিনি এই সব বানানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এবং যে সকল শব্দের দুই রকম বানান হইতে পারে, তাহারো একটা তালিকা দিয়াছেন।

ব্রাহ্মণেরা এই-সকল গ্রন্থ লোপ করিতে পারেন নাই। নৈষধকার শ্রীহর্ষ অমরের উপর নানা দোষারোপ করিয়াও তাঁহার কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা অমরের ভালো ভালো টীকা লিখিয়াছেন, মূল হইতে টীকার আদর অধিক হইয়াছে। অমরের প্রথম বাঙালি টীকা ১১৫৯ ইংরাজি অব্দে তৈয়ারি হয়—টীকাকার সর্বানন্দ বাঁড়ুর্জ্যা। আমাদের দেশে তাঁহার বইয়ের পুথি থাকিলেও দক্ষিণে তাঁহার অনেক পুথি পাওয়া যায় এবং সেখানে ইহার আদর অধিক। আমাদের দেশে আর-একখানি টীকার

আদর অধিক; সেখানি বৃহস্পতি মতিলালের।ইনি ১৪৩১ অব্দে টীকা লিখেন। তখন একজন হিন্দু বাংলার সুলতান হইয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন। ইনি বৃহস্পতির প্রতি বড়ই সদয় ছিলেন, ইঁহাকে অনেক উপাধি দেন। 'রায়মুকুট' উপাধি দিবার সময় ইঁহাকে হাতির উপর চড়াইয়া অভিষেক করা হয়। ইঁহাকে অনেক জড়োয়া গহনা দেওয়া হয়, দুটি ছত্র দেওয়া হয়, ঘোড়া দেওয়া হয়, আর রায়মুকুট উপাধি দেওয়া হয়। ইঁহাদের দু'জনের টীকা ভালো করিয়া পড়িলে দেখা যায়, কেমন করিয়া বৌদ্ধ-সাহিত্যের লোপ হইতেছে। সর্বানন্দ প্রায় ৩০ খানি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, আর রায়মুকুটে মাত্র দশখানি। ইঁহার পর বাংলায় অমরের ঢের টীকা টিপ্পনী হইয়াছে; তাহাতে বৌদ্ধ-সাহিত্য হইতে কিছুই উদ্ধার করা হয় নাই, বরং দেখাইতে চেষ্টা হইয়াছে যে, অমর বিষ্ণুকেই নমস্কার করিয়া তাঁহার বই লিখিয়াছেন, বুদ্ধদেবকে নহে; তিনি হিন্দু ছিলেন, বৌদ্ধ ছিলেন না। আর অমরের বইকে চাপিয়া রাখিবার জন্য অনেক নূতন নূতন অভিধান লেখা হইয়াছে। কিন্তু অমর যে অমর, সেই অমরই আছেন— তিনি মরেন নাই।

ছন্দঃশাস্ত্র ।।

ছন্দঃশাস্ত্রে অনেকেই বই লেখেন, কিন্তু আগে সেই পিঙ্গল নাগের 'ছন্দঃসূত্র'ই চলিত। পরে 'বৃত্তরত্নাকর' চলিতেছে। তাহার পর 'ছন্দোমঞ্জরী' বৈদ্য গোপালদাসের পুত্র গঙ্গাদাসের লেখা। বৌদ্ধদের একখানি খুব বড়ো অঙ্গের ছন্দের বই ছিল; লেখক— রত্নাকরশান্তি। ইনি বিক্রমশীল বিহারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন এবং একজন প্রসিদ্ধ তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন। অধিক বলিতে কি, ইনি দীপংকর শ্রীজ্ঞানের গুরু আর দীপংকর শ্রীজ্ঞান তিব্বত দেশে এখনো দ্বিতীয় বুদ্ধদেব বলিয়া পূজা পাইয়া থাকেন। কিন্তু এত বড়ো যে রত্নাকরশান্তি, তাঁহারো ছন্দের বই টিকিল না—লোপ পাইল।

অলংকার ।।

ভামহ যদি বৌদ্ধ না হন—না হইবার সম্ভাবনা অধিক, তবে বৌদ্ধদের অলংকারের বই সব লোপ পাইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যে অলংকারের বই ছিল না বা অলংকারের চর্চা ছিল না, একথাও বলিতে পারি না। কারণ, কালিদাসের কাব্যগুলির তীব্র সমালোচনা বৌদ্ধদের হাতেই হইয়াছিল। একথা মল্লিনাথ বলিয়া গিয়াছেন এবং সমালোচক যে-সে লোক নন—স্বয়ং দিঙ্নাগ।

ন্যায় ।।

ন্যায়শাস্ত্রে অর্থাৎ লজিকে বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সব বই লোপ পাইয়াছে, কিন্তু ঐ-সকল বইয়ের তর্জমা এশিয়ার নানা ভাষায় দেখিতে

পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব আমাদের মীমাংসকদের ন্যায় ৭/৮ টি প্রমাণ মানিতেন। কিন্তু ক্রমে খসিয়া খসিয়া প্রমাণগুলি নাগার্জুনের সময় চারিটিতে দাঁড়ায়—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। মৈত্রেয়নাথ উপমান পরিহার করেন; তাঁহার পর দিঙ্নাগ শব্দকেও প্রমাণের লিস্ট হইতে বাদ দেন। তখন বৌদ্ধদের দুইটি মাত্র প্রমাণ দাঁড়ায়—প্রত্যক্ষ আর অনুমান। আমাদের 'ন্যায়সূত্র'খানি নাগার্জুনের সময়ে বা তাহার একটু পরে লেখা হয়। ইঁহারাও ৪ টি প্রমাণ মানিলেন। ইঁহারা সেই চারিটিই ধরিয়া আছেন এবং বৌদ্ধদের সঙ্গে প্রমাণ লইয়া ঘোরতর তর্ক করিয়া আসিতেছেন। বাৎস্যায়ন, 'ন্যায়বার্তিক' কার বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি সকলেই চারিটি প্রমাণ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দিঙ্নাগ, ধর্মকীর্তি, ধর্মোদয়, শীলভদ্র প্রভৃতি সকলেই দুই প্রমাণ মানিয়া গিয়াছেন এবং দুই প্রমাণ স্থাপনের জন্য তুমুল তর্ক করিয়া গিয়াছেন।

প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিতে গিয়া আমাদের নৈয়ায়িকেরা 'ন্যায়সূত্রে'র লক্ষণটিই খাঁটি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধেরা সে লক্ষণ পরিহার করিয়া কল্পনাপোঢ় প্রথম ও তাহার পর "কল্পনাপোঢ়ম-ভ্রান্তম্" লক্ষণ স্থির করিয়াছেন।

আমাদের গৌতমসূত্র তিন রূপ অনুমান স্বীকার করেন—১. পূর্ববৎ অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য, ২. শেষবৎ অর্থাৎ কার্য হইতে কারণ এবং ৩. সামান্যতো দৃষ্ট। বৌদ্ধেরা দুই রূপ অনুমান মানেন—স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। ইহার মধ্যে পরার্থানুমানের জন্যই অবয়বের দরকার হয়; অবয়ব অর্থাৎ সিলোজিস্ম্। আমাদের নৈয়ায়িকেরা পাঁচটি অবয়ব মানেন, বৌদ্ধেরা তিনটি বৈ মানেন না। তাঁহাদের পুস্তকসমূহে অনুমানের যে প্রয়োগ খাটান, তাহাতে উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই তিনটি অবয়ব দেখান, কিন্তু আমাদের পঞ্চ অবয়ব শুদ্ধ অনুমানের মূল নহে, উহা তর্কের মূল; তর্ক করিতে বসিলেই অবয়ব সাজাইতে হয়। গৌতম আমাদের অবয়ব অনুমান প্রমাণের মধ্যে না দিয়া, দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্তের পর দিয়াছেন। অর্থাৎ অনুমান ছাড়া অন্যত্রও অবয়বের দরকার হয়। কিন্তু অবয়ব সাজানো বড়ো জটিল ব্যাপার দেখিয়া আমাদের নৈয়ায়িকেরা ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা, এই দুইটিকেই অনুমানের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিযাছেন এবং ব্যাপ্তির লক্ষণ করিতে গিয়া অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। ব্যাপ্তির পক্ষধর্মতা অবয়বেরই সার কথা। উদাহরণ হইতে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে তাহার একটি যদি পক্ষে অথবা পর্বতে থাকে; তবেই অনুমান হয়। কিন্তু ব্যাপ্তি শব্দটা এবং ব্যাপ্তির ধারণাটা কোন্ পক্ষ হইতে উঠে, তাহা ঠিক বলা যায় না। বোধ হয়, বৌদ্ধ পক্ষ হইতেই প্রথম উঠে।

কিন্তু উদাহরণ হইতে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান উঠে, তাহাতে অনেক সময় উদাহরণ পাওয়া যায় না। বহ্নি ও ধূম স্থলে অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়, বহ্নি ও ধূম এক জায়গায়। কিন্তু উচ্চ অনুমান স্থলে, যথা—ঈশ্বরানুমান অথবা ধর্মকায়ানুমানে,

উদাহরণ পাওয়া যায় না। সেখানে বৌদ্ধেরা সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, উদাহরণ ব্যতিরেকেও ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়; উহার নাম অন্তর্ব্যাপ্তি। অন্তর্ব্যাপ্তির উপর রত্নাকরশান্তির এক বই আছে; তাহার নাম 'অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থন'। রত্নাকরশান্তি খৃস্টীয় ১০৩৮ (১০৪০) সালেও জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার শিষ্য যখন তিব্বত দেশে যাত্রা করেন, তখন তিনি বিস্তর নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে নিষেধ তিনি শুনেন নাই।

বারো শতকের শেষ ভাগে মিথিলায় মঙ্গলবনী নামক গ্রামে গঙ্গেশোপাধ্যায় আমাদের ন্যায়শাস্ত্র ঘুঁটিয়া চারিটি প্রমাণের উপর চারিখানি 'চিন্তামণি' রচনা করেন। চারিখানির সাধারণ নাম 'তত্ত্বচিন্তামণি'। এই পুস্তক রচনা বা সংকলনের উদ্দেশ্য— "প্রচণ্ডপাষণ্ডঅস্তিতীর্ষয়া", অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের প্রচণ্ড মত খণ্ডন করা। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের বই আমাদের দেশে মূল বলিয়া বিখ্যাত। এই মূলের বহু-সংখ্যক টীকা হইয়াছে। এই-সকল টীকার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ-ন্যায়শাস্ত্র বাংলা—এমন -কি ভারতবর্ষ হইতেও তিরোহিত হইয়াছে। দু-একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ পশ্চিম-ভারতের জৈনভাণ্ডার হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, ন্যায়শাস্ত্র বৌদ্ধেরা খুব সোজা করিয়া আনিয়াছেন। আর আমাদের ন্যায়শাস্ত্র এখন ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া শেষে দুর্বোধ হইয়া পড়িয়াছে।

বৌদ্ধ-দর্শন প্রথম হইতেই ক্ষণিকবাদী। এখনকার নৈয়ায়িকেরা বলেন, জ্ঞান ত্রিক্ষণস্থায়ী—এক ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধেরা বলেন, উহার উৎপত্তি ও ধ্বংস এক ক্ষণেই হয়, উহার স্থিতি নাই। উঁহারা দুই সত্য মানেন—এক সাম্বৃত সত্য, আর-এক পরমার্থসত্য। সাম্বৃত সত্য পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা যায় যে, উহার মূল নাই, উহা মায়া। আরো পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা যায় যে, সে মায়াও নাই। এই মাধ্যমিকদের শেষ বিচার। ইহার নাম অপ্রতিষ্ঠিতসর্বধর্মবাদ। উহাদের পরমার্থসত্য ধর্মধাতু। ধর্মধাতু অনির্বচনীয়, উহার আর-এক নাম শূন্য। শূন্য অভাববাদ নয়, ভাববাদও নয়; উহা অনির্বাচ্য একটা স্বরূপ— যাহা বাক্য মনের অগোচর। উহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অছিদ্র, দৃঢ়, সার, অদাহি, অবিনাশী— এই শূন্যতার নামই বজ্র। ইহা ভাব নয়, অভাব নয়, ভাবাভাব নয়, অভাবাভাব ভাবাভাবও নয়। মানে আমরা উহা ধারণা করিতে পারি না অথচ উহা যে আছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না।

এই যে সূক্ষ্ম দার্শনিক মত বৌদ্ধদের মধ্যে ছিল, তাহা দুই দিক হইতে হিন্দুরা আক্রমণ করিয়া খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক-দিকে শংকরাচার্য ও তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য এই সমস্তগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আপনাদের মত প্রচার করিয়াছেন। গৌড়পাদ তাঁহার 'মাণ্ডুক্যকারিকা'য় এবং শংকর তাঁহার ভাষ্যে এই মতই

প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধদের 'বোধিচর্যাবতারে'র নবম পরিচ্ছেদ, প্রজ্ঞাপারমিতাবতার পড়িয়া যাঁহারা শংকর গৌড়পাদের এই দুখানি বই পড়িবেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারিবে না। শংকরের পরবর্তী পণ্ডিতেরা বলিতেন—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ।" এখন দুই হাতে দুই মতের বই লইয়া পড়িলে প্রচ্ছন্ন শব্দটা আর ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হইবে না। মনে হইবে—"প্রকাশং বৌদ্ধমেব তৎ।" তবে গৌড়পাদ ও শংকর উপনিষদ্ প্রভৃতি হইতে এই মত সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া উহা সৎশাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আর বৌদ্ধেরা বেদ মানেন না বলিয়া উহা অসচ্ছাস্ত্র হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু দেখিতে হইবে, মায়া জিনিষটা নাগার্জুন ২য় শতকে লেখেন আর শংকর সেটা ৮ম শতকে গ্রহণ করেন। ইংরাজি ১৮ শতকের গোড়ায় একখানি বই বাংলায় রাঢ় দেশে লেখা হয়; সেখানির নাম 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচারের কথা লেখা আছে। যখন বৌদ্ধ ও বৈদান্তীক পরস্পর বিচার করিতে আসিলেন, বৌদ্ধ বৈদান্তীককে কহিলেন—ভাই, তোমায় আমায় কিছুই ভেদ নাই। কেবল তুমি বলো, "আছে আছে", আমি বলি, "নাই"। অর্থাৎ তুমি বলো—ব্রহ্ম, আমি বলি—শূন্য। কিন্তু কাজে আমরা দুই জনেই এক।

বাংলার ব্রাহ্মণেরা কিন্তু এরূপে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই। তাঁহারা "তোর শিল তোর নোড়া, তোরই ভাঙি দাঁতের গোড়া" করেন নাই। তাঁহারা ন্যায় ও বৈশেষিক, এই দুইটি দর্শনের ঐক্য করিয়া বৌদ্ধদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান আচার্য উদয়ন। তিনি 'দ্রব্যকিরণাবলী' ও 'গুণকিরণাবলী' নামে বৈশেষিকের টীকা লিখিয়া তাহার পর 'আত্মানাত্মবিবেক' রচনা করেন। ইহার প্রথমেই তিনি আত্মসম্বন্ধে যতরূপ মত হইতে পারে, সেগুলিকে কয়েকটি ভাগ করিয়াছেন। তাহার পর তাহাদের আবার যত অবান্তর মত হইতে পারে, তাহার উল্লেখ করিয়া, এক-এক করিয়া খণ্ডন করেন ও তাহার পর আপনাদের ন্যায়-বৈশেষিকের জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্থাপন করেন। তাঁহার মতের সারসংগ্রহ হইতেছে—গঙ্গেশোর অনুমান-খণ্ডের ঈশ্বরানুমান অধ্যায়। এই মত যত ঘনীভূত হইতে লাগিল, বৌদ্ধেরা ততই হঠিতে লাগিল। 'আত্মানাত্মবিবেকে'র নাম হইল 'বৌদ্ধধিক্কার'; একটু সাধু ভাষায় উহার নাম হইল 'বৌদ্ধাধিকার'। একশত বৎসর পূর্বে অনেক নৈয়ায়িকই এই বই পড়িতেন ও পড়াইতেন। কিন্তু বৌদ্ধমত, বৌদ্ধদের পুথি হইতে, তাঁহাদের জানা না থাকায় বলিতেন, এ অতি কঠিন গ্রন্থ। বৌদ্ধেরা যে ন্যায়-বৈশেষিক মতের প্রভাবেই হঠিয়াছিলেন, একথা বলা যায় না। দেশ মুসলমান অধিকার হওয়ায় তাঁহাদের শাস্ত্র ও ধর্মের লোপ হইয়াছে, এও একটা কারণ। বৌদ্ধদের সঙ্গে যখন ন্যায়-বৈশেষিকওয়ালাদের বিচার হয়, সে সময় তর্ক-বিতর্কের যে-সকল বই লেখা হয়, তাহার মধ্যে বৌদ্ধদের দু-চারখানি আমি পাইয়াছি ও ছাপাইয়াছি। একখানির নাম—

'সামান্য দূষণদিক্‌প্রসারিতা'। বৌদ্ধেরা ক্ষণিকবাদী। তাহারা এক ক্ষণে একটি মাত্র পদার্থ দেখে, সুতরাং অনেক পদার্থ লইয়া যে সামান্য বা জাতি হয়, তাহারা তাহা মানে না। তাহারা বলে, গাছ বুঝি, কিন্তু বন বুঝি না। তাহারা বলে, তোমার হাতে তো পাঁচটা আঙুল আছে, সামান্য মানিলে তো ছয়টা মানিতে হয় ; কিন্তু তোমরা তো সকলে ছ-আঙুলে নও।

স্মৃতি।।

স্মৃতি বলিতে কী বুঝায়? শংকরাচার্য এক জায়গায় 'মহাভারত' কে স্মৃতি বলিয়াছেন, আর-এক জায়গায় 'গীতা'কে স্মৃতি বলিয়াছেন। 'মনুস্মৃতি' তে ধর্মশাস্ত্র আছে, অর্থশাস্ত্র আছে, মোক্ষমশাস্ত্রও আছে। ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি স্মৃতিতে আছে। তাঁহারা বলেন, অন্য-অন্য জাতি আমাদের দেখিয়া শিখুক। বৌদ্ধদের বিনয়—সে বুদ্ধের হুকুম; পুরানো ধার্মিক লোকের স্মৃতি নহে। সে বিনয়ও ভিক্ষুদের জন্য, গৃহস্থের জন্য নহে। তবে যে গৃহস্থ ভিক্ষু হইতে যাইবে, সে বিনয়-মত ব্যবহার করিবে। কিন্তু সকলের তো ভিক্ষু হওয়ার উদ্দেশ্য নয়, তাহারা কী করিবে? একথার এক উত্তর, তাহারা ব্রাহ্মণদের আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিবে। তাই বৌদ্ধধর্মে স্মৃতির উল্লেখ বড়ো দেখা যায় না। রাজকার্য ব্রাহ্মণে করিতেন, ধর্মকার্যও ব্রাহ্মণেই করিতেন। বিচার ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। তাই যখন বৌদ্ধেরা খুব প্রবল, তখনো ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন।

ব্রাহ্মণের স্মৃতি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, যত দিন যাইতে লাগিল এবং সমাজের পরিবর্তন হইতে লাগিল, অনেক বিষয় স্মৃতি হইতে খসিয়া পড়িল, আবার অনেক জিনিস তাহাতে আসিয়া জুটিতে লাগিল। দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা মনুতে দেখা যায় না। যখন শৈব ও বৈষ্ণবেরা প্রবল হইতে লাগিলেন, তখন প্রতিষ্ঠা ব্যাপারটা স্মৃতিভুক্ত হইয়া গেল। দীক্ষা বহুকাল স্মৃতির বাইরে ছিল। বৈদিক দীক্ষা 'বেদে' ও বৈদিক বইয়ে ছিল। তান্ত্রিক দীক্ষা তন্ত্রে ছিল। স্মার্ত দীক্ষা ছিল না, পৌরাণিক দীক্ষাও ছিল না। কিন্তু রঘুনন্দন দীক্ষার উপর এক তত্ত্ব লিখিয়া গেলেন। বৌদ্ধদের স্মৃতির বই নাই। কিন্তু ৯/১০ শতকে লেখা কয়েকখানি স্মৃতির বই আমার হস্তগত হইয়াছে। অধিকাংশ গুপ্ত উপাধিধারী বৌদ্ধদের লেখা। তাহার ব্যাপার দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, অবৌদ্ধকে দীক্ষা দেওয়া (নাম—আদিকর্ম), দিনের কাজ, বারব্রত ইত্যাদি। কিন্তু এই-সকল বইয়ের সংখ্যা বড়ো কম। তবুও উহাতে কোটেশন আছে; তাহাতে মনে হয়, আরো ছিল—লোপ হইয়াছে। এ-সকল কিন্তু বিনয় ছাড়া।

আমার মনে হয়, বৌদ্ধস্মৃতির বিষয়গুলি শৈব ও বৈষ্ণবেরা প্রথম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের কাছ হইতে ব্রাহ্মণেরা লইয়াছেন।

মুসলমান অধিকারের সূত্রপাত হইতেই হিন্দুরা সমাজ বজায় রাখিবার জন্য যেখানে

তাঁহাদের রাজক্ষমতা লাভ হইয়াছে, নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির উপকারার্থ এরূপ প্রায় দুই শত নিবন্ধ লেখা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশখানা আস্ত পাওয়া গিয়াছে। "আস্ত নিবন্ধ" বলিতে রঘুনন্দনের ২৮ তত্ত্বের মতো বড়ো বড়ো নিবন্ধ। আর ১৫০ খানার খণ্ড পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লেখাই আছে, এটা অমুক আস্ত নিবন্ধের খণ্ড। এ ছাড়া আবার স্মৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধও আছে।

এই যে বিশাল নিবন্ধ-সাহিত্য, ইহাতে বৌদ্ধদের স্মৃতি একেই তো কম, সব মিশিয়া গিয়াছে, আর বাকি লোপ হইয়াছে। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, তান্ত্রিক দীক্ষা, দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্দির নির্মাণ, এসব আমরা লইয়াছি। আর বৌদ্ধদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্মৃতি চলিয়া গিয়াছে। বিনয়ে বৌদ্ধেরা যে পঞ্চ শীল, অষ্ট শীল, দশ শীল লইয়াছিলেন এবং তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভেদ বাহির করিয়া একটা প্রকাণ্ড জিনিস করিয়াছিলেন, তাহাকেও আমরা লই নাই। তাঁহাদের স্মৃতিতে জাতিভেদেরও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

তন্ত্র।।

তন্ত্রের উৎপত্তি লইয়া নানা মত আছে। ব্রাহ্মণেরা বলেন, উহা 'অথর্ব্ববেদে'র অংশ। যাহার কিছু গোড়া পাওয়া যায় না, তাহাই 'অথর্ব্ববেদ'। এ-কথার কী মূল্য জানি না। আমি গুপ্তাক্ষরের শেষ অবস্থায় লেখা দু'খানি পুথি দেখিয়াছি। একখানিতে ঋচীক ও মতঙ্গ কথা কহিতেছেন নৈমাষারণ্যে। একজন বলিতেছেন, এ আবার কী হইল? আমরা তো বৈদিক দীক্ষাই জানি, এখন আবার এ একটি কী দীক্ষা আইল? ইহাকে তান্ত্রিক দীক্ষা বলে। আর-একজন বলেন, তান্ত্রিকও পুরানো দীক্ষা—বিষ্ণু শিবের নিকট এই দীক্ষা লইয়াছিলেন। সুতরাং তন্ত্রের গোড়া তো এইখানেই পাওয়া গেল।

আর-একখানি পুথিও ঐ অক্ষরেই লেখা। এখানির নাম 'কুলালি-কাম্নায়' বা 'কুব্জিকামত'। ইহাতে ঈশ্বর দেবীকে বলিতেছেন—

"গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষে অধিকারায় সর্ব্বতঃ।"
"যাবন্নৈবাধিকারস্তে ন সঙ্গমস্তয়া সহ।।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, তন্ত্র ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছে। বলিবে, কৈলাস পর্বত হইতে আসিয়াছে। কিন্তু কৈলাস তো ভারতবর্ষের বাহিরে বলিয়া কেহ বলে না। পুথি দুখানিই ৮ম শতকের শেষ ভাগের লেখা।

আমার বোধ হয়, খৃ ৭ ও ৮ শতকে যখন উম্মেদিয়া ও আব্বাসিয়া খলিফাগণ তুর্কিস্তানে আপনাদের আধিপত্য ও ইসলামধর্ম বিস্তার করিতেছিলেন, তখন সেখানে নানা রকমের লোক-চলিত ধর্ম ছিল। তাঁহারা সে-সকল ধর্ম নষ্ট করায় তাঁহাদের পুরোহিতেরা পলাইয়া ভারতে আসেন; তাঁহারাই তন্ত্র এদেশে প্রচার করেন। তখন

ভারতে কোথাও তন্ত্র ছিল না, তাহার কারণ, জলন্ধর, কামাখ্যা, ওড়িয়ান, পূর্ণা, শ্রীপর্বত, এই-সকল স্থানই দেবী দখল করেন ও সেইসব স্থান হইতে ভারতবর্ষে নানা দেশে উহার প্রচার হয়। আমার মনে হয়, এ-ই তন্ত্রের গোড়া। তন্ত্র শব্দ ইহার পূর্বে ছিল। বরাহমিহিরের টীকাকার ভট্ট উৎপল নানা তন্ত্রের নাম করিয়া গিয়াছেন, সে-সমস্তই কিন্তু জ্যোতিষের নাম।

সকল তন্ত্রই দেখিতে পাই, অন্য অন্য তন্ত্রের নাম করিয়াছে। কিন্তু আমার দুইখানি পুথিতে পূর্ববর্তী তন্ত্রের নাম নাই। একবার কেবল আছে "পূর্বতন্ত্রে", কোনো তন্ত্রের নাম নাই। এই-সকল কারণে আমার মনে হয়, তন্ত্র ভারতের বাহির হইতে ৭/৮ শতকে আসে এবং ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। বৌদ্ধেরা তখন প্রবল, উহারা সেই তন্ত্র লইয়া আপনাদের প্রচার-কার্যে নিয়োগ করে। ব্রাহ্মণেরা ধর্মপ্রচার করিবেন না, তাঁহারা লন নাই। শৈব ও বৈষ্ণবেরা প্রচার করে, উহারাও লইয়াছিল। শৈবেরা "তন্ত্র" বলিত আর বৈষ্ণবেরা বলিত "পঞ্চরাত্র" । ঐ বাহিরের আসা জিনিস ভারতে আসিয়া খুব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাংলায় পঞ্চরাত্র বড়ো ছিল না; পঞ্চরাত্রের দুই শতের উপর বই আছে। বাংলায় তাহার কিছুই পাওয়া যায় না। একখানি পঞ্চরাত্র এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলা হইতে সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছিল—উহা 'নারদপঞ্চরাত্র'। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে—উহা জাল। শৈব-তন্ত্রগুলি কাশ্মীরে ও মধ্যভারতে বেশি, উহাদেরও বাংলায় পাওয়া যায় না। বাংলায় যাহা পাওয়া যায় তাহা প্রায়ই বৌদ্ধতন্ত্র ভাঙা। বাংলায় বৌদ্ধতন্ত্রের প্রধান আড্ডা ছিল। বিক্রমশীল বিহারে (ভাগলপুরের কাছে), জগদ্দল বিহারে ও নালন্দাতেও শেষ অবস্থায় অনেক তন্ত্র জমিয়াছিল। বৌদ্ধ বিহার মাত্রেই তন্ত্র ছিল। সুতরাং বাংলায় বৌদ্ধতন্ত্রেরই প্রার্দুভাব বেশি হইয়াছিল।

শেষ সময় পর্যন্ত ব্রাহ্মণের লেখা তন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; উঁহারা বেদ স্মৃতি লইয়াই বেশি থাকিতেন। নগুড়াচার্যদের বেদের টীকাই বোধ হয় বেদের আদি টীকা। উহা লোপ পাইয়াছে। ভবদেব, নারায়ণ, হলায়ুধ, পশুপতি, জীমূতবাহন, ইঁহারা বেদ ও স্মৃতি লইয়াই থাকিতেন।

বৌদ্ধতন্ত্রই বাংলায় খুব বেশী ছিল। বাঙালি ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রে বেশি মন দিতে পারেন নাই। কিন্তু মুসলমান অধিকারের পর দুই শত বৎসরের ইতিহাস পাওয়া যায় না, যাইবার কথাও নয়। মুসলমান অধিকারের আরম্ভ হইতেই মারামারি কাটাকাটি বেশি আরম্ভ হয়। তাহাতে হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধদেরই ক্ষতি বেশি হয়। ভিক্ষুরা হয় কাটা পড়ে অথবা পলাইয়া যায়। তাহাদের বিহার লুঠ হয়। ঠাকুর সব ভাঙা পড়ে। মুসলমানেরাও বড়ো সুস্থির ছিল না। বক্তিয়ার খিলিজি গৌড় দখল করিয়া আসাম আক্রমণ করিয়া দখল করেন। তাহার পর প্রচুর সৈন্য সঙ্গে তিব্বত দখল করিতে যান। সেখানে তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। অনেক সৈন্য মারা যায়। ফিরিয়া

আসিবার পথে আসামিরা অবশিষ্ট সৈন্য জলে ভাসাইয়া দেয়। বক্তিয়ার ২০ টি মাত্র সিপাহি লইয়া ঘোড়াঘাটে উপস্থিত হন। এবং ক্ষোভে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পর আলি মর্দান নামক একজন বাংলার কর্তা হন। তাঁহার কর্তৃত্ব বেশিদিন থাকে নাই। তাঁহার পর হইতে ১২৮০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত যে বাংলায় আসে, সে-ই স্বাধীন হইতে চেষ্টা করে, আর দিল্লি হইতে তাহাকে দমন করিবার চেষ্টা হয়। ক্রমে বাংলার নাম ''ঝগড়ার দেশ'' হইয়া উঠিল। একবার ১২৮০ সালে গিয়াসুদ্দিন বুলবন বাংলায় আসেন। তিনি সোনারগাঁয়ের ''রায়'' বা রাজার সঙ্গে সন্ধি করেন। অনেক লোক মারিয়া মুসলমান বিদ্রোহ দমন করেন ও আপনার বড়ো ছেলেকে বাংলার কর্তা করিয়া দিয়া যান, এবং বলিয়া যান যে, তুমি যদি দিল্লি হইতে পৃথক হইতে চাও তোমাকেও শূলে দিব। তিনি আবার বাংলাকে এত ভালোবাসিতেন যে, দিল্লির সিংহাসনে নিজের ছেলেকে বসাইয়া নিজে বাংলায় রহিলেন। তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র পৌত্রকে দিল্লির সুলতানেরাও সুলতান বলিত। এই তিন পুরুষেই তাঁহারা পূর্ব-বাংলার হিন্দু রাজত্ব লোপ করেন। আবার ১৩২৫ সালে জেলালুদ্দিন খিলিজি বাংলায় আসিয়া, বাংলা তিন ভাগে ভাগ করিয়া দিয়া যান—সাতগাঁ, গৌড় ও সোনার গাঁ। এই তিন কর্তায় আবার ঘোরতর লড়াই ঝগড়া বাধান এবং শেষ ১৩৪৫ সালে শমসুদ্দিন ইলিয়াস্ শাহ্ সমস্ত বাংলার রাজা হন। হিন্দু ব্রাহ্মণেরা ইঁহার খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহারা তিন পুরুষ বাংলায় কতক শান্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

ইঁহাদের পর রাজা গণেশ বাংলার কর্তা হন এবং তিন পুরুষ রাজত্ব করেন। এই সময় হইতেই বাংলা আবার গজাইতে আরম্ভ করে। ইঁহারা একজন ব্রাহ্মণকে খুব সম্মান করিতেন। তাঁহার কথা পূর্বেও বলিয়াছি। তিনি শুদ্ধ 'অমরকোষে'র টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহা হইতেই বাংলা ও সংস্কৃতের চর্চা বাংলায় নবজীবন লাভ করে। দুই শত বৎসর বাংলায় যে কী দুর্দশা ঘটিয়াছিল, বলা যায় না। এই দুই শত বৎসরের মধ্যে যে, কোনো বাংলা বা সংস্কৃত বই লেখা হইয়া ছিল. তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। এমন-কি, কোনো সংস্কৃত বা বাংলা বই যে কপি করা হইয়াছিল, তাহাও পাই নাই। ইতিহাসের মধ্যে এই দুই শত বৎসর যেন সব সাদা।

বৃহস্পতি হইতে আবার বাংলা ও সংস্কৃতের নবজীবন। বৃহস্পতি কতকগুলি চলিত সংস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয়া, তাহাদের পঠন-পাঠনের সুবিধা করিয়া দেন এবং 'স্মৃতিকণ্ঠহার' নামে একখানি স্মৃতির বই লিখিয়া হিন্দুর সমাজ বাঁধিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারই সময় কৃত্তিবাস বড়ো গঙ্গা পার হইয়া, গৌড়ে আসিয়া সুলতানের কাছে আদর ও অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন। মিথিলার বিদ্যাপতি এই সময়েই তাঁহার সুমধুর গানে দেশ মুগ্ধ করেন এবং তাঁহার শৈব ও স্মার্ত পুস্তক-সকল রচনা করেন। চণ্ডীদাসও এই সময়ে তাঁহার গানে বাংলায় একটা নূতন জাগরণ আনিয়া দেন। সুতরাং গণেশবংশীয়

রাজাদের সময়েই বাংলার হিন্দুসমাজের জাগরণ হয়। এ সময়েও বৌদ্ধেরা বেশ প্রবল ছিলেন। ১৪২৬, ১৪৩৬ ও ১৪৪৪ সালেও বাংলায় ভালো ভালো বৌদ্ধ গ্রন্থ কপি করা হয়। বর্ধমানের বেণুগ্রামের মিত্রেরা 'বোধিচর্য্যাবতার' কপি করাইয়াছিলেন। একজন ভিক্ষু লিখিয়াছিলেন, আর-একজন সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন এবং আর-এক ব্যক্তির পড়ার জন্য কপি করা। মিত্র মহাশয় নিজে ও তাঁহার পুত্র দুই জনই 'বোধিচর্য্যাবতার' পড়িয়াছিলেন।

১৪০০ হইতে ১৫০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মণেরা বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিতেছিলেন, আর বৌদ্ধেরাও স্বধর্মের গ্রন্থ-সকল পাঠ করিতে ছিলেন। সে সময়েও ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধকাব্য ও বৌদ্ধ-ধর্মপুস্তক পড়িতেন ও তাহা হইতে উদ্ধার করিতেন।

মুসলমান অধিকারের পূর্বেও বৌদ্ধদের তন্ত্রের বই ছিল। কিন্তু ঐ অধিকারের পর হইতে আর বড়ো একটা তাঁহাদের বাংলা দেশে লেখা তন্ত্রের বই দেখা যায় না। বৃহস্পতি রায়মুকুটদের সময় ব্রাহ্মণদের মধ্যে শংকরাচার্য নামে একজন আবির্ভূত হইয়া তন্ত্র প্রচার আরম্ভ করেন। বড়ো শংকরাচার্য হইতে তাঁহাকে পৃথক করিবার জন্য তাঁহার নাম হইয়াছে গৌড়ীয় শংকরাচার্য। তিনি অনেক বই লেখেন। লোবে বলে, তাঁহার বংশধরেরা আজিও রাঢ় দেশে হুগলি জেলায় বাস করিতেছেন। তিনি কালীমন্ত্রের উপাসক ছিলেন এবং অনেক বইও লিখিয়াছেন; তাহার মধ্যে ৫/৬ খানা বই পাওয়া গিয়াছে। 'প্রপঞ্চসার' বড়ো শংকরাচার্যের নামে চলিতেছে। কিন্তু পড়িলে উহা একেবারে অদ্বৈতাচার্যের লেখা বলিয়া বোধ হয় না। যিনি লিখিয়াছেন, তিনি কমলাকরের পুত্র শংকর। তাঁহার অনেক চেলা ছিলেন, সকলেই কালীবাড়ি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমার বোধ হয়, আমডাঙার কালীবাড়ি তাঁহারই কোনো চেলার তৈয়ারি। উহাতে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত ১৪ টি সমাজ ছিল। সমাজগুলি ঐ কালীবাড়ির মোহান্তদিগের। পাঁজিতে এক শংকরাব্দ পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের জন্মের ৩৬ বৎসর পূর্বে উহার আরম্ভ। উহা এই শংকরাচার্য প্রবর্তন করেন। উনি বৌদ্ধদের তন্ত্র হিন্দুদের মধ্যে প্রচার করেন। অনেক বৌদ্ধ সংকেত ও অনেক বৌদ্ধ নাম ইঁহার পুথিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু যাঁহারা বৌদ্ধতন্ত্র পূর্ব-বাংলার হিন্দুদের মধ্যে প্রচার করেন, তাঁহারা তিন জন— ত্রিগুণানন্দ, তাঁহার চেলা ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার চেলা পূর্ণানন্দ। পূর্ণানন্দের 'তত্ত্বচিন্তামণি' ১৫৭৯ খৃস্টাব্দে লেখা। সুতরাং তাঁহাদের সময় ১৫০০ হইতে ১৬০০ মধ্যে। ইঁহাদেরএক গাড়ি বই পাওয়া যায়। রসিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইঁহাদের অনেকগুলি বই ছাপাইয়াছেন। তাহার মধ্যে ব্রহ্মানন্দের 'তারারহস্য' একখানি। সেখানিতে বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির কথা আছে। তারা, পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের একজনের শক্তি। নেপালের বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা বলেন যে, তারাই প্রজ্ঞা, বুদ্ধের শক্তিও ধর্মের রূপান্তর বা নামান্তর মাত্র।

'তারারহস্য' পড়িয়াআমারও তাই বোধ হইয়াছিল। উহাতে যে সকল ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা হিন্দুদের অকথ্য পঞ্চ মকার। পঞ্চ মকারগুলির সকলই উহাতে বিদ্যমান আছে, বরং তাহা হইতেও অহিন্দু ব্যবহারের কথা উহাতে আছে। লোকে বলে, ঢাকার রমনার কালীবাড়ি ব্রহ্মানন্দেরই স্থাপিত। উনি ঐ মূর্তি কামাখ্যা হইতে আনিতে আনিতে ঐখানে ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং ঐখানেই তাঁহাকে স্থাপন করেন। আমার সংস্কার, ইঁহারা তিন জনেই বৌদ্ধতন্ত্রকে হিন্দু করিয়া দিয়া যান। বৌদ্ধতন্ত্রগুলি লোপ পায়। আর ইঁহাদের শিষ্য-সেবক বেশি হইয়া উঠে। আমাদের এখানেও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ[৪১] অনেকগুলি বৌদ্ধ দেবতাকে তাঁহার 'তন্ত্রসারে' স্থান দিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুটি আমার খুব মনে পড়ে—একটি ক্ষেত্রপাল, আর-একটি মঞ্জুঘোষ—বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রীর অপভ্রংশ। রাঢ় দেশে শুনিয়া আসিয়াছি, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে এখনো মঞ্জুঘোষের উপাসক আছেন। তন্ত্রের এই সকল গ্রন্থকার প্রামাণিক লোক ছিলেন, না দেখিয়া না পড়িয়া তাঁহারা কিছুই লেখেন নাই। 'তন্ত্রসারে'র দেবতারা কৃষ্ণানন্দের সময়ে পূজা পাইতেন, তাই তিনি আপন গ্রন্থে তাঁহাদের স্থান দিয়াছেন। কৃষ্ণানন্দের পৌত্র যে 'আগমকল্পলতিকা' বলিয়া বই লেখেন। তাহাতে আরো অনেক বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি দেওয়া আছে। এইরূপে আস্তে আস্তে বৌদ্ধতন্ত্র লোপ পাইল, আর তাহাদের মধ্যে যাহা লইবার ছিল, ব্রাহ্মণেরা সেগুলি আপন তন্ত্রভুক্ত করিয়া লইলেন। কোনো কোনো বিষয় আপনাদের স্মৃতিতেও উঠাইলেন। এই-সকল দেবতা, ক্রিয়া ও পূজা নিজ গ্রন্থভুক্ত করিবার অর্থ কী? উঁহাদের উপাসক ও পূজকদিগকে আপনাদের ব্রাহ্মণ্যসমাজভুক্ত করিয়া লওয়া।

অন্য কথা কী বলিব, পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের পাঁচটি শক্তি আছেন; তাঁহাদের নাম—রোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা, আর্যতারিকা। ইহাঁদের দু' জনের—মামকী ও পাণ্ডরার পূজা দুর্গোৎসবের মধ্যে হইয়া থাকে। বৌদ্ধদের যে পঞ্চরক্ষা আছেন—মহাপ্রতিসরা, মহামায়ূরী, মহাশীতবতী, মহাসাহস্রপ্রমর্দিনী, মহামন্ত্রানুসারিণী—দুর্গোৎসবের মধ্যে ইঁহাদেরও পূজা হইয়া থাকে।

অনেক দেবতার ধ্যান বৌদ্ধদেরও যেরূপ, আমাদেরও সেইরূপ। উদাহরণ—ক্ষেত্রপাল, উদাহরণ—কালী। এই-সকল দেখিয়া মনে হয়, বাংলায় বৌদ্ধতন্ত্র ক্রমে হিন্দুতন্ত্রভুক্ত হইয়া গিয়াছে, আর যাহা হয় নাই, তাহা লোপ পাইয়াছে।

বৌদ্ধতন্ত্রের পুথিগুলি এইরূপে হিন্দু হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধদের তো দেবতা নাই। সাংখ্যের ন্যায় বৌদ্ধ-দর্শনও দেবতাদিগকে মানুষের চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী জীব বলিয়া মনে করে। তাহারা ইন্দ্র চন্দ্রাদির, এমন-কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতিরও পূজা করে না। তবে তাহাদের আর একরূপ দেবতা আছে; সে বোধিজ্ঞানের পর জন্মায়—ধর্মধাতু হইতে তাহার উৎপত্তি। অথবা তাহারা ধর্মধাতুর বিবর্তমাত্র। তাহাদের নামে প্রায়ই

ঐ শব্দ জোড়া থাকে, যেমন বজ্রবারাহী, বজ্রযোগিনী, বজ্রধাত্বীশ্বরী। ভক্ত আপনাকে সেই দেবতাস্বরূপ মনে করিয়া সাধনা করে।

এই সকল দেবতা আমরা গ্রহণ করিয়াছি। বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন আমরা গ্রহণ করিয়াছি। বুদ্ধদেব আমাদের জগন্নাথ হইয়াছেন, তিনি বিষ্ণুর অবতার। বুদ্ধও বিষ্ণুর অবতার হইয়াছেন। ধর্ম ধর্মঠাকুর হইয়াছেন। বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মধ্যে ধর্ম অনেক সময় স্তূপের আকারে পূজা পাইতেন। স্তূপের পাঁচ দিকে পাঁচটি কুলুঙ্গি থাকে। তাহাতে দেখিতে কচ্ছপের মতো হয়। ধর্মঠাকুরও কচ্ছপাকৃতি। যেখানে ধর্মঘরে যোগী ধর্মঠাকুরের পূজারী, সেখানে ধর্মঠাকুর এখনো বৌদ্ধই আছেন; কেন-না, এই যোগী পূজারীরা ব্রাহ্মণ মানেন না। কিন্তু যেখানে অন্য জাতি পূজারী, সেখানে ধর্মঠাকুর হিন্দু হইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার পূজা করেন, অন্তত পূজারীরা ব্রাহ্মণ মানেন।

সংঘ আর দেবতা নাই, তিনি শঙ্খ হইয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, ময়নায় একটা পুকুর খুঁড়িতে ধর্মঠাকুরের একটা মূর্তি এবং একটা শঙ্খ পাওয়া গিয়াছিল। যে-সকল গন্ধবণিক সংঘে গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করিতেন, তাঁহারা এখন শঙ্খ আশ্রম হইয়াছেন। আর সংঘ শব্দ এখন আমাদের সাংঘাতের মধ্যে আছেন। যেমন—"সই সাংঘাতিন নাতিন মিতিন।" সংঘ আর দেবতা নাই।

বৌদ্ধ দেবতাগুলি আমরা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছি বটে, তাহাদের হিন্দু পোশাক পরাইবার যত্ন করিয়াছি বটে, তাহাদের অনেকটা রূপান্তর করিয়া ফেলিয়াছি বটে— কিন্তু তাহাদের বীজ এখনো ঠিক আছে। সেটা বৌদ্ধদেরও যাহা ছিল, আমাদেরও তাহাই আছে। এই বীজ দিয়াই ধরা পড়ে— কে কাহার কাছ হইতে ধার লইয়াছে। আমাদের তান্ত্রিক দেবতার বীজের আমরা অর্থ করিতে পারি না। কেন এই বীজে এই দেবতা হয়, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু বৌদ্ধেরা ঠিক পারে। তাহাদের বীজ হইতেই দেবতার চেহারার আদরা আসে। আমাদের আসে না। তাই বোধ হয়, আমরাই ঋণী ও বৌদ্ধেরা মহাজন।

দেখুন না, আমরা যখন "ধ্যায়েন্নিত্যং," "ধ্যেয়ঃ সদা" ইত্যাদি মন্ত্রে শিব বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতার ধ্যান করি, তখন আমরা হিন্দু। আর যখন "আত্মানং বিষ্ণুস্বরূপং বিভাব্য" বলিয়া পূজা করি, তখন আমরা বৌদ্ধ। যখন আমরা লিঙ্গমূলে বীজমন্ত্র ধ্যান করি, তাহার পর অনাহতে তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলি, নাভিমূলে তাহাকে স্বর্ণবর্ণ দেখি, হৃদয়ে তাহার হস্ত-পদ বাহির হয়, কণ্ঠদেশে সে স্পষ্ট দেবমূর্তি হয়, আর আজ্ঞাচক্রে মস্তকে সহস্রদল পদ্ম নিম্নাভিমুখ রহিয়াছে, তাহা হইতে নিঃসৃত ক্ষীরধারা ভক্ষণ করি, তখন আমরা খাঁটি বৌদ্ধ। আমরা যখন—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"

বলি, তখন আমরা বৌদ্ধ। আবার যখন আমরা বলি—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।'

তখনো আমরা বৌদ্ধ। বুদ্ধ শব্দে প্রথম প্রথম কল্যাণমিত্র বুঝাইত, ক্রমে উহা গুরুতে আসিয়া দাঁড়ায়। লামা শব্দের অর্থ গুরু; বৌদ্ধেরা গুরু ভজনা করে, তাই তাহারা "গুভাজু"। আর আমরা দেবতা ভজনা করি বলিয়া আমরা "দেবভাজু"। আমরা বাঙালি ব্রাহ্মণেরা এখন অর্ধহিন্দু, অর্ধ-বৌদ্ধ। যখন আমরা সাবিত্রী দীক্ষা লই, তখন আমরা ব্রাহ্মণ। আর যখন গুরু আমাদের কানে ফুঁ দিয়া যান, আর আমরা গুরুর পায়ে লুটাইয়া পড়ি, তখন আমরা বৌদ্ধ।

আচ্ছা, যে ভাবে তোমরা বাংলায় আসিয়াছিলে, সে ভাব ত্যাগ করিয়া এরূপ আধা-বৌদ্ধ আধা-হিন্দু ভাব লইলে কেন? তাহাব কারণ এই যে, আমরা সংখ্যায় কম ছিলাম। পাঁচ জন বৈ তো আসি নাই। বল্লালের সময় ৪০০ ঘর মাত্র হইয়াছিলাম। আমরা রাজার সাহায্য পাইতাম, তা রাজা বৌদ্ধই হউন, আর হিন্দুই হউন। আমাদের সমাজও ছোটো ছিল; যাহারা অবৌদ্ধ অথবা ব্রাহ্মণ-পক্ষ ছিল, তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিতাম। আমাদের একটি সমাজ ছিল। তাহার পর মুসলমান যখন দেশ অধিকার করিল, তখন আমরা রাজার সাহায্য হারাইলাম। আমাদিগকে মুসলমানদের অধীন হিন্দু প্রজাদের উপরই কেবল নির্ভর করিতে হইত। সুতরাং আমাদের দল বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইল। আমাদের সুবিধাও হইল। ভিক্ষুশূন্য বৌদ্ধসমাজ এক রকম বেওয়ারিশ মাল। সে যাহাকে পারে, আপন দলভুক্ত করিতে লাগিল।

এ-সকল ঘটনা বোধ হয়, ১২০০ হইতে ১৪০০ সাল, এই দুই শত বৎসরের মধ্যে হইয়াছিল। যাহারা প্রথম হিন্দুদলভুক্ত হইয়াছিল, তাহারা ভালো ব্যবহার পাইয়াছিল। তাহাদিগকে "নবশাখ" বলে অর্থাৎ নূতন শাখা। তাহার পর কায়স্থগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মান-সম্ভ্রম ও সামাজিক মর্যাদা ছিল। ব্রাহ্মণের দলে আসিয়া তাঁহারা সে মর্যাদা হারান নাই। কায়স্থদের কথা একটু বেশি করিয়া বলা ভালো। বাংলায় জমাজমি সম্বন্ধে কায়স্থগণের ক্ষমতা অসীম ছিল। ফরিদপুরের যে চারিখানি তাম্রশাসনকে রাখালবাবু (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) জাল বলিয়াছিলেন এবং পার্জিটর সাহেব যেগুলিকে প্রমাণ বলিয়াছিলেন, জাল নয়, সেগুলি খৃ. ৫০০ হইতে ৬০০ -এর মধ্যে লেখা। তাহাতে দেখা যায়, বৃদ্ধ কায়স্থ ও কায়স্থগণের অনুমতি ভিন্ন কেহ একটুকুও জমি গ্রামের মধ্যে পাইতে পারিত না। তেঙ্গুরে যে-সকল সংস্কৃত পুস্তকের নাম আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি কায়স্থদের রচিত। টঙ্কদাস নামে একজন বৃদ্ধ কায়স্থ তন্ত্রের পুঁথি লিখিয়াছেন। 'চাঙ্গুকারিকা'গুলি কায়স্থ বৌদ্ধ চাঙ্গুদাসের লেখা। 'চাঙ্গুকারিকা'র টিকাকার বলেন, কায়স্থদের ইষ্টদেবতা বুদ্ধ। সুতরাং কায়স্থদিগের মধ্যে

অনেকে যে বৌদ্ধ ছিলেন, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। মুসলমান অধিকার হওয়ায় তাঁহাদের ক্ষমতা বাড়িয়াছিল বৈ কমে নাই। কারণ, দেশের জমির হাট-হদ্দ তাঁহারাই জানিতেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে মাঝে মাঝে আছে—"নেড়ে জব্দ করবি যদি কায়েৎ ডেকে আন।" ১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্যন্ত কায়স্থগণই বাংলায় বেশি পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। প্রথম, রাজা গণেশ, যিনি বাংলার সুলতান হইয়াছিলেন, তিনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ; দিনাজপুরের রাজারা তাঁহারই দৌহিত্রবংশ। তাহার পর চৈতন্যপরিকরের মধ্যে বাসু ঘোষ ও মাধব ঘোষ প্রবল হইয়াছিলেন। সুবুদ্ধি গৌড়ের মুসলমান বাদশাহের ডান হাত ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্ধন সাতগাঁ দখল করিয়া লইয়া, সেখানকার রাজা হইয়াছিলেন। 'আইন-ই-আকবরী'তে লেখা আছে, কায়স্থরাই জমিদার, তাঁহাদের বিস্তর সৈন্য-সামন্ত ও হাতি ঘোড়া ছিল।

কিন্তু তখনো কায়স্থদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম চলিতেছিল। বেণুগ্রামে মিত্রদিগের বাড়ি তখনো বৌদ্ধধর্মের বই নকল হইতেছিল। তাহা কোনো বিশেষ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বই নয়, একেবারে মহাযানের বই, মহাযানের মর্ম বোধের বই। সে বইখানা ইংরাজি ১৪৩৬ সালে নকল করা হয়। এই সময়ে আরো বৌদ্ধ বই নকল হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। কালচক্রযানের অতি শুদ্ধ বাংলা অক্ষরের একখানি বই কেম্ব্রিজে আছে। 'কলাপ-ব্যাকরণে'র টীকাটিপ্পনী সুদ্ধ বই বৌদ্ধ মঠধারীর জন্য কপি করা হয়। সেখানি ব্রিটিশ মিউজিয়াম আছে।

এই-সকল দৃষ্টে বেশ জানা যায় যে, ১৪০০ হইতে ১৫০০ মধ্যে বৌদ্ধধর্ম এ দেশে চলিতেছিল এবং অনেক কায়স্থও বৌদ্ধ ছিলেন। চৈতন্যদেবের জীবনচরিত লইয়া যে-সকল বই লেখা হয়, তাহাতে বৌদ্ধদের বাংলায় থাকার কথা নাই। চৈতন্যদেব নিজে দক্ষিণ দেশে বৌদ্ধ দেখিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাদের হিমালয়ের মধ্যে দেখিয়াছিলেন। কেবল চূড়ামণিদাস বলিয়াছিলেন যে, চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করায় বৌদ্ধেরা খুব আনন্দিত হইয়াছিল। এই-সকল বই যদিও চৈতন্যের জীবনের ঘটনা লইয়া লেখা, তথাপি এগুলি ১৫৫০ হইতে ১৬০০ মধ্যে লেখা হইয়াছিল।

১৫০০ হইতে ১৬০০ মধ্যে নবদ্বীপের ভট্টাচার্যদিগের অভ্যুত্থান। বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, টীকাকার মথুরানাথ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, গোবিন্দ কবিকঙ্কণাচার্য, শ্রীকর, শ্রীনাথ, রঘনন্দন—এই সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং বাংলায় ন্যায় ও স্মৃতির প্রচার করেন। স্মৃতির প্রচার মানে সমাজ বাঁধা। ইঁহাদের পুস্তকে বৌদ্ধদের নাম বড়ো একটা নাই, কিন্তু ইঁহদের পূর্ববর্তী স্মৃতিকার শূলপাণি লিখিয়াছেন—বৌদ্ধ দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বৌদ্ধ যদি দেশে অধিক থাকিত, তাহা হইলে এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। যে দিকেই হউক, ১৫০০

হইতে ১৬০০ পর্যন্ত এই একশত বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধদের নাম লোপ হয়, আর ব্রাহ্মণেরা সমস্ত দেশটাকে হিন্দু করিয়া তুলেন। এই সময় হইতেই কায়স্থ মহাশয়েরা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে হয় শাক্ত অথবা বৈষ্ণব হন অর্থাৎ হিন্দু হন এবং সমাজ শাসনে ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র সহায় হন। বারো ভুঁইয়ার মধ্যে যে কয়েকজন কায়স্থ ছিলেন, সবাই হিন্দু এবং ব্রাহ্মণদিগের কথামতো সমাজ শাসন করিতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, গুপ্ত উপাধিধারী লোকেরাই বৌদ্ধদিগের জন্য স্মৃতির বই লিখিতেন, পূজা আদির বই লিখিতেন, ব্যবস্থার বই লিখিতেন, দীক্ষার বই লিখিতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের উপর ভিক্ষুরা ছিল। ভিক্ষুরা মারা গেলে বা পলাইয়া গেলে তাঁহারাই বৌদ্ধধর্মের কর্তা হইলেন। কিন্তু কিরূপে তাঁহারা আপনাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস এখনো পাওয়া যায় নাই। তবে চৈতন্যদেবের সময় অনেক গুপ্ত ও তাঁহাদের কুটুম্ব বৈদ্যগণ চৈতন্যদেবের ধর্ম আশ্রয় করেন, ঐ ধর্ম সম্বন্ধে বই লেখেন এবং তাঁহাদের বংশধরেরা এখনো গুরুগিরি করিতেছেন।

১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্যন্ত যাঁহারা বৌদ্ধধর্মের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, ধনের গৌরবে, পদমর্যাদার গৌরবে, বিদ্যার গৌরবে বা অন্য কোনো কারণে বৌদ্ধধর্মেই লাগিয়া ছিলেন, নবদ্বীপের ভট্টাচার্য মহাশয়েরা তাঁহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। চৈতন্যদেব তাঁহাদের হিন্দু করিলেও, নিত্যানন্দদেব তাঁহাদের মন্ত্র দিলেও তাঁহারা অনাচরণীয় হইয়াই রহিয়াছেন। তাহার পর তাঁহারা ব্রাহ্মণ লইয়াছেন। কবিকঙ্কণ লিখিয়া গিয়াছেন, "বর্ণবিপ্র হয় মঠধারী" অর্থাৎ অনাচরণীয় জাতিগণের যাঁহারা বিপ্র হইয়াছেন, তাঁহারা মঠধারী অর্থাৎ ভিক্ষু। আমরা পূর্বপুরুষদের নিকট শুনিয়াছি যে, এই-সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহেন, ইঁহাদের গলায় পইতা দেওয়া হইয়াছিল মাত্র। তাহার পর রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা অনেক সময় জীবিকার আশায়, অনেক সময়ে অন্য কারণে বর্ণের ব্রাহ্মণ হইয়াছেন এবং আপনাদের পূর্ব গাঞী-গোত্র উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই-সকল পতিত বলিয়া পরিচিত ব্রাহ্মণদের গোড়া খুঁজিতে গেলে ৯ বা ১০ পুরুষের বেশি পাওয়া যায় না। তাঁহাদের পূর্বে বর্ণের যেসব ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা "মঠধারী"। কিন্তু এই-সকল ব্রাহ্মণকে বাধ্য হইয়া মঠধারীদের সহিত বিবাহাদি করিতে হইত, সতরাং ইঁহারা এখন এক-একটি স্বতন্ত্র জাতি হইয়া উঠিয়াছেন। বর্ণব্রাহ্মণদের একটু বিশেষত্ব এই যে, এক বর্ণের ব্রাহ্মণ অন্য বর্ণের ব্রাহ্মণকে অনাচরণীয় মনে করেন। তাঁহারা যদি এক হইয়া বসেন, তাহা হইলে আমরা একেবারে মারা যাইব। কারণ, তাঁহাদের সংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিতে রাজি নহেন। কেন নহেন, তাহার মূলতত্ত্ব একটি প্রধান রিসার্চের

কথা। ঐ মূল কথাটি বাহির হইলে সমাজ সংস্কারের যে ঢেউ উঠিয়াছে, উহার অনেক সমাধা হইবে এবং জোরে সংস্কার চলিতে পারিবে।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৬॥

ভারতের ভক্তি সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব

মানুষ ইচ্ছা করুক বা নাই করুক, ত্রিবর্গ তাহাদের সাধন করিতেই হয়। এই ত্রিবর্গের নাম ধর্ম, অর্থ ও কাম অথবা দরকার দেখিয়া যদি বলিতে হয় অর্থ কাম ও ধর্ম— অর্থ সকলের চেয়ে দরকারি, কেননা, নহিলে শরীর ধারণ হয় না, আর শরীর নহিলে কোনো কাজই হয় না। তাহার পর কাম নহিলে বংশরক্ষা হয় না, জাতিরক্ষা হয় না। তাহার পর ধর্ম যাহাতে ধরিয়া রাখে বাঁধিয়া রাখে অর্থাৎ সমাজ বাঁধিয়া রাখে, বংশের ধারা ধরিয়া রাখে।

এই ত্রিবর্গ সাধনের প্রধান বই 'বৃহস্পতিসূত্র'। তিনি বলেন তোমরা যদি অর্থ সঞ্চয়ে মনোযোগ করিতে চাও লোকায়তিকই তোমাদের একমাত্র শাস্ত্র। যদি কামসাধন করিতে চাও কাপালিকই তোমাদের একমাত্র শাস্ত্র, আর যদি ধর্ম উপার্জন করিতে চাও তাহা হইলে অর্হতই তোমাদের একমাত্র শাস্ত্র। তিনি এই ত্রিবর্গ সাধনের উপায় বলিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে নাস্তিক পাষন্ড প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া গাল দিয়া থাকি। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ত্রিবর্গ সাধন করিলেও সে আস্তিক হইবে না। আস্তিক হইতে গেলে আর-একটি জিনিস চাই, সেটি পরলোকবিশ্বাস। চলিত কথায় ঈশ্বর না মানিলেই নাস্তিক হয়, মানিলেই আস্তিক হয়, কিন্তু কথাটা তা নয়, ঈশ্বর মানো আর না-ই মানো পরলোক মানিলেই আস্তিক, নহিলে নাস্তিক। সাংখ্যেরা নিরীশ্বরবাদী হইয়াও আস্তিক।

আস্তিক হইতে গেলেই, পরলোক মানিতে গেলেই, পরলোক যাহাতে ভালো হয় তাহার জন্য একটা সাধনা করিতে হয়। সে সাধনাও ত্রিবর্গ সাধনার মধ্যে পড়ে কি-না। অনেকে মনে করেন, ধর্ম সাধনার মধ্যে সেটাও পড়ে। দেবলোক, স্বর্গলোক, পিতৃলোক, ব্রহ্মালোক, বিষ্ণুলোক পাইতে গেলে ধর্ম সাধনাই প্রধান অবলম্বন। সুতরাং অনেকে ত্রিবর্গ সাধনাই মনুষ্যের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। অনেকে মনে করেন ত্রিবর্গ সাধনা ছাড়া আরো একটা সাধনা আছে, উহা শুদ্ধ পরলোকের জন্য, উহার নাম মোক্ষ সাধনা। এইরূপে ত্রিবর্গ হইতে আমরা চতুর্বর্গে উঠিতে পারি। কিন্তু মোক্ষ সাধনা একেবারে তো অতীন্দ্রিয় সাধনা। পরকালের সকল কথাই অতীন্দ্রিয়,

সুতরাং অতীন্দ্রিয় লইয়া জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়। স্বর্গবাসই কি পরলোক সাধনার চরম? পিতৃলোক বাসই কি পরলোক সাধনার চরম? আবার তো ফিরিয়া আসিতে হইবে? আবার তো সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে হইবে। তাহা হইলে উহা চরম হইতে পারে না। ঐ-সকল উচ্চলোক প্রাপ্তি তো ক্ষণস্থায়ী, যেমন পাপ বা পুণ্য করিবে তেমনই তাহার ফলভোগ করিবে—পরলোকে তা সুখই ভোগ করো আর দুঃখই ভোগ করো। সেইজন্য প্রথম হইতে লোকে জন্ম-জরা-মরণ—এ ত্রিতাপের হাত হইতে আত্যন্তিক এবং প্রকান্তিক মুক্তি লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন হইতেই মোক্ষ সাধনা জমিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহারা মনে করিলেন জন্ম, জরা ও মরণের হাত এড়াইতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। নির্বাণলাভের পর কী থাকিবে একথা জিজ্ঞেস করিলে বুদ্ধদেব বলিতেন, সে কথায় তোমার কাজ কী? তোমায় আর জন্মাইতে হইবে না, বৃদ্ধ হইতে হইতে মরিতে হইবে না, এই হইলেই তোমার যথেষ্ট হইল, তুমি ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকো। সাংখ্যেরা বলিতেন, তুমি প্রকৃতির নাচ দেখিলে, তুমি প্রকৃতি হইতে পৃথক একথা বুঝিলে, তোমার বিবেকখ্যাতি হইলেই যথেষ্ট, আর সাধনার প্রয়োজন কী? কিন্তু কোনো বিষয়ে চিন্তাস্রোত একবার বহিতে থাকিলে তাহাকে রোধ করা অসম্ভব। উহাতে "যথেষ্ট" শব্দের প্রয়োগ আর চলে না। শুদ্ধ জন্ম-জরা-মরণ রোধ করিয়া লোক ক্ষান্ত থাকিল না। ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল।

নির্বাণ তো শান্ত হইয়া যাওয়া। প্রদীপ নিবিলে যেমন ঠান্ডা হইয়া যায় তেমনি ঠান্ডা হইয়া যাওয়া। দীপো যথা।

সাংখ্যদের কৈবল্য তো কেবল হইয়া যাওয়া। আমি আছি, আমি জন্ম-জরা-মরণের হাত এড়াইয়াছি। কিন্তু আমার সঙ্গে জগতের কাহারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই।

পরকালের এইরূপ ধারণায় লোক বেশিদিন তৃপ্ত থাকিতে পারে না, সুতরাং পন্ডিতেরা ইহার পর কী হইবে তাহার সন্ধান আরম্ভ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ ও কপিল যেখানে দাঁড়ি টানিয়া দিয়াছেন তাহা উঠাইয়া দিয়া তাহার বাহিরেও যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শৈবেরা স্থির-গণ-পদ-প্রাপ্তি ও শুদ্ধ-গণ-পদ-প্রাপ্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেরা সামীপ্য সারূপ্য সালোক্য ও সাযুজ্য চাহিতে লাগিলেন, জৈনেরা কেবলী শ্রুতকেবলী হইতে চাহিলেন। আস্তিকেরা পরব্রহ্মে লীন হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধেরা নির্বাণ হইতে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, তাহা হইতেও ধর্মকায় ও সম্ভোগকায় ও নির্মাণকায় আকাঙ্ক্ষা করিয়া ধর্মকায়ই প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলেরই চেষ্টা হইল আর ফিরিতে না হয়, কিন্তু ফিরিলাম না তো সেখানে কী ভাবে থাকিব তাহাই লইয়া সকলেই মাথা ঘামাইতে লাগিলেন।

দেখিতে পাওয়া যায়, যখনই যখনই মুক্তির লক্ষণ চরমে উঠে তখনই তখনই ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হন এবং মুক্তির তেজ কমাইয়া দেন। এ সম্বন্ধে 'মহাভারত' ও 'শ্রীমদ্ভাগবত' হইতে একটি উদাহরণ দিব। উদাহরণটির রস বড়োই করুণ। এত করুণরস মহাকাব্যেও দুর্লভ। উদাহরণটি এই—

কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস সংসারী ছিলেন। তাঁহার পুত্র শুকদেব কিন্তু সন্ন্যাসী এবং মুক্তিকামী। গর্ভাবস্থা হইতেই তিনি একরূপ মুক্ত পুরুষ। প্রবৃত্তি তাঁহার কিছুতেই ছিল না। একটু বয়স হইলেই শুকদেব মুক্তিলাভের জন্য সূর্যের দিকে যাত্রা করিলেন। আপনারা সকলেই জানেন, মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ্যধর্ম-অবলম্বীদিগের আত্মা দুই পথে যাত্রা করেন, এক পিতৃযান ও আর এক দেবযান। পিতৃযানে যাইতে হইলে চন্দ্রের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, দেবযানে যাইতে হইলে সূর্যের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। চন্দ্রলোকে যাইলে পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। সূর্যলোক দিয়া গেলে পুনরাবৃত্তি নাই। শুকদেব মুক্তিকাম, সুতরাং তিনি সূর্যমন্ডলাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ব্যাসদেব পুত্রবিরহে কাতর হইয়া হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া করুণ ক্রন্দনে দিগন্ত ভরাইয়া দিয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা, যেও না, যেও না, ফিরে এসো, ফিরে এসো।" শুকদেবও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আর না, আর না।" দেবাসুর, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, কিন্নর স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল, শুকদেব নক্ষত্রবেগে সূর্যমন্ডলে পতিত হইলেন—আর তাঁহার কিছুই দেখা গেল না। 'মহাভারতে', এই পর্যন্তই শেষ। শুকদেব মনুষ্যজীবনের চরম সীমা মুক্তিলাভ করিলেন। সকলেই ব্যাসদেবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রহিল।

'ভাগবতে'র প্রথম স্কন্ধে এই গল্পটি ঠিক আছে, কিন্তু ইহার পরে আরো অনেক কথা আছে—

শুকদেব সূর্যমন্ডল ভেদ করিয়া, লোকের পর লোক উঠিয়া, তথায় তিনি বিষ্ণুর সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ তিনি বিষ্ণুলোকেই থাকিতেন ও তিনি বিষ্ণুর ন্যায় চতুর্ভুজ আকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুর সবই পাইয়াছিলেন, কেবল আধিপত্য পান নাই। একদিন ভগবান্ শ্বেতদ্বীপে গিয়া উপস্থিত, সঙ্গে শুকদেব আছেন। সেখানকার সব অধিবাসী ঐকান্তিক অর্থাৎ সব ছাড়িয়া আপনাদের মন-প্রাণ সমস্তই বিষ্ণুকে অর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। আর-কিছুরই ভাবনা নাই, আর কিছুরই চিন্তা নাই। ইঁহাদিগকে দেখিয়া ভগবান্ শুকদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শুকদেব, তুমি এখানে কী করিতেছ? তুমি তোমার বাবার কাছে ফিরিয়া যাও, সেখানে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া পুরাণ লেখো, যাহাতে ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির প্রচার

হয়।" শুকদেব আবার দ্বিভুজ কৌপীনধারী মূর্তি ধারণ করিয়া বদরিকাশ্রমে পিতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতাও বহুকাল পরে হারানিধি ফিরিয়া পাইয়া স্নেহভরে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং ভগবানের আদেশ মতো তাঁহাকে 'শ্রীমদ্ভাগবত' রচনায় সাহায্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রথম ও প্রধান ভক্তিশাস্ত্রের আবির্ভাব হইল।

যখন শাক্যসিংহ ও মহাবীর জ্ঞানপ্রধান বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়েই ভক্তিমূলক বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের উৎপত্তি। আবার যখন বৌদ্ধগণ, শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও মহাসুখবাদ লইয়া এবং শংকরাচার্য প্রভৃতি বেদান্তবাদীগণ সচ্চিদানন্দঘন মত লইয়া আন্দোলন করিতেছিলেন, তখনই দ্রাবিড় দেশে বিষ্ণুস্বামী আবির্ভূত হইয়া ভক্তিমার্গ প্রচলন করিলেন। ইনিই সর্ব প্রথম বলিয়া দিলেন, "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ।" বিষ্ণুস্বামীর মত প্রায় ২০০ বৎসর খুব চলিয়াছিল। তারপর, রামানুজ, মধ্বাচার্য, নিম্বাদিত্য প্রবল হইয়া উঠিয়া তাঁহার মতকে চাপা দিলেন। সকলেই ভক্তিমার্গের উপাসক, কিন্তু ভক্তির সহিত দর্শনের অদ্বৈত মত চলিতে পারে না। তাই ভক্তিশাস্ত্র ক্রমে দ্বৈতভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মধ্বাচার্য ও নিম্বাদিত্য দুই জনেই পুরা মাত্রায় দ্বৈতবাদী ছিলেন। ইঁহাদের মত এখনো চলিতছে, এবং কোটি কোটি লোক ইঁহাদের উপদেশ অনুসারে চরিত্র গঠন করিতেছে, সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতেছে ও হৃদয়ের সান্ত্বনা লাভ করিতেছে। তাহারা প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়াই বলে—

"লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব
শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় ভবৎ-প্রাসাদাৎ
সংসারযাত্রামতিবর্ত্তয়িষ্যে।।"

বিষ্ণুস্বামীর মত দ্রাবিড়ে লোপ হইলেও, ৩০০ বৎসর পরে গোকুল বৃন্দাবনে আবার জাগিয়া উঠিল। বিষ্ণুস্বামীর মতাবলম্বী লক্ষ্মণ আর্য নামক একজন লোক অন্ধ্র দেশ হইতে আসিয়া কাশীবাস করেন। তাঁহারই পুত্র বল্লভাচার্য গোকুল বৃন্দাবনে গিয়া বিষ্ণুস্বামীর মত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করেন, যাগ-যজ্ঞাদি করেন, অথচ বিষ্ণু সেবায়ই আত্মসমর্পণ করেন।

খৃস্টের পর ১২ শতকে ভক্তিটা দক্ষিণ দেশেই খুব প্রসার পাইয়াছিল, উত্তর-ভারতে ছিল না। সেই সময়ে একটা কথা উঠে—

"উৎপন্না দ্রাবিড়ে ভক্তির্বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।

ক্বচিৎ ক্বচিন্ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা।।"

কিন্তু ইহার পর হইতেই আর্যাবর্তে ভক্তির খুব প্রচলন হয়। গুজরাটেই প্রথম নরসিংহ ভক্তিধর্মের ধ্বজা তুলেন। তাহার পর যে কত বৈষ্ণব উত্তর-ভারতে ভক্তিধর্মের প্রচার করেন, তাহার সীমা নাই। বল্লভাচার্যের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। রামানন্দের মত এতদিন বড়ো জানা ছিল না, এখন তাঁহার মত লইয়া বেশ আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ১৪৮৬ খৃস্টাব্দে আবির্ভূত হইয়া আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশ ভক্তির স্রোতে ডুবাইয়া দেন। সে স্রোতে—

"শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়।"

তাঁহার দল চারি শত বৎসর ধরিয়া ক্রমেই প্রবল হইতেছিল। এক এক সময় মনে হয় যেন বাংলায় আর-সকল ধর্ম লোপ হইয়া চৈতন্য-প্রতিষ্ঠিত ধর্মই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কিন্তু ভক্তিধর্মের কথা বলিতে বলিতে অনেক কথাই বলিলাম। কিন্তু জ্ঞানপ্রধান ধর্মে ভক্তি কোথা হইতে আসিবে? তখন আমার মনে হইল, আমার বাল্যকালের বন্ধু, গুরু ও দেবতা ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন, "বুদ্ধদেব হইতেই ভক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, কারণ ভক্তি মানুষের উপরই হয়, দেবতাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহার উপর হয় না। বুদ্ধের ন্যায় লোকোত্তর মনুষ্যের উপরই প্রথম ভক্তি হয়, এবং সেইখান হইতেই ভক্তির আরম্ভ।" কথাটা সত্য কি মিথ্যা জানি না, কিন্তু কথাটা মনে লাগিয়াছিল। মনে পড়িল, রামচন্দ্র কবিভারতী নামক একজন লোক গৌড় দেশে বারেন্দ্রভূমে বেরবতী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২২০ খৃস্টাব্দে সিংহলে যান। তথায় পরাক্রমবাহু নামক রাজা তাঁহাকে "বুদ্ধাগমচক্রবর্তী" উপাধি প্রদান করেন। তিনি 'বুদ্ধশতক' বা 'ভক্তিশতক' নামক একখানি পুথি রচনা করেন। পুথিখানি পড়িয়া তখন রাজকৃষ্ণবাবুর কথাটা কতক সত্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। পুথিখানি খুঁজিয়া লইয়া পড়িলাম। উহা হইতে কয়েকটি ভক্তিরসের কবিতা আপনাদিগকে উপহার দিতেছি। ২৫নং কবিতাটি এই—

"ত্বদ্ বৈরাগ্য-সমস্ত-ভূত-করুণা-প্রজ্ঞাদি-নানা-গুণ-
স্ফূর্য্যচ্চন্দন-পঙ্ক-সিন্ধু-পতিতো গন্তুং ক্ষমো নান্যতঃ।
ভূপা বা যদি দণ্ডয়ন্তি বিবুধা নিন্দন্তি বা বান্ধবা
মুঞ্চন্তি ক্ষণমপ্যহং জিনপিতঃ জীবামি ন ত্বাং বিনা।।"

২৪ নং কবিতাটি এই—

"নাহং লাভার্চনার্থী ন চ ভয়চকিতো নাপি সৎকীর্তিকামো
ন ত্বং ঘর্মাংশুপ্রভব ইতি খুনে নাপি বিদ্যাশয়া তে।

পারম্পর্য্যান্ ন চ ত্বাং শরণমুপগতঃ কিন্তু তে সার্বজন্যং
সম্যগ্ জ্ঞানং সমীক্ষ্য ত্বয়ি ভবজলধিং সন্তরীতুং প্রবৃত্তঃ।।"

২২ নং —

"মূৰ্দ্ধন্ বুদ্ধং নম ত্বং, শ্রবণ শৃণু সদা ধর্মমদ্বৈধবাদি-
প্রোক্তং, সর্ব্বজ্ঞরূপং নয়ন নিরূপমং পশ্য জিহ্বাংঘ্রিপদ্মম্।
ঘ্রাণ ত্বং চ অর্কবন্ধোঃ, স্তুহি সখি রসনে, শ্রীঘনং পূজয়েথাঃ
সিদ্ধং পাণে ব্রজাংঙ্ঘ্রে জিনসদনম্, অদঃ সদ্গুণং চিত্ত চিন্ত্য।।"

১৩ নং—

"পুনরপি শরণং ব্রজামি বুদ্ধং পুনরপি লোকগুরুং গুরুং করোমি।
পুনরপি কথয়ামি নৌমি বন্দে ত্বয়ি মম গৌতম নৈব তৃপ্তিমাস্তে।।"

২৭ নং—

"তবৈবাহং দাসো গুণপণগৃহীতোঽস্মি ভবতা
তবৈবাহং শিষ্যঃ স্ববচনবিনীতোঽস্মি ভবতা।
তবৈবাহং পুত্রঃ স্মৃতিকৃতিসুখস্তদ্গতিগতো
গুরো, বুদ্ধ, স্বামিন্, মম জনক মাং পাহি ভবতঃ।।"

৩৩ নং—

"জগদুপকৃতেরেব বুদ্ধপূজা তদপকৃতে স্তব লোকনাথ পীড়া।
জিন জগদপকৃৎ কথং ন লজ্জে গদিতুমহং তব পাদপদ্মভক্তঃ।।"

৮৯ নং—

"স্নানে, কর্মণি, ভোজনে, বিতরণে, ঘ্রাণে, কথাকর্ণনে,
ধ্যান-স্পর্শন-দর্শনাদিষু তথা, সম্ভাষণদাবপি।
প্রাতঃ, সায়মথ, দিবা চ, নিশি চ, তৎপাদপদ্মে প্রভো,
চিত্তং মে রমতাং, মুনীন্দ্র, সততং, যূনাং যুবত্যাং ইব।।"

১০৪ নং—

"অপি গগনমনন্তং সর্বসত্ত্বোপ্যনন্তঃ
সকলমিদম্ অনন্তং চক্রবালং বিশালম্।
বদসি জিন বিদিত্বানন্তয়া জ্ঞানগত্যা
তব চ গুণমনন্তং বেৎসি বুদ্ধ ত্বমেব।।"

বৌদ্ধধর্মে ভক্তি আর-একদিক হইতে আসিয়াছে। গোড়ায় বৌদ্ধরা গুরু বলিয়া একটা পদার্থ স্বীকারই করিত না। আমরা যাহাকে গুরু বলি তাহারা তাহাকে

"কল্যাণমিত্র" বলিত। সকলেই যেখানে সমান, সেখানে একজন আর-একজনের গুরু হইবে কী করিয়া? কিন্তু মহাযানে যখন দার্শনিক মত এক গভীর হইয়া দাঁড়াইল যে, সাধারণে তাহা বুঝিতে পারে না, তখন সেই মত যাহারা প্রচার করিত তাহাদের গুরু না বলিয়া পারা যাইত না। গুরুর তুলনায় শিষ্য আপনাকে যতই দীন বলিয়া মনে করিতে লাগিল—আপনার দৈন্য যতই তাহার নিকট প্রকট হইতে লাগিল, ততই সে গুরুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে লাগিল। তনু, মন, গুরুকে অর্পণ করিতে লাগিল। ধন অর্পণ করা সোজা কথা, তনু অর্পণ করা অনেক কঠিন, মন অর্পণ করা আরো কঠিন। কিন্তু শিষ্যেরা গুরুকে সবই অর্পণ করে। আগে বৌদ্ধধর্মে এক গুরু ছিলেন—তিনি স্বয়ং শাক্যসিংহ; কিন্তু পরে অনেক গুরু হইতে লাগিল। যাহার নিকট সান্ত্বনা পাইত তাহাকেই গুরু বলিত। লামা শব্দের অর্থ গুরু। সেই গুরু যদি আবার সংসারী না হইয়া সন্ন্যাসী হন, তাঁহার উপর ভক্তি বাড়িবার ছাড়া কমিবার কথা নয়। এখন যে-সকল বৌদ্ধেরা দল বাঁধিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, প্রত্যেক দলে অনেকগুলি গুরু ও অনেকগুলি শিষ্য থাকে। তাহাদের মধ্যে একজন শিষ্যের সহিত ভাব করিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "গুরু তোমাদের কী উপদেশ দেন?" সে বলিল, "কিছুই উপদেশ দেন না। কাছে থাকিতে দেন এই যথেষ্ট। আমরা বহুদিন মন-প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারি। আমরা যে-সব বিষয়ে উপদেশ চাই, সে-সকল উপদেশ কথায় দেওয়া যায় না। গুরু কৃপা হইলে সে-সকল আপনিই মনে উদয় হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমরা এরূপ গুরুর সেবা করিতে পারি না?" সে বলিল, "একেবারেই পারেন না। সেরূপ 'ধ্যান দেওয়া' আপনাদের পক্ষে অসম্ভব। এই যে ভক্তি ইহা সহজে লাভ করা যায় না।" শিষ্যের এইসব কথা শুনিয়া আমার কাহ্নপাদের চর্যা মনে পড়িল—

"ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জায়
কাঅ বাক্ চিঅ জসু ণ সমাঅ।।
আলে গুরু উএসই সীস।
বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস।।
জে তই বোলী তে তবি টাল
গুরুবোধসে সীস কাল।।
ভণই কাহ্ন জিনরঅণ বি কসইসা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা।।"

কথাটা ঠিক। যাহা স্বসংবেদ্য তাহা কে কাহাকে বুঝাইবে? বুঝাইবার সময় গুরু

বোবা, শিষ্য কালা। তথাপি যাঁহার কৃপায় সে জিনিসটি আমার স্বসংবেদ্য হয়, তাঁহাকে ভক্তি করিয়া আমি লুকাইয়া উঠিতে পারি কি?

শেষাশেষি অবস্থায় একবার ভক্তিশাস্ত্র যিনি আমাদের গুরুর গুরু পরম গুরু, তাঁহার কথা কিছু আলোচনা না করিয়া ছাড়া যায় না। তিনি ভক্তিশাস্ত্র-প্রণেতা শাণ্ডিল্য ঋষি। তাঁহার সঙ্গে আরো এক জনের নাম করিতে হয়—ইনি স্বপ্নেশ্বর—'ভক্তিসূত্রে'র টীকাকার। স্বপ্নেশ্বর বাংলায় এক প্রসিদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রে বাঁড়ুয্যে বংশে নরহরির নাম খুব প্রসিদ্ধ। তাঁহার উপাধি ছিল বিশারদ। তাঁহার পুত্র বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র আনিয়া প্রথম বাংলায় প্রচার করেন; এবং শেষ বয়সে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া বাস করেন এবং তথায় অতি বৃদ্ধ বয়সে চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হইয়া ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া 'চৈতন্যশতক' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুত্র জলেশ্বর উড়িষ্যাধিপতির বাহিনীপতি নিযুক্ত হন। জলেশ্বরের পুত্র স্বপ্নেশ্বর 'শাণ্ডিল্যসূত্রে'র টীকাকার।

শাণ্ডিল্য মুনি ভক্তির লক্ষণ করিয়াছেন—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" স্বপ্নেশ্বর টীকায় বলিয়াছেন—"পরমেশ্বরবিষয়কান্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ এব ভক্তিঃ।"

একজন উপকার করিলে তাঁহার প্রতি যে ভক্তি হয় সে ভক্তি ভক্তি নয়। যখন মনের মালিন্যাদি নিরস্ত হয় তখন ভগবানের প্রতি অনুরাগ মাত্রেই মুক্তি হয়, যথা গোপীদের হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে আছে—

"তচ্চিন্তা বিপুলাহ্লাদ ক্ষীণাপুণ্যচয়া সতী।
তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখ বিলীনাশেষপাতকাঃ।।
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা।।"

পরানুরাগ হইতেই গোপীদিগের মুক্তি হইয়া গেল।

"শাণ্ডিল্যসূত্র" ও স্বপ্নেশ্বরের টীকায় ভক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। জ্ঞান ও ভক্তির প্রভেদ কী, সেটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আছে। যাঁহারা জীবব্রহ্মে ভেদ আছে মনে করেন, তাঁহারা পরমেশ্বরের মতো ঐশ্বর্যবিশিষ্ট পদার্থের উপর ভক্তি হয় বলিয়া স্বীকার করেন। যাঁহারা জীব ও ব্রহ্মের কল্পনাকে মিথ্যা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা শুদ্ধ চিদাত্মাকেই ভক্তির বিষয় বলিয়া মনে করেন, কিন্তু শাণ্ডিল্য মুনি উভয়কেই ভক্তির বিষয় বলিয়া মনে করেন। যেরূপেই হউক, এই ভক্তিসূত্রে ঈশ্বর ভিন্ন অন্যত্র পরাভক্তি হইতে পারে একথা স্বীকার করেন না। সুতরাং ইঁহার মতে বৌদ্ধেরা যখন

ঈশ্বর মানে না, আত্মাও মানে না তখন বৌদ্ধধর্মের প্রতি ভক্তি থাকা অসম্ভব। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি, বৌদ্ধধর্মেও ভক্তির প্রভাব খুব হইয়াছিল এবং এখনো খুব আছে, তবে ভক্তির লক্ষণ দু' জায়গায় স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে অথবা 'শাণ্ডিল্যসূত্রে' ঈশ্বর শব্দে বুদ্ধকেও মিলাইয়া লইতে হইবে।

এ স্থলে আমরা আমাদের ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেনের একটি পদ উদ্ধার করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি বলিয়াছেন—

"সকলের সার ভক্তি—মুক্তি তার দাসী।"

অনেক ভক্ত মুক্তি চানই না। তাঁহারা বলেন, আমরা শিবের গণ হইয়া থাকিব, আমরা বিষ্ণুলোকে বিষ্ণু-সামীপ্য, বিষ্ণু-সালোক্য ও বিষ্ণুসারূপ্য লইয়াই খুশি থাকিব, নির্বাণ মুক্তি আমাদের দরকার নাই। অনেক বৌদ্ধ ভক্তিই প্রার্থনা করেন—অনুপধিশেষ নির্বাণও তাঁহারা চাহেন না। বুদ্ধভক্তি তাঁহাদিগকে জীবের মুক্তি দিতে শিখাইয়াছে। যতক্ষণ একটি প্রাণীও অমুক্ত থাকিবে ততক্ষণ তাঁহারা নির্বাণ চাহেন না। অতএব রামচন্দ্র কবিভারতী বলিয়াছেন—

"উপপতিমসতীব চিত্তবৃত্তিঃ
ব্রজতি ভবন্তমপাস্য পঞ্চকামম্।
অপিচ বিষয়িণো ন মোক্ষসিদ্ধিঃ
কিমু করবাণি মুনীন্দ্র দেহি দাস্যম্।।'

"স ভবতি ম্রতিমান্ স না কুলীনঃ
স চ গুণবান্ স চ কীর্ত্তিমান স সুরঃ।
স জগতি মহিতঃ সুখী স এব
ত্বয়ি জিন যস্য সুনিশ্চলাস্তি ভক্তিঃ।।"৫৭।।

"অপি সকলমধীত অত্র তেন
শ্রুতমপি সর্ব্বমনুষ্ঠিত চ তেন।
অপিজিতমজিতেন তেন বিশ্বম্
ত্বয়ি জিন যস্য সুনিশ্চলাস্তি ভক্তি।।"৫৮।।

"সুগতপদপরাঙ্মুখস্য পুংসঃ
কিমু তপসা যশসা কিম্ কিমন্যৈঃ
সুগতপদ্যপরাঙ্মুখস্য পুংসঃ
কিমু তপসা যশসা কিম্ কিমন্যৈঃ।

রামপ্রসাদ সেনের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আবার বলি,

"সকলের সার ভক্তি মুক্তি তার দাসী।"

'শারদীয়া বসুমতী', ১৩৫৭॥

Buddhism in Bengal Since the Muhammadan Conquest

Whatever might have been the fate of Biddhism in other parts of India, in the Provinces of Eastern India, it had to suffer serious persecution, nay, it may be said, that Buddhism was expelled from Eastern India by fire and sword. In making excavations at Kusinagara ashes were discovered after a certain depth, plainly indicating that fire was one of the agencies employed in the expulsion of Buddhism.[1] At Sarnath in Benares, the excavations laid open cook-rooms containing half-boiled rice rotting there for centuries.[2] The catastrophe was so sudden that the poor Bhiksus could not even complete their meals. Sir A. Cunningham quotes two passages, one from Tibetan and another from Muhammadan sources, to shew that at the last Buddhist capital of Bihar, Bakhtiyar Khilji put a large number of shaven Brahmans, i.e., Buddhist Bhiksus assembled at a monastery, to the sword.[3]

All these facts plainly shew that fire and sword were employed in the destruction of Buddhism in Eastern India. But who employed them? In the case of Odantapuri, the last capital of Bihar, it was certainly the Muhammadans, and persumably in other cases also, they were the destroyers. The Hindu mode of presecuting Buddhists, was quite different. It was persecution and annoyance, and not destruction, Sasanka cut down the Bo tree.[4] Udayana held a disputation with the life of his Buddhist antagonist at state. Gangesopadhyaya wrote his great work on Logic with the express object of Prachanda Pasandatamastitirseya i.e. for dispelling the darkness created by powerful heretics ; and Udayana worte a work entitled *Bauddha-dhikkara, or,* 'Fie on the Buddhist!' Another Hindu revivalist Prohibited the sounding of the bell at Buddhist Viharas, till he was worsted in disputation.[5] This is the Hindu way of persecution. The Sena rajas of Bengal used to grant lands to Brahmans bordering on Buddhist Viharas, thus setting up a perpetual

source of annoyance to the inmates of the monastery.[7] Ridicule was one of the powerful weapons used by the Hindus in annoying the Buddhists, who were held up in dramas like the *Probodha Chandrodaya*, as great libertines, fond of wine and women. In later Tantras too, Buddha and his followers are regarded as men of pleasure. Their method of obtaining spiritual success, was by means of wine and women. In the Chinachara-tantra Tantra, Vasistha is sent of China for obtaining success by means of the Tara-mantra from Buddha, who lived surrounded by women in China. This is annoyance and teasing, but not destruction.

Assuming, therefore, that the Muhammadan conquest dealt a death blow to the expiring efforts of Buddhism in Eastern India, it may be asked, was the destruction of Buddhism caused by Muhammadan conquest complete? People think it to be so, but this is phisically impossible. The Muhammadan conquest itself was not a complete conquest, the Pathans held the country simply in military occupation. They held some of the big cities and left the rest of the country to govern itself the best it could. It was not possible for them to destroy Buddhism all over the country. Then again, it is difficult to say that the conquerors could distinguish between Hinduism and Buddhism. They were iconoclasts. They destroyed idols, no matter whether they were Hindu or Buddhist. In fact, the pressure of the conquest was felt by both Hindus and Buddhists alike. The Brahmans from Rarh and Varendra flocked to Vikramapura,[8] the last stronghold of the Sena rajas, and up to this date there are more Rarhi Brahmans at that remote corner of Bengal than in Rarha itself, especially the higher class *Kulins*. To drive away Brahmans and to destroy a few families is one thing, but quite another thing is the wholesale massacre of Buddhist monks, assembled in central Viharas dirung the *Vasso*. If one single monastery is destroyed with all its monks, a whole district, nay, even a larger area, will be without religious leaders and religious teachers altogether. A few cases of massacre like that at Odantapuri, would leave the entire Buddhist population of Bengal and Bihar without leaders. One would be disposed to account for the existence of a vast Muhammadan population in the districts of Bengal, amounting to 25 millions of people, by the easy conversion of the Buddhist population after the destruction of their monasteries.

The helpless Buddhists would naturally be inclined more to Muhammadanism, which has no restriction of food, &c., than to Hinduism, which imposes thousands of restrictions on every action of life.

But was Buddhism actually effaced from the soil of Bengal and Bihar ? People think so, but there were traces of Buddhism till very lately. A Kayastha belonging to Magadha, copied a Buddhist Ms. in 1446. The Ms. is now at Cambridge.[9] That shews signs of lingering Buddhism. Dr. Hoey has discovered an inscription at Set, dated in the thirteenth century, dedicating a temple to the Buddha.[10] Buddhist monks were at Bodh Gaya so late as 1331. The Bodh Gaya temple was repaired by a King of Arakan in 1305. A biographer of Chaitanya, named Chudamani Dasa. makes Buddhists rejoice at the birth of Chaitanya. One of the great millionaires of Satgao in Chaitanya's time, belonging to the Sonarbania caste, refuses to accept Vaisnavism on the ground that he would not like to be saved, when the whole world round him is plunged in misery.[11] This is pure Buddhistic sentiment absolutely unknown to the Hindus. Sulapani, writing after the Muhammadan conquest, makes the very sight of a Buddhist an occasion for performing expiatory ceremonies. The word of the text he quotes in *Nagna,* or naked, which he explains as Bauddhadayah. How could he explain that word that way if there were no Buddhists in his country ?

These facts will lead to one conclusion that traces of Buddhism were to be found so late as Chaitanya's time. In speaking of Buddhism I do not take into consideration the fact of the Buddha's being regraded as the ninth incarnation of Visnu, for in that case all Hindus would be in one sense, Buddhists. No trace of Buddhism has been found after Chaitanya's time.

It seems, however, surprising that a religion which existed in Eastern India in such splendour from 600 B.C. to 1200 A.D., should be so utterly destroyed that no vestige of its existence could be found any where in Bengal at this day only 700 years after its final overthrow. But fortunately it is not so. A sort of corrupt Buddhism mixed up with a-variety of Aryan and non-Aryan forms of worship, still obtains in Bengal amongs a very large number of lower class people. Of the various castes inhabiting Bengal, Doms never acknowledge the superiority of Brahmans. They get all the religious

ceremonies of the caste, performed by pandits of the Dom tribe, and these Doms are the constituted Purohitas of Dharma, a deity whom I ventured to identify with Buddha-deva. One of the names of Buddha is Dharma-raja, and this is precisely the name by which the deity Dharma is spoken of by his worshippers. The ancient Bengali literature consists of works describing the way in which different deities manifested themselves in this world and the way their worship become prevalent. I have elsewhere given an account of the prevalence of the worship of Manasa, or Goddess of serpents. There are works also describing how the deity Dharma-raja manifested himself, and how his worship became prevalent.

According to Ghana-rama who wrote in 1710 his magnificent work the *Sri-dharma-mangala,* on this subject, his work is based on two previous works, one by Rupa-rama and another by Mayura-bhatta. All these again are said to be based on the Hakanda-purana. My enquiries have led to the fact that works of Rupa-rama and Mayura-bhatta are still extant, but I have not yet succeeded in getting copies of these works.

The story as given by Ghana-rama, is this. The son of the great King of Gauda, Dharmapala, had appointed his brother-in-law Maha-mada, as his minister. Maha-mada had another sister named Ranja, for whom he had a dislike, but she was a special favourite of Dharma-raja. Maha-mada tries in various ways to destroy his sister's son, Lau-Sen, but Dharma always protects him. Lau-Sen, is persecuted in various ways, but all these persecutions fail. Lau-Sen is then sent to lead arduous expeditions against distant counrties, such as Kama-rupa and Orissa. In all of these Dharma makes him successful. Maha-mada at last comes to his senses and takes his nephew into favour. Kalu Dom, Lau-Sen's favourite general, becomes the constituted Purohita of Dharma and obtains the privilege of being allowed to drink wine and eat hog's flesh. Dharma is described as superior to Brahma, Bisnu and Mahesvara, and has having Hanumat as his great general. Ghana-rama's work is a lengthy one, it repays perusal both as a work of poetic art and as embodying curious information about ancient Bengal.

The great Buddhist monarch Dharma-pala, is very well known. He was the first great monarch of the Pala dynasty, who were Buddhist. It is also known that he conquered Gauda and led

expeditions to Kama-rupa, where also a branch of this dynasty ruled for a long time. It is probable that Buddhism mixed up with some aboriginal form of worship, gave rise to a new form of worship, namely, that of Dharma during the ascendency of the Pala dynasty in Bengal, and that it being suited to the genius of the people, obtained a currency which still lasts. That Buddhism has a wonderful aptitude in assimilating various forms of Demon and other worships, is well known from the history of Buddhism in Nepal and Tibet. The Dharma worship appears to be a similar assimilation of some old world superstition with Buddhism.

My recent investigations into the mode of Dharma worship, during the Durga Puja holidays in the subdivision of Kutwa, has added another link to the arguments for proving the identitifation of Dharma-raja with the Buddha. There is a Dharma temple at Suongachi near Patuli, the priest of which belongs to the Mayara caste. He was questioned about the method of worship, and his anwers let to important results. He said cooked food is never offered to Dharma; this is precisely the case with Buddhist and Jaina idols. They are regarded as emancipated men and not deties. Any cooked food when eaten by men becomes impure, and so no cooked food is offered to them. Any caste may worship Dharma. The Doms do worship him and often offer hog's flesh to him, but the Mantra by which Dharma is meditated upon, is very curious. It leaves no doubt that he is the Buddha.

যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণং নাস্তি কায়নিদানম্
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্মভূ যস্য [চ] (হ্য অস্য ?)।
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনহিতং সর্বলোকৈকনাথম্
তত্ত্বং তং চ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতু বঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ ॥

He who has no end, no beginning and no middle ; he who has neither hands nor legs, he who has no germ of body ; he who has no form, no primordial form ; he who has no birth ; that Yogindra, approachable by knowledge, friendly to all men, one protector of all creatures, the truth, the spotless, the giver of boons to mortal men; whose form is Sunya or void; may he protect you!

The word Yogindra applies to the Buddha, as he is called Munindra in the *Amarkosa*. He is approachable by knowledge, while Hindu deities are approachable by devotion.

Most of this adjectives may, though by some stretch of imagination, apply to Siva or Visnu. But there is one which can never be applied to a Hindu deity and which is a peculiar attribute of the Buddha. This is Sunya murti, identifying him with void ; this is what the Prajna Paramita teaches, and is what constitutes the peculiarity of Buddhist teaching that everything resolves itself into Sunya or void. The Sanskrit of the Mantra as obtained from the Mayara priest, is perfectly ungrammatical, and so I tried to get another version of it from a different part of the country, and if possible from a higher class man. This I succeeded in getting from a small village near the Rajbandh station in Bankura.

Though this version is nearer to grammatical Sanskrit, yet it contains one serious grammatical blunder, and though the form in which it is put, looks like the Dhyana or Mantra for meditating on a Hindu deity by saying চিন্তয়েন শূন্যমূর্ত্তি, I fail to understand how the mind can be fixed on a void without beginning and without end, without legs, without arms, without head, and so on. This is in fact an attempt to give to a high Buddhist spiritual conception, a Hindu personified form, and the attempt is a miserable failure. The Mantra too, appears to have been written by an ignorant man in some form of ancient Prakrit, which many have tried to put in a sanskritised form.

Many would not like to believe that this low worship, accompanied with the sacrifice of pigs, and with Dhyana and other Hindu forms of worship, can have anything to do with Buddhism, whose first vow was to refrain from killing animals, and which in its earliest forms at least, did away with worship altogether. But that it is so, will appear from translation from the history of Buddhism, by Lama Taranatha of Tibet, kindly made for me by Babu Sarat Chandra Das, C.I.E. and appended to this article.

I beg to draw attention to one passage of this translation. "He (the Domacarya) preached the Tantrik doctrine of Buddhism, called Dharma, to the people of Tippera, and obtained numerous followers. Many among them became Siddhas too. He was then invited to the country of Radha, called Rara in the common language of the people. The Raja of that country was a bigoted follower of Brahmans, but seeing the supernatural powers of Domacarya, and his goodness and learning, he became changed in his views, and

henceforth the 'Dharma' Buddhism, in its Tantrik phase became greatly honored and followed by the people of Bengal, Radha and Tippara. By the worship of Dharma, is meant, that of the Buddhist deities, such as Vajra-yogini ; Vajra-varahi ; Vajra-bhairava (ksetra-pala) ; Vajra-dakini; the Natha, and so on. In fact, in the latter days of Buddhism, the Dik-palas, Dharma-palas and other spirit protectors of Buddhism became the object of worship to the exclusion of the Buddhas and Bodhisattvas."

That Vajra-Yogini, Vajra-bhairavas, and other Buddhist Tantrik deities used to be worshipped in Bengal, there is no doubt. Many of them are still worshipped in a Hinduized form. But Ksetra-pala is still worshipped under his proper name in a non-brahmanic form by low caste priests. Ksetra-pala is represented by some tree. The earth on which it grows has the miraculous power of removing barrenness, and producing male children in one who gives birth to daughters only. There is a Ksetra-pala tree at Khad-daha, eight miles from Calcutta, and another at Singi, in Burdwan.

From very ancient times Buddhist monks used to dispense medicines; that was one of the sources of their influence, nay, of their income. The Dharma priests to this day do dispense medicine. They generally pretend to have received certain specifics for certain diseases from their deity, and if the patient with a devout mind uses the medicine and pays the votive offering after cure, he is sure to get rid of the disease. The Suongachi Dharma has a specific for diarrhœa. The Jamalpur Dharma cures not only disease but grants whatever is desired of him. The Acalesvara Dharma has a specific for bilious eruptions, and so on.

1. Rep. Arch. Sur., Ind., Vol. xviii, pp. 62-63
2. The same, Vol. I, pp. 126-30
3. The same, Vol. xi, p. 185
4. The same, Vol. iii, pp. 80-81
5. Gaure Brahman, pp. 102-05
6. *Travels in the Western* World, translated from Chinese by Beal, Vol. II
7. Gaure Brahnam, p. 281, line xii.
8. See the article Kulina in the *Visva Kosa*
9. See *Catalogue of Buddhist Sanskrit Mss.* in the University Library, Cambridge, Preface, p. 4 and Book, pp. 69-70
10. See pp. 70-71 of *The Sharqi Architecture of Jaunpur,* Vol. I
11. *Rep. Arch. Surv.*, III, pp. 104-05

INTRODUCTION TO NAGENDRANATH VASU'S MODERN BUDDHISM AND ITS FOLLOWERS IN ORISSA

INTRODUCTION

'Sankaracharya drove away Buddhism from the soil of India'. This was the verdict of historians, sixty years ago. Buddhism –the religion of over forty per cent of the entire population of the world, professed in all countries, in the north, east and south of Asia,—was swept away from its birth place by the exertions of one single individual!

These historians, however, plainly contradicted themselves, for when they said that, 'Sankaracharya drove away Buddhism from the soil of India,' they also said that the Palas, who reigned in India in the 9th and 10th centuries were Buddhists. This is a pure contradiction for no body ever imagined that Sankaracharya flourished after the fall of the Pala Dynasty.

The sixties and the seventies were periods of the greatest activity for Archæological researches under Sir Alexander Cunningham. His researches, his excavations, and his discoveries all over Northern India, showed in unmistakable terms that Buddhism lingered in many parts of Northern India for hundred years after the Muhammadan conquest.

From the early eighties commenced the minute and scholarly investigations in all matters that related to India, both in Europe and in this country: The credit of initiating this accurate and sympathetic movement belongs to Hofrath Buhler. He and his numerous followers investigated very carefully all the available sources of information about India and then pronounced their opinions. The late lamented Prof. Bendal examined the wonderful collection of Palm-leaf Mss. in the University of Cambridge and found that many of them belonged to the Pala period. Babu Sarat Chandra Das travelled in Tibet and showed from Tibetan sources that a large number of Pandits, especially, from Eastern India, went

to Tibet in the Pala period.

Amongst other facts that were brought to light, the chief were that ;—a Buddhist temple was erected at Sravasti in the year 1276 A.D.; Buddhist priests from Tamluk went to the Pagan and reformed the Buddhist church there; the Budh-Gaya temple was repaired by the King of Burma in 1331 A.D.; Buddhist books were studied in Bengal even by Brahmins in the earlier years of the 15th century; Buddhist books were copied for Buddhist priests and laity during the middle of that century ; about the end of the century a Bengali Brahmin of the Katyayana Gotra who was expelled from his country for his Buddhistic tendencies, was made Bauddhagama Chakravarti in Ceylon and a biographer of Chaitanya said that at the birth of the infant God, Buddhists rejoiced greatly.

So traces of Buddhism in Eastern India were discernible up to the time of Chaitanya *i.e.*, the early part of the sixteenth century.

About the end of the sixteenth century Lama Taranatha, sent emissaries to India, to examine the state of Buddhism in that country. These reported that Buddhism was still to be found in Orissa and Western Bengal. But where is all that Buddhism gone?

The Muhammadan historians never speak of Buddhism ; the historians of Mughal period do not even know its name. The historians of the British power in India, refers but scarcely to Buddhism. Where is all that Buddhism gone?

Yuan Chuang tells us that there were ten thousand Sangharamas with hundred thousand Bhiksus in Bengal. To support this vast mendicant population at least ten millions of lay families were required, and they would be all Buddhists. The Chinese pilgrim further says that there were also heretics in the country, by which term he means the Brahminists and the Jainists. The number of Brahminists in Bengal was very limited. The Jains never made Bengal their stronghold. More than three-fourths of the population of Bengal were Buddhists.

Full one hundred years after Yuan Chuang, the original five progenitors of the present Radhiya and Varendra Brahmans in Bengal came from Kanoj. Their religion was not a proselytising one. In the middle of the twelfth century Ballala Sena took a census of the descendants of these five Brahmins and he found

only eight hundred families in all. They lived mostly on grants of lands made to them by the Rajas or by fees for services rendered to the State. Servants and maid-servants were supplied to them by the State. They practised their own religions rites with pomp and grandeur befitting their position as well-to-do men. But they rarely interfered with other people's religion. History tells us of defections from their ranks but of no additions to their strength. The masses were almost entirely left in the hands of the Buddhist priests, both married and unmarried, and there is reason to suppose that the married priests predominated in number. But the monastic orders were rich and powerful. They were very learned and their schools and colleges were celebrated all over the Buddhist world. The Monastaries of Nalanda, Vikramacila, Jagaddala and other places were the best seminaries for the diffusion of Buddhist learning and Buddhist religion. It was from these monastaries that Tibet, Burma, Ceylon and Mangolia received their Buddhist preachers and Buddhist authors and translators.

But there were the married priests who officiated in the religious ceremonies of their lay brethern ; these composed the litergy, worshipped Bodhisattvas and Gods, and officiated in marriages and funerals. They gradually introduced mantras or set formulæ for every religious ceremony and called this cult, Mantrayana.

The word Mantrayana requires and explanation. People are familiar with the terms Hinayana, and Mahayana, but not with Mantrayana. Hinayana, though a proselytising religion, concerned itself only with moral training and moral regulations, and thought only of individual salvation, while Mahayana embodying the highest and noblest truths of philosophy and religion, extended salvation to all classes of men and like the Theosophists of the present day, comprehended within its fold men of all shades or opinion and faith. But is it possible for ordinary people to comprehend the noble truths of philosophy which required close study for years? Certainly not. What sort of Mahayanists were the ordinary people then? These implicity believed in the superior talents of their masters, followed the course of conduct chalked out for them by them, repeated the vows and hymns which appeared most sacred to them, and studied the short works called *Dhāranis* invoking the spirit of Buddhas and Bodhisattvas and of the truths formulated

in standard philosophical and religious works. There are more than six hundred Dharanis extant. The higher and more ancient class of these gives the pith of the noble works produced by the masters. But the lower and more modern class of these invokes the protecting Bodhisattvas and guardian deities for the attainment of worldly objects.

Gradually the language of these Dharanis became antiquated, and difficult of comprehension, so Mantras were substituted for them. They were something like algebraical expressions of the Dharanis. How the Mantras were formed from the letters of Indian alphabets is a curious study by itself. It would be out of place to speak of them here. The Mantras were given to the ignorant laity. The repetition of the Mantras was considered equally efficacious with the study of the deeper problems of life. This is Mantrayana. Yuan Chuang saw little of it in India in the 7th century. It flourished in the subsequent times. Then it was superseded by another and more attractive form of religion, half mystic, half philosophical and more sensual, than the previous forms of Buddhism. This is called Vajrayana.

How Vajrayana arose from Mahayana is clearly indicated in the works of Vajrayana literature. The human soul bent upon the attainment of the highest knowledge progresses from the lower regions of earth to the higher, till all flesh disappears and it rises above the world of *Kãma* to the world of *Rũpa* or form. The mind bent upon Bodhi passes on through a variety of forms till it reaches the highest of the *Rũpa* heavens, still Bodhi is not attained. It goes higher and higher to the region where form does not exist. This is called the Arũpaloka or the formless world. In its progress higher and higher in this formless world it rises to the top and vanishes in the infinite void. That is the idea of Nirvana of the Mahayanists, but the Vajrayanists at this stage mystically conceives the existences of Niratma Devi at the top of the formless (Arũpa) heaven. She seems to all intents and purposes a metaphor for the infinite void. From the top of the formless world the mind bent on Bodhi leapes into the embrace of Niratma Devi and enjoys something like the pleasures of the senses, and disappears in her, as salt disappears in water. Thus Vajrayana is a curious mixture of mysticism, philosophy and sensuality. The sensual part of this

doctrine made it exceedingly attractive and soon superseded the dry Mantrayana and the difficult Mahayana.

In a work entitled Adikarmarachana by Tatakara Gupta, embodying the doctrines of Subhakara Gupta, a distinguished professor of the Vikramashila monastery we find a complete account of the daily duties of a Buddhist of the Mantrayana school. In that book we are told that Mahayana has already become one of the Siksapadas or vows or sacraments. It is no longer the school of philosophy studied with care for years but a set of religious ceremonies by which in a moment all the benefits of that patient study are supposed to be attained. Mantrayana too has become a sacrament. This book was written in the ninth century A.D. or earlier. In modern times the Nepal Vajrayanists (none of whom lead a monastic celebrate life), considered Vajrayana to be the last sacrament after which they can seek female company for the practice of religion. They do not call it marriage exactly, but something like taking a *Shakti*. From the sketch given above, it will be seen how in India the great religion of Buddha rose to the soaring height of metaphysical speculations and how the necessity of keeping within its fold a vast number of ignorant lay people made it climb down to the Dharanis, to the Mantrayana, and to the Vajrayana. The spread of the religion to people of even lower strata brought in the Kalachakrayana. Dr. Waddel considers Kalachakrayana to be prior to Vajrayana, but this is opposed to all Indian tradition. The Nepal Buddhism, as apart from Lamaism, is still Vajrayana in the main, having only a small sprinkling of Kalachakrayana. But what is Kalachakrayana? The word Kala means time, death and destruction. Kalachakra is the wheel of destruction, and Kalachakrayana means the vehicle for protection against the wheel of destruction. Waddel describes this as demonology, or devilworship, and so it is. Even Buddha is a demon, and in the Asiatic Society's library there is a book entitled Buddha-Charita which describes Buddha as demon. Though the book was written in Ferok Shere's time at Benares, it certainly embodies much older tradition. Bibhuti Chandra of Jagaddala Vihara who was a great master of Kalachakrayana, flourished in the 13th century. Unless Buddha was mentioned in Kalachakrayana, one would be inclined not to call it Buddhism at all.

Thus we have briefly indicated how Buddhism degenerated, from its great philosophical and speculative height, even to demonology. But there were other forms of religions which the Buddhist community gradually absorbed within itself. One of these is the Nathamarga or Nathism. The leaders of this sect were Nathas who practised a form of Yoga much inferior to that taught by Buddha or by Patañjali, both of whom considered the concentration of the mind to one definite point as the chief process to attain salvation ; but the Nathas tried to restrict the internal air and to lead it from what they called Muladhara below the abdomen to the forehead, and attain success (Siddhi) in the world rather than salvation. Many Nathas are mentioned. They are also called Yogis. They came from outside Buddhism ; one of the principal Nathas is Matsyendranatha or Matsyaghnapada. A book attributed to him has been found written in the 10th century character. It is not a Buddhist book, yet Machchhendranatha is worshipped as an incarnation of Avalokiteshvara at Patan; the Buddhists of Nepal all attend the festival held in his honour. A Machhaghna or fisherman cannot be a Buddhist because he is a habitual animal-killer and Tatakara expressly excluded Kaivarttas from the pale of Buddhism. Thus the Nathism of Matsyendra arose outside Buddhism, but was at last absorbed into it. On the other hand Ramana-Vajra was a Buddhist of the Vajrayana school, but when he became a Natha, he became Goraksanatha, and was regarded as a heretic by Buddhists, so Goraksa's Nathism was originally within Buddhism, but it was not incorporated into it. It is said that of the seven Nathas, Goraksa was the only heretic.

In the 9th century sprang the sect of Sahajiyas who made salvation easy by reaching it through carnal enjoyments. How the sect arose is lost in obscurity, but it had so many features common with Vajrayana, that it soon became absorbed in that system. The Sahajiyas found the great world *i.e.*, the universe within the human body.

A great Sahajiya exponent in Buddhism was Krsnacharya or Kanhu who wrote both in Sanskrit and in Bengali. He is still worshipped in Tibet as a great wizard with a bald head and a flowing beard. Another exponent of the Sahajiya sect of the Buddhist school was Lui, who is mentioned in Nagendra Babu's

"Modern Buddhism." His Bengali songs have been recently discovered, and goats are sacrificed to him in the Radha country at the worship of Dharma on the fullmoon day of Vaicakha. There are many other Sahajiyas who are worshipped in Tibet.

The Sahajiyas had three different ways of salvation, the Avadhuti-marga, the Candalimarga, and the Dombimarga. In the Avadhuti-marga, the idea of duality is predominent. Avadhuti, though she lives apart, still mixes with people and therefore represents duality. The Chandali lives apart but she has a community to mix with. She is therefore not so strong a representative of duality as Avadhuti, but she is not yet absolutely one. But Dombi lives far away from the inhabited locality and has no society. Therefore to a Sahajiya to go to the Dombi means to be absolutely undual.

TANTRA :—The word Tantra is very loosely used. Ordinary people understand by it any system other than the Vedas. But it really means the worship of Shakti or Female energy. The female energy is worshipped in conjunction with male energy. The union of male and female energy is the essence of Tantra.

Tantra came from outside India. Most likely it came with Magi priests of the Scythians. In the old Samhitas such as Nicvasatattva Samhita, a wonder is expressed at the novel mode of initiation enjoined by the Tantras. Vedic initiation was known, but people wondered how could there be a new initiation other than Vedic. It came from outside India and spread on the outskirts of the Aryan world. The five original places of Tantra in India are Jalandhara, Puna, Shriparvata, Odiana and Kamakhya.

The Shakti-Sangama Tantra, a later work, declares that the object of that Tantra is to root out Buddhism and establish Brahminism, while Buddhist Tantras equally denounce Brahminism. The theory was current twenty years ago that the Brahmins derived their Tantras from the Buddhists, but of late it has been ascertained that neither did the Buddhists derive their form of Tantra from the Brahmins nor the Brahmins from the Buddhists. Both received their Tantras from the same source. But it spread more rapidly among the Buddhists than among the Brahminists. A popular religion like that propounded in the Tantras cannot but be attractive to the masses in Bengal and in Eastern India, where

Buddhism prevailed. The Buddhist priests, especially the married classes, were not slow in taking advantage of this new form. The Tantras did not at first spread much among the Brahmins and their followers. It became in fact a recognised initiation only in the sixteenth century, and even then it was regarded as a subsidiary initiation designed more for the women and the Shudras who had no claim to the Vedic initiation. Practically the prevalence of the Tantric rites among the Brahminists was conterminous with the total disappearance of Buddhism. Even in the very best of the Hindu Tantras we find the worship of many Bodhisattvas and gods and goddesses of the Buddhists. Manjushri of the Buddhists is worshipped as Manjughosa. Aksobhya of the Buddhists is regarded either as a form of Siva or a Rhisi to whom the Tara-mantra was revealed. Ekajata and Nila-sarasvati was bodily taken from Buddhism. The Bhuta-damara Tantra mentions the Bodhisattvas as objects of worship. One of the Hindu Tantras says that Vasistha was anxious to attain success or Siddhi in the Tara-mantra, but failed to do so in India. He had to travel all over the snowy mountains to China, where Buddha taught him how he could be an expert in that mantra. The Tantras, many of them at least, discard all the acharas prescribed by Brahmins and enjoin the acharas of the Chinese. Even now the Tantric deities prefer to be worshipped by the lower castes than Brahmins. In many localities Durga is worshipped first by the untouchable classes and then by Brahmins. Brahmins have to wait in some villages till the Puja has commenced at some Hadi's house in the neighbourhood. The Jayadratha-yamala says that the Devi likes to be worshipped by the oil-pressees, the Tailakaras. Three men in the sixteenth century and one man in the seventeenth made Tantras popular with the Brahmins. These are Tripurananda, Brahmananda, Purnananda and Krishnananda. The first three belong to Eastern Bengal and the last to Nadia. The Sarvavidya family of Jessore too did much to popularise them in Central Bengal but at a later period than the others.

From all that has been said above it is apparent that in the twelfth century there were the following forms of religion in Bengal and in Eastern India.

(1) Brahminism. It was followed by 800 families of Radhiya

and Varendra Brahmins and about a hundred families of other Brahmins, the descendants of many Kayasthas who came from the west and those of the lower classes who served these families.

(2) Hinayana. This was followed on the west of the Ganges and especially in Tamluk.

(3) Mahayana. It was a religion of the higher-class Buddhist monks and higher-class Buddhist laity.

(4) Vajrayana. This was the religion of the middle-class man and the married Buddhist clergy.

(5) Nathism, which was professed by the Yogis who had numerous followers amongst the Buddhists and a few among the Brahminists.

(6) The Sahajiya cult. It had numerous followers below the middle-class Buddhists and some among the lower-class Brahminists.

(7) Tantrism. It had its followers among all classes, but among the higher-classes it was a subsidiary form of worship, among the lower it was the chief form.

(8) The Kalachakrayana. It was purely Buddhist and more a religion of fear than of love or faith and was followed by the lowest classes.

In the closing years of the 12th century, India was overrun by the Muhammadans. They destroyed the Buddhist monasteries of note, appropriated the monastic lands for the use of soldiers and massacred monks by thousands, and burnt libraries wherever found. Mahayana was practically stamped out from Bengal. It lingered however in nooks and corners for two centuries more and was then lost altogether. Brahmins who lived on the lands granted to them by the Palas, the Senas, and other kings lost their lands by the Muhammadan invasion; and they also lost the chief source of their income from Government service. They were compelled from this time to extend the sphere of their activity as priests and teachers.

The Muhammadans called the Indians, Brahminists and Buddhists alike, Hindus or Indians. The Brahmins were not slow to take advantage of this and to make it appear that the Buddhists did not exist. All the intellectual followers of Buddhism were either massacred or compelled to fly away from the country. The Brahmins found themselves masters of the situation in the Indian

or the Hindu community. Muhammadans either by force or by persuation converted a large number of the Buddhists into Islam. The vast number of Buddhist were like so many lambs without a shephard. The Vajrayanists, the Sahajiyas, the Nathists and the Kalachakrayanists for a time maintained a separate existence, but many of their followers were either converted to Islam or forced to join the Brahmins. But the exclusive spirit of the Brahmins made the admission of only such people into their fold possible as would consent to be their out and out followers. They took these within the pale of their society and called them Navasakha or the new branch. Those who tried to maintain a separate existence were excluded from the pale of their society and these formed the Anacharaniya Jati or the depressed classes.

It has been already stated that the Kaivarttas were expressly excluded from the pale of Buddhism except those that renounced their profession of the slaughter of animals. But the Kaivarttas were a powerful race. The Ancients called them Dasyus *i.e.*, powerful foreigners who troubled by their raids the inhabitants of the Aryan lands. In the eleventh century the Kaivarttas formed a powerful confederacy in the North Bengal under the leadership of Bhima, expelled the Palas from their capital Gauda, where they occupied a suburb and temporarily became rulers of Bengal. The Palas considered the rising of the Kaivarttas as a revolt. After a long struggle they suppressed the revolt with a strong hand, yet the Kaivarttas were a power to be counted with. With their aid Ballala conquered Northern Bengal, and tried his best to make a clean caste of them, and divided them by sending the more turbulent ones to defend the Southern frontier Dakshinaghata. Their leader was Mahesha whom he made a Mandalevara from which fact the Dakshinaghata is still known as the Mandalaghata.

Those of the Kaivarttas who lived by fishing were not Buddhists, but those who took to the profession of agriculture and to the profession of arms were Buddhists and became to a great extent civilised and educated. They patronised men of letters equally with the Palas. A medical work composed under the patronage of Bhima is still extent. Their priests, the descendants of the Buddhist married clergy, still form a community by itself. At the present moment they call themselves Brahmins, because

none but the Brahmins are recognised in the Hindu society as priests. The Kaivarttas forgetful of their past and forgetful of their old tradition are now attempting to call themselves Mahisyas and thereby raise themselves to the position of Vaisyas, though degraded in status. One who knows the past history of India cannot forbear a smile at this.

What is true of the Kaivarttas is true of other degraded classes. The Yogis are now trying to take the holy thread and become Brahmins. They do not know what they were. They were real Yogis, being descendants of the Nathas, that influencial class to which belonged Matsyendrãnatha, Goraksanatha, Minanatha, Ayinatha, Chauranginatha and others. Their ancesters had numerous followers. Princes and potentates bowed before them. Many Nathas are still worshipped in temples and holy places in Nepal and in Tibet. Goraksanatha is still worshipped as the principal deity by the Gorkha as a race. His temple at the Gorkha hill is still the resort of thousands of pilgrims. His temple opposite to that of Pashupatinatha is kept clean with scrupulous care. He has many temples in the plains of India. The Nathas do not seem to have observed any distinction among the several classes when taking in followers. It appears that their faith was accepted as a subsidiary faith, subsidiary more to the Buddhists, than to the Brahminists.

The Dharmagharia Yogis are to be found in large numbers in South-Western Bengal. The so-called Brahmins who beg with the image of Shitala in their hands and come from Howrah and Midnapore districts are all Dharmagharia Yogis. They do not put on the holy thread, but they use copper in some form or other on their person after their initiation to religious life. They worship Dharma at Dharma temples. From the locality they come, they seem most likely to be the survivals of the Hinayanist monks of the Tamralipta country. One of their community with his followers went to the Pagan in the thirteenth century and reformed Buddhism there (see Kalyani inscriptions). These are Buddhists to all intents and purposes. Dharma is more widely worshipped in this part of Bengal than in others. Many of these Dharma temples are maintained by lands which were granted to them many centuries ago.

Guptas—Tatakara, Subhakara, and Prabhakara have already

been mentioned. They composed works on the Buddhist rituals of the Mantrayana school, and so they must have been learned Buddhists in the 9th century. Sadhu Gupta was a Sthavira of some note at Nalanda. He got a copy of Astasahasrika made at his expense and presented it to a Buddhist monastery at Batagrama. There is evidence to show that many Guptas were Buddhists. Dipankara, the writer of Ashvavaidyaka, was a Buddhist and belonged to a wellknown Buddhist family. The Karas are not much respected among the present Vaidya class. The men of this caste studied Sanskrit in those of its branches which are enumerated in the commentary of Ramachandra Kavi Bharati's Bhaktishataka. They belonged originally to Bengal and Eastern India. They seemed to be the survival of the lay, learned and married Buddhist priests or Aryas. They never cared for the holy thread. Their claims to the Vaishyablood dates from the middle of the 18th century and at the present moment they are advancing claims to the Brahminic rank. This may be justified in the sense that some of them were priests and still there is a large number of the Vamachari Tantriks among them. Some of them became followers of Chaitanya and have adopted the calling of Gosvamins or religious preceptors. The Vaidya community may not perhaps like the idea that they were at one time Buddhists. But they cannot explain their origin. They say they are a mixed caste formed by the cross-breeding of Brahmins and Vaisyas. But their genealogies tell a different tale. They are descended from the fifty-one Vijapurusas who cannot be placed before the eleventh century. Their title Kaviraja shows that they knew Sanskrit, and they were superior Kavis by which term medical men in Bengal used to be designated.

How Buddhism fared under Brahminic sway is best evidenced by a study of the Buddhist community in Nepal. To the Brahmin the Buddhists are Anacharaniya. The King acting under the advice of the Brahmins may make some particular families or classes clean castes, but the bulk of them are outside the pale of Brahminic society. The descendants of the married clergy who still occupied Viharas meant for monks and who cannot find sufficient work as priests, take to such arts and callings as would bring respectable wages without hard manual labour. Thus in Nepal, Goldsmiths, Carpenters and Painters all belong to the descendants of the

married clergy. By an analogy of Nepal one can easily detect why Chhutars and Sekras have become Anacharaniya in Bengal. Formerly these two castes formed a part of the Buddhist community in Bengal and so the Brahmins have excluded them from the community. It is a curious feature in the Brahminic community that however unfavourable they may be to the Anacharaniya castes they are still more unfavourable to their priests now miscalled Brahmins. In Nepal too the Buddhist priests are subject to a greater share of the Brahmin's ire than their lay followers.

The merchant community in Nepal noted for their personal beauty, all belong to Buddhism and are for this reason excluded from the Brahminic society. For the same reason the merchant community in Bengal who stood by their Buddhist priests have been excluded and made Anacharaniya, while those who changed their priests have been taken within the Brahminic fold and made clean castes. But a study of the clean and unclean merchant community will show that both were originally Buddhists.

The Kayasthas, if we exclude the descendants of those who are recognised as Kulinas among the Daksina Radhiya and Vangaja communities, and who were Brahminic in their tendencies were mostly Buddhists. These are all Maulikas, *i.e.*, they originally belonged to this country, a Buddhist country. In Dharmapala's time there was a Vriddha Kayastha who wrote Buddhist books and so late as 1436 A.D. the Kayastha zamindars of Benugrama in Sohinchari pargana were Buddhist. They had Buddhist Bhiksus with them and they studied Buddhist books.

But below the Anacharaniya there are several castes still in Bengal, who do not even pretend to have the so-called Brahmin priests. They raise one of their caste-men to the priesthood and give him the title of Pandit. We read in the Vratamalavadana of the Buddhist that there were three classes of priests, Panditas, Shramanas and Brahmanas. The position of the Panditas who are placed first in *the compound* is more honourable than that of either Shramanas or Brahmanas. From the facts given above, which can be indefinitely multiplied, it would appear that in ancient Bengal before the Muhammadan conquest, the descendants of the five Brahmins and the five Kayasthas were the only Brahminists

They had either induced or compelled others to come into .their society. The rest of the community were Buddhists.

The case of the Sonar-Vanias is decidedly a good one. They were Buddhists. Their leader in Bengal in the 12th century was Vallabha Adhya who had two forts Sanghyakoti and Chandramayuta. He was enormously rich, being the richest banker in Bengal. He married his daughter to a kind of Magadha and the kings of Magadha were notoriously Buddhists. In the first part of his reign Ballala was a Buddhist. It is said that he kidnapped the daughter of a Chandala off on immoral purposes in oder to attain Siddhi or success in life. The worshippers of Tara, the Shakti of the Buddhists, think that long life may be attained by repeating hymns to that goddess after sitting on a Chandala woman. This shows that in the beginning of his reign Ballala though not a Buddhist directly had a strong tendency towards Tantric Buddhism; but later on Simhagiri a Shaiva ascetic from the Josi-Matha in Garhwal became his Guru and under his advice Ballala became a Shaiva and a patron of the Brahmins. As long as Ballala showed Buddhistic tendencies Vallabha lent him money which enabled him to conquer the five Bengals. But in his later life after becoming Shaiva Ballala wanted money for a war against Magadha, Vallabha refused to advance money. This led to a quarrel and Ballala drove the Banias away. They settled in the adjoining kingdoms of Tippera, Orissa, Behar and others. Those who remained in Bengal were degraded. Brahmins were prohibited from teaching them and officiating in their religious ceremonies. Thus the only chance for the Sonar-Banias to be admitted into the Brahminist society was lost. The Vaidika Brahmins from the South sympathised with the Banias and they incurred the displeasure of Ballala and were not admitted to Kulinism.

It is a wellknown fact that Buddhism does not make any distinction of caste in India. But in Nepal in the present day there is a sort of distinction between the priestly and the nonpriestly occupations, and the different occupation of the laity. The distinction however is not so pronounced as in the Brahminic society. In the remote days, when Bengal was a Buddhist country, a distinction was observed among the several classes of the Buddhists. The unmarried monks were regarded with the greatest

reverence, and the married clergy was regarded as the highest of castes. Next to them were the ruling and the merchant community. But there was a large class of labourers who belonged to the lowest occupations :—sweepers and others who enjoyed very little of the advantages of the social life. To these were denied the services of the barbars and sometimes of washermen. The necessities of the times sometimes made it imperative to ex-communicate persons, families and even clans of a locality. These swelled the ranks of the lowest community.

After the Muhammadan conquest Brahminic ideals were super-imposed on the Buddhist ideals of society. The distinctions among the classes became more and more prominent till they developed into a regular caste-system. People forgot their old history, the history of their own distinction and began to think with the Brahmins that all distinctions were due either to cross breeding or to ex-communication. Thus a social edifice was built up in Bengal with the Brahmins forming the top-most part. The existence of Buddhism was forgotten. Masses of the Anacharaniya classes are the survivals of the forgotten Buddhism. These classes are depressed only in the eyes of the Brahmins and those who have come under the Brahminic influence. The more one would study the social history of Bengal, the more will one be convinced that the classes are not really depressed. They continue to be what they were, only they have lost their consciousness of a great past, intellectually, morally and socially. It was people of these classes that carried Buddhist ideals to Tibet and China, held commercial relations with the countries of Eastern and Southern Asia, and were great in trade and in industry. We hear of long sea-voyages made even in the fifteenth century by the Bengal Banias, glowing descriptions of which are to be found in works of Manasar Bhasan written by various poets of Bengal. With the advance of research the so-called depressed classes will regain the lost consciousness of their former glory. It is therefore necessary that Brahmins should take steps to conciliate them, and take them into their confidence.

Before the Muhammadan conquest, Bengal was divided between the two communities of Brahminists, and Buddhists, and after that

the entire population was divided into the two great classes of Hindus and Muhammadans. The word Hindu literally means Indian, and is therefore capable of a very wide significance. The depressed classes are now as good Hindus as the Brahminists, though they have no common faith and common social organisation. If they are organised as a homogeneous community with common interests and common aspirations and receive the common appellation of Hindus, why should the *Mahomedans*, the domiciled Mahomedans, the *Christians*, and the domiciled Christians not be called Hindus as well, because they too have been living in India for many centuries and have the same interests and aspirations. If the depressed classes regain their consciousness and position in the Hindu society, the Hindu society will in near future include all the inhabitants of Bengal and thus the term will regain its radical and real significance.

Ask a Nepalese Buddhist how many religions are there in the world, and he will answer "there are two religions Gubhaju and Devabhaju" *i.e.*, the worship of the Gurus and the Devas. The Buddhists are Gubhaju for they worship their great Guru Buddha and the Brahmins are Devabhaju for they worship Devas. Buddhism and Hinduism have influenced each other greatly and now pure Gubhajus and Devabhajus are rare. When a Brahmin in the morning repeats his Vedic Sandhya, he is a Devabhaju, but when he performs his Tantric Sandhya or when he looks upon his Guru as the living embodiment of his God on earth he is a Gubhaju. The key-note of the distinction between Brahminism and Buddhism is the worship of God and the worship of Guru. But is there any one in Bengal who does not worship both. Even the unitarian Brahma is no exception when he prays to one God, he is a Devabhaju, but when he observes the birthday of Rammohan Raya and of Kesava Chandra he is a Gubhaju.

Now the distinction between the ancient Buddhists, and ancient Brahmins being this, it is possible to say what *amount of Buddhism and Brahminism* there is in the doctrine of any particular sect now flourishing in Bengal. As I have shown above all people are to some extent Devabhaju and to some extent Gubhaju. Intellectual

people seem to be more Devabhaju than Gubhaju, but the less intellectual people are more Gubhaju than Devabhaju. The followers of Chaitanya making a pilgrimage to Nadia on the fullmoon of Phalguna and keeping a complete record of the birth and death of the great preachers of their faith, are more Gubhajus than Devabhajus, they are more influenced by Buddhism than by Brahminism. The Karttabhajas to whom the Guru is the only Truth and everything else illusion are most prominently Gubhaju; that is, Buddhist. That they do not use the word Buddha need not deter us from calling them Buddhists ; for in later times Buddhists were not known as Buddhists but as the followers of Guru contracted into 'Gu'. Do we not call the Buddhism in Tibet Lamaism! But what does the word 'Lama' mean? It simply means Guru. So the worship of Guru means direct or indirect influence of Buddhism and here is a criterion of the utmost importance. For an analysis of the doctrines of the various religious sects inhabiting Bengal and Eastern India, and the consequent determination of the amount of Buddhism that have entered into them, the presence or absence of Buddha's name does not matter at all.

Under these circumstances the discovery of a new sect in Mayurabhanja pre-eminently of the Gubhaju tendency and using some of the terms current in Mahayana Buddhism by Babu Nagendranath Vasu is of the utmost importance to the social and religious history of the country. It shows how tenaciously the people still cling to their ancient faith though all memory of it seems to be lost. A trained eye can see through things, and Nagendra Babu seems to be eminently endowed with such a trained eye in matters relating to the social and religious history of this country.

For a long time, all thinking people of India wondered what became of Buddhism which had played so important a part in the history, life and literature of the country in olden times. Babu Aksaya Kumara Datta considered that the worship of Vithoba and Vitthala was a survival of Buddhism. These deities are worshipped in the Godavari districts as the 9th incarnation of Visnu. Jagannatha at Puri is still regarded as Buddha incarnate or Visnu incarnate

as Buddha.

It was, however, only about twenty years ago that researches in regard to the survival of Buddhism in Bengal began with some earnestness and I took some interest in the matter. These resulted in the discovery that the *puja* of Dharma Thakur, so common in Western Bengal, is a survival of Buddhism. The discovery was held with delight in certain quarters and with strong opposition in others. But the researches continued and it was found that many of the Tantric cults came to Brahminism through Buddhism and the whole of the Tantric Literature was greatly influenced by it. The study of Buddhism in Nepal under Hindu supremacy showed that the Anacharaniya classes, at least some of them, were the remnants of the Buddhist population. Sahajiyas in Bengal had always been regarded as a recent development of Vaisnavism, but the study of ancient manuscripts in Nepal showed that there were Sahajiyas also even in the Pala period, and that they were strongly imbued with later Buddhist ideas. The Vaisnava Sahajiyas are really a continuation of the old Buddhist Sahajiyas.

The Nathas too were to a great extent a survival of Buddhism. It was subsequently found that life in Bengal, even the most orthodox Brahminic life, showed traces of Buddhist influence and Buddhist ideals. Balarama Hadi who preached a new cult at Meherpur in Nadia at the beginning of the last century and died in 1857, and whose followers number by thousands in the adjoining districts, got his ideas from the still surviving Buddhism in the nooks and corners of Bengal. A few years ago, Mr. Gait placed in my hands some materials from which it was found that the Saraki Tantis who not only inhabit the Tributary Mahals of Cuttack, but are to be found in the settled districts of Cuttack and Puri, still worship Buddha along with the Brahminic Gods in all their religious ceremonies and that the word Saraki is simplly a Prakrit form of the word Shravaka. The Sarakis are to be found in Bankura and Burdwan too. Although they bear a Buddhistic name, they seem to have forgotten all their Buddhism. The Cuttack Tributary Mahals were supposed to contain many relics of later Buddhism. The State of Baud named after Buddha was supposed to contain

still a remnant of real Buddhist population. The researches of Babu Nagendra Nath Vasu in the jungles of Mayurabhanja have proved that these suppositions were not wrong. He has not only traced the existence of Buddhism from the time of the persecutions by Purusottama and his successor Prataparudra, but discovered a new reformed faith, preached only during the last quarter of the 19th century. His book is exceedingly interesting and opens a new vista of research.

26, PATALDANGA STREET,
Calcutta, May 17th, 1911. HARA PRASAD SHASTRI.

টীকা-টিপ্পনি

বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে?

রামপুরবুসায়র — বর্তমান হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত, পূর্বতন রামপুর।
সায়াম — থাইল্যান্ডের নামান্তর।
আনাম — ভিয়েৎনামের আর এক নাম।
মহিমপন্থ — উনিশ শতকে ওড়িশার কেওনঝর অঞ্চলে মহিমা গোঁসাই প্রবর্ত্তিত নিরাকারবাদী ধর্ম। অলেখ্‌পন্থ নামেও পরিচিত।
সাময়েদ — এশিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তাইগা ও তুন্দ্রা অঞ্চলের আদিতম অধিবাসী ও মঙ্গোল বংশের পূর্বপুরুষ।
জোসেফট — খ্রিষ্টধর্ম বিরোধী রাজা আবেন্‌নের-এর পুত্র। বারলায়ম তাঁকে জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞাত করিয়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেন। তাঁর প্রভাবে পিতাও এই ধর্মে দীক্ষিত হন। দুজনের জীবনের সঙ্গে বুদ্ধ জীবনের অনেক মিল আছে।
তবকতিনাশিরি — মৌলানা মিন্‌হাজুদ্দিন রচিত ইতিহাসগ্রন্থ।
আইন-ই-আকবরি — আকবরের প্রধানমন্ত্রী আবুল ফজল রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।
বিশপ বিগান্ডেট — The life and Legend of Gautama the Buddha of the Burmese গ্রন্থের লেখক।
বিমলপ্রভা — পুন্ডরীক বা জ্ঞানবজ্র রচিত 'লঘুকালচক্রতন্ত্ররাজটীকা' পুথির নামান্তর।
জরথুসা — জরথুস্ত্র-ইরানের প্রাচীন ধর্মগুরু।
কারন্ডব্যূহ — গদ্যে রচিত মহাযান সূত্র গ্রন্থাবলীর একটি গ্রন্থ।
প্রজ্ঞাপারমিতা — বৌদ্ধদর্শনের অন্যতম আদিগ্রন্থ।
শুভাকর গুপ্ত — বিক্রমশীল মহাবিহারের অভয়াকর গুপ্তের ছাত্র।
অশ্বঘোষ — কুষাণরাজ কণিষ্কের সভাকবি ও গুরু সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'বুদ্ধচরিত' অন্যতম।
কর্তাভজ — নদীয়ার ঘোষপাড়া খ্যাত আউলে চাঁদ প্রবর্তিত গুরুমুখী ধর্ম সম্প্রদায়।

নির্বাণ

শ্রীহর্ষ — 'নৈষধচরিত' মহাকাব্য-প্রণেতা। নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বর্তমান।

অরাড় কালাম — অন্য নাম অগু কালাম—এঁর কাছেই বৈশালী নগরে সিদ্ধার্থ প্রথম দীক্ষিত হন।

অর্হৎ — সাধারণ অর্থ যোগ্য। নির্বাণ লাভকারী বৌদ্ধ। প্রথম অর্হৎ গৌতম বুদ্ধ।

আর্যদেব — ৭-৮ শতকের লেখক আর্যদেব-এর বিখ্যাত বই 'চিত্তবিশুদ্ধি প্রকরণ'।

নির্বাণ কয় রকম

থেরাবাদী — স্থবিরবাদী—তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতিতে দ্বিধা-বিভক্ত বৌদ্ধ সংঘের রক্ষণশীল দল।

প্রত্যেক বুদ্ধ — শ্রাবকযান নামক পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিগত নির্বাণাকাঙ্ক্ষী বৌদ্ধ।

আর্যসত্য — দুঃখপূর্ণ জীবন, দুঃখের কারণ, কারণ নিবারিত হলে দুঃখ নিরোধ এবং দুঃখ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন—এই চার সত্য—যা বৌদ্ধধর্মের আসল ভিত্তি।

আট রকম নিয়ম — একে বলা হয় অষ্টাঙ্গিক মার্গ— ১. দুঃখবিষয়ে যথার্থ জ্ঞান ২. অহিংস ৩. মিথ্যাচার বর্জন ৪. হনন ও কামহীনতা ৫.অন্যায় জীবিকা পরিহার ৬. সৎ চিন্তা ৭. চিত্তের প্রশান্তি ৮. সম্যক সমাধি।

কোথা হইতে আসিল?

রামচন্দ্র কবিভারতী — গৌড় দেশে বারেন্দ্রভূমে বেরবতী গ্রামে জাত এই কবি ১২২০ খ্রিস্টাব্দে সিংহলে গেলে সিংহরাজ পরাক্রমবাহু তাঁকে 'বুদ্ধাগম চক্রবর্তী' উপাধি দেন। 'বুদ্ধশতক' বা 'ভক্তিশতক'-এর রচয়িতা।

চিরঞ্জীব শর্মা — এক শ্রোত্রিয় বংশে জ্যোতিষী কাশীনাথের জন্ম হয়। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে রাঘবেন্দ্র নানা শাস্ত্রে পন্ডিত ও স্মৃতিধর ছিলেন। তাঁর পুত্র বামদেবকে তাঁর জ্যেষ্ঠ-তাত আদর করে চিরঞ্জীব নামে ডাকতেন। সেই নামেই তিনি দর্শন, ন্যায়, কাব্য, নাটক, অলংকারের অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন।

রামানুজ —মাদ্রাজের পেরামবুদুরে জাত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠতম

ব্যাখ্যাতা। ব্রহ্মসূত্রের টীকা 'শ্রীভাষ্য', বেদান্তদীপ, বেদান্তসার, বেদান্তসংগ্রহ তাঁর অন্যতম রচনাবলী।

আর্যদেব — নাগার্জুনের ছোটভাই-এর মতো। ২-৩ শতকে বর্তমান আর্যদেবের অন্য অনেক নাম ছিল— বোধিসত্ত্বদেব, কাণদেব, নীলনেত্র, পিঙ্গলনেত্র। সিংহল থেকে ভারতে আসেন ও নাগার্জুনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গ্রন্থাবলী— শতশাস্ত্রবিপুলা, অক্ষরশতক, মহাপুরুষ শাস্ত্র প্রভৃতি। এছাড়া রচিত 'চতুঃশতিকা' সম্পূর্ণ পাওয়া গেলেও এর খন্ডিতাংশ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল থেকে উদ্ধার করে আনেন।

জেরোয়াস্টার — পূর্বোক্ত 'জরথুসা' টীকা দ্রষ্টব্য।

হর্ষচরিত — বাণভট্ট রচিত বিখ্যাত আখ্যায়িকাকাব্য (সপ্তম শতক)

শকাগমন — ভারতে শকাধিপত্য ৮০ খৃ. পূর্বাব্দে ঘটে।

অড়ার কালাম — পূর্বের টীকা দেখুন।

উদ্রক — বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় গুরু। উদ্দক বা রুদ্রক নামেও পরিচিত।

রঘুনন্দন — স্মার্ত পন্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য নবদ্বীপে ষোড়শ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব, তীর্থযাত্রাবিধি, দায়তত্ত্ব প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ ছাড়া জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ'-এর টীকা রচনা করে বিখ্যাত হন।

হেমাদ্রি — দক্ষিণ ভারতীয় এই পন্ডিত-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'চতুর্বর্গ-চিন্তামণি'।

আপস্তম্ব — 'আপস্তম্বীয় কল্পসূত্র'-এর লেখক।

মহাবীর — আনুমানিক ৫৯৯ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে জাত—আসল নাম বর্ধমান। অবিবাহিত দিগম্বর সম্প্রদায়ের এই ব্যক্তি ৩০ বছর বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে জৈনধর্মের প্রবর্তন করেন।

পার্শ্বনাথ — এই পার্শ্বনাথ ২৩ তম, কাশীর রাজপরিবারে জন্ম, মহাবীরের আড়াইশো বছর আগে। ত্রিশ বছর বয়সে টানা ৮৪ দিন তপস্যার পরে সিদ্ধিলাভান্তে প্রায় ৭০ বছর ধরে ধর্মাচার। মৃত্যু ধানবাদের অনতিদূরে পরেশনাথ পাহাড়ে।

২৪ জন তীর্থংকর — ১. ঋষভ/আদ্দিনাথ ২. অজিত ৩. সম্ভব ৪. অভিনন্দন

৫. সুমতি ৬. পদ্ম প্রভ/সুপ্রভ ৭. সুপার্শ্ব ৮. চন্দ্রপ্রভ/শশি ৯. সুবিধি/পুষ্পদন্ত ১০. শীতল ১১. শ্রেয়াংশ ১২. বাসুপূজা ১৩. বিমল ১৪. অনন্ত ১৫. ধর্ম ১৬. শান্তি ১৭. কুন্থু ১৮. অর ১৯. মল্লি ২০. মুনিসুব্রত ২১. নমি ২২. অরিষ্টনেমি/ নেমি ২৩. পার্শ্বনাথ ২৪. মহাবীর।

কনকমুনির খাম্বা — বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী রুম্মিনদেই-র ২৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে নিগলি সাগর জলাশয়ের তীরের এই স্তম্ভে এই লিপিটি উৎকীর্ণ আছে। দেবানংপিয়েন পিয়দসিন লাজিন চোদস-বসা ইত্যাদি। হিউয়েন সাং এর পাশে একটি স্তূপ দেখেছিলেন।

ছয় ধর্ম প্রচার — ছয় প্রচারকগণ—অজিত কেশকম্বলিন, সঞ্জয় বেলটপুত্ত, পকুধ কচ্চায়ন, পুরন কশশপ, মক্‌খলি গোসাল, নাতপুত্র। এঁরা সংশয়বাদী বৌদ্ধ ছিলেন।

হীনযান ও মহাযান

অনুত্তর সম্বোধি — সম্যক জ্ঞানকে সম্বোধি বলে। এর তিন স্তর— অনুত্তর-সম্যক সম্বোধি, প্রত্যেক বোধি এবং শ্রাবক বোধি। প্রথমটির অধিকারী অপরের মুক্তিলাভের জন্য সক্রিয় থাকেন।

ত্রিপিটক — সূত্ত, বিনয় ও অভিধম্ম পিটক।

ত্রিশরণ — বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি এবং সংঘং শরণং গচ্ছামি। তিনবার এই সংকল্প উচ্চারণ।

দশ বোধিসত্ত্ব ভূমি — যথাক্রমে— দুরারোহা, বর্ধমানা, পুষ্পমণ্ডিতা, রুচিরা, চিত্তবিস্তরা, রূপবতী, দুর্জয়া, জন্মনিদেশ, যৌবরাজ্য এবং অভিষেক।

সাতের দাগ — সাত মানুষী বুদ্ধি— বিপশ্যন্তী, শিখিমালিনী, বিশ্বধরা, ককুদ্বতী, কণ্ঠমালিনী, মহাধরা এবং যশোধরা।

ধ্যানী বুদ্ধ — এঁদের সংখ্যা পাঁচ ঃ বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি, অক্ষোভ্য।

মহাযান কোথা হইতে আসিল?

নাগার্জুন	—	খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকে বর্তমান মাধ্যমিক দর্শনের প্রবর্তক। তিনি নাকি তিনমাসে সমগ্র ত্রিপিটক আয়ত্ত করেছিলেন। বিখ্যাত গ্রন্থ—মাধ্যমিক কারিকা।
সুজুকি	—	পূর্ণনাম— Dáisetz Teitaro Suzuki, গ্রন্থনাম— Asvaghosa's discourse on the Awakening of Faith in the Mahayana (1900)
মহাসংগীতি	—	অশোকের রাজত্বকালে (খৃ.পূ. ২৭৩-৩২ অব্দ) অষ্টাদশ বর্ষে এই তৃতীয় বৌদ্ধসংগীতি নয় মাস ধরে অনুষ্ঠিত হয়।
জলন্ধর মহাসভা	—	কণিষ্কের আমলে ১৮ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের এই চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসংগীতি জলন্ধরে অনুষ্ঠিত হয়।
কাব্যাদর্শকার	—	আচার্য দণ্ডী (সপ্তম শতকের শেষ)।
সক্‌ডিয়ানা	—	পারস্যের অংশবিশেষ Sogdiana.

সহজযান

বিজ্ঞানবাদী	—	মহাযানের অন্যতম সম্প্রদায়। প্রবক্তা অসঙ্গ ও বসুবন্ধু। এর অন্য নাম যোগাচার— যা মাধ্যমিক দর্শনেরই পরিণতি।
সরহপাদ	—	এই নামে বেশ কয়েকজন বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধক ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কৃত চর্যাগীতির ২২, ৩২, ৩৮ ও ৩৯ সংখ্যক পদ জনৈক সরহপাদের রচনা।
ভাদে পদ	—	মূল নাম ভাণ্ডারিন্, ভদ্রচন্দ্র, ভদ্রদত্ত ইত্যাদি। ৩৫ সংখ্যক চর্যাটি এঁর রচনা।
শ্রীসমাজতন্ত্র	—	এর পূর্ণনাম শ্রীগুহ্য সমাজতন্ত্রম্—আদি বৌদ্ধতন্ত্র শাস্ত্র। সম্ভবত অসঙ্গ-রচিত।
যোগরত্নমালা	—	এটি হেবজ্রতন্ত্রের কৃষ্ণাচার্য পাদকৃত টীকা।
হেবজ্রতন্ত্র	—	বজ্রযানের এই অন্যতম মূল শাস্ত্রটি খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে রচিত।

দারিকপাদ	—	৩৪ সংখ্যক চর্যাগীতিটি এঁর রচনা।
সবরপাদ	—	নামান্তর শবরীপাদ বা শবরীশ্বর। চর্যার ২৮ ও ৫০ সংখ্যক পদ দুটি এঁর রচনা।
বীণাপাদ	—	চর্যার ১৭ সংখ্যক পদের রচয়িতা।
ভুসুকু	—	৮টি চর্যাগীতির রচয়িতা।
সন্ধ্যাভাষা	—	Intentional speech, গূঢ়ার্থ। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে 'আলো-আঁধারি ভাষা—কতক বুঝা যায় কতক বুঝা যায় না। যাঁহারা সাধন ভজন করেন, তাঁদের ভাষা।
দীপংকর শ্রীজ্ঞান	—	অতীশ দীপঙ্কর—১০-১১ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্বমনীষী। জন্ম ৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। বিক্রমশীলা মহাবিহারের মহাচার্য। 'বুদ্ধ-শিক্ষা' নামে এক সম্প্রদায়ের জনক।
রত্নাকর শান্তি	—	বিক্রমশীলায় বড় বড় ভিক্ষুদের অন্যতম, প্রধান নৈয়ায়িক, 'অন্তব্যাপ্তি সমর্থন' গ্রন্থের রচয়িতা।
লুইপাদ	—	বাংলা সাহিত্যের আদিকবি লুই চর্যার প্রথম ও ২৯ সংখ্যক পদের রচয়িতা।

বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন

প্রবোধচন্দ্রোদয়	—	কৃষ্ণামিশ্র রচিত রূপক নাটক।
ধারণী	—	৫০-১০০ অক্ষরে রচিত মন্ত্র বিশেষ। এর মধ্যে হৃদয়-ধারণী দীর্ঘতম।
গণ্ডব্যূহ	—	মহাযানের নয়টি শাস্ত্রগ্রন্থের অন্যতম।
সমাধিরাজ	—	নানা প্রকারের সমাধির বিবরণ গ্রন্থ।
মহাপ্রতিসরা	—	'পঞ্চরক্ষা' গ্রন্থের অন্যতম।
যন্ত্র	—	দেবতার লিঙ্গ-প্রতীক। এটিও দেবতারূপে পূজিত।
হোলিওয়েল স্ট্রিট	—	একদা লন্ডনের বিখ্যাত বইপাড়া Holly Well Street. একদা এ পল্লীটি অশ্লীল সাহিত্যের আখড়া ছিল।
পুণ্যানুমোদনা	—	পুণ্য কাজের অনুমোদন।
পাপদেশনা	—	পাপকর্ম থেকে বিরত হবার শপথ।
পোষধব্রত	—	বিনয় পিটক-এর মহাবগ্‌গ বর্গের দ্বিতীয় অধ্যায়ে

কথিত উপদেশ। প্রাণীহিংসা বর্জন, মিথ্যাচরণ বর্জন ও তামসিক বর্জন—এঁদের ব্রত।

বিক্রমশীল — রাজাধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত বিহারের মহাবিহার—অষ্টমশতকের শেষপাদে প্রতিষ্ঠিত। চোলগাং রেল-স্টেশনের ১৩ কিমি. উত্তরে অবস্থিত।

নালন্দা — বিহারের রাজগিরের ১০ কিমি. উত্তরে প্রাচীন মহাবিহার-বিশ্ববিদ্যালয়টি পঞ্চম শতকেই বিখ্যাত হলেও হর্ষবর্ধনের সময়েই (৬০৬-৬৪৭ খ্রি.) এর পূর্ণবিকাশ ঘটে।

জগদ্দল — রাম পালের রাজত্বকালে (১০৭৭-১১২০ খ্রি.) বরেন্দ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত বিহার।

বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল?

গিয়াসুদ্দিন বলবন্ — এই তুর্কি ক্রীতদাস ১২৩২ খ্রিস্টাব্দে মনিবের সঙ্গে ভারতে এসে ইলতুতমিসের কাছে বিক্রীত হন এবং পরিশেষে ভারত অধিপতি হন।

পরমসৌগত মধু সেন — গৌড়েশ্বর-এর উপাধি বিশেষ। সেন বংশের অধিপতি বলে অনুমিত।

শূলপাণি — বাংলার নব্য-স্মৃতির প্রবর্তক। জন্ম যশোহর জেলায় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে শ্রাদ্ধবিবেকঃ এবং প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ অন্যতম গ্রন্থ।

বোধিচর্য্যাবতার — শান্তিদেব রচিত অষ্টম শতকের অন্যতম বৌদ্ধ-শাস্ত্র গ্রন্থবিশেষ।

উণাদিবৃত্তি — কাতন্ত্র নামে যে সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ লিখেছিলেন সর্ব-বর্মা ; সেই গ্রন্থের সূত্রবিশেষ।

বৃহস্পতি — রায় মুকুট উপাধিধারী বৃহস্পতি মহিন্তা।

চূড়ামণি দাস — গ্রন্থের নাম 'গৌরাঙ্গ বিজয়', ১৫৪২-৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত।

জয়ানন্দ — 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা। এঁর গ্রন্থেই প্রথম চৈতন্য তিরোধানের কারণ লিখিত হয়।

নাথ — তারানাথ (লামা)।

এখনো একটু আছে

হজসন্ সাহেব — Brian Houghton Hodgson (১৮০০-৯৪) — ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের অন্যতম স্থপতি। শাসনব্যবস্থার সঙ্গে মানবিক ও বিজ্ঞান বিষয়ে এই ব্যক্তির কৌতূহল ও অধিকার ছিল বহুধা বিস্তৃত। তিনি কাঠের ব্লকে ছাপা তিব্বতী বৌদ্ধশাস্ত্র—সম্পূর্ণ কেঙ্গুর-তেঙ্গুর সংগ্রহ করেন।

অমৃতানন্দ — পূর্বোক্ত হজসন্-এর বন্ধু বিশেষ এবং তথ্য সংগ্রহ ব্যাপারে প্রধান সহায়ক।

ভদ্রকল্প — এর অর্থ কাল পরিধি। এই কালে পাঁচ বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে।

লোকধাতু — মহাবিশ্বলোক বহু লোকধাতুর সমন্বয়ে গঠিত।

উড়িষ্যার জঙ্গলে

নগেন্দ্রনাথ বসু — (১৮৩৬-১৯৩৮) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব। বিশ্বকোষ (২২ খন্ড) ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রণেতা। শব্দেন্দু মহাকোষ রচনার সূত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্পর্শে আসেন। প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ সংগ্রহের জন্যে উড়িষ্যা ও অন্যান্য বহু স্থানে পরিভ্রমণ করেন। ভারতীয় পুরাতত্ত্বে অসাধারণ পান্ডিত্যের জন্য 'প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব' উপাধিভূষিত হন।

ঐর — এই নামে কোনও রাজা মগধের কবল থেকে উড়িষ্যাকে যে উদ্ধার করেছিলেন—এমন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

লক্ষ্মীঙ্করা — তান্ত্রিক বৌদ্ধমতে তিনি উড্ডীয়ানরাজ ইন্দ্রভূতির কন্যা। এই উড্ডীয়ান, হরপ্রসাদের মতে, উড়িষ্যার অন্তর্গত।

মুকুন্দদেব — অন্ধ্রদেশের মুকুন্দ হরিচন্দন (১৫৫৯-৬৮) ওড়িশার শেষ স্বাধীন হিন্দু নরপতি।

পুরুষোত্তম — পুরীর অধিষ্ঠাতা দেবতা জগন্নাথ দেব।

ভীমোভাই — জন্ম ১৮৫২—দ্রাবিড় গোষ্ঠীর উপজাতি জাত। মৃত্যু ১৮৯৫।

অরক্ষিত দাস — ওড়িশার গঞ্জামজাত—ধর্ম ব্যাপারে সাম্যবাদী।

জাতক ও অবদান

আর্যশূর — উত্তরপ্রদেশের এই ব্রাহ্মণ পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কবেন। এঁর রচনা 'কর্মফল নির্দেশসূত্র'। অন্যগ্রন্থ 'জ.তকমালা' 'বোধিসত্ত্ব-অবদান মালা' নামেও প্রচারিত। এতে ৩৪টি জাতক-গল্প আছে।

বসুবন্ধু — গান্ধার বা আধুনিক পেশোয়ারে এঁর জন্ম। সম্ভবত ৪র্থ শতকে এঁর জন্ম হয়। দীর্ঘজীবী এই ব্যক্তি প্রথমে বৈভাষিক দর্শনে বিশ্বাসী হলেও পরে যোগাচার গ্রহণ করেন।

ক্ষেমেন্দ্রব্যাস দাস — একাদশ শতকের এই নানা শাস্ত্রবিদ্ মনীষী 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র ১০৭টি আখ্যান রচনা করেন।

মহাসাংঘিক মত

মহাকাশ্যপ — মগধের মহাতীর্থ গ্রামে জাত বুদ্ধদেবের এই ধর্মপুত্রটির পূর্বনাম ছিল পিপ্পলি। বুদ্ধদেব তাঁর সঙ্গে অন্তর্বাস বিনিময় করেছিলেন। প্রথম বৌদ্ধসংগীতিতে তিনি আনন্দ ও উপালির সঙ্গে বিনয়পিটক ও সূত্রপিটক সংকলন করেন।

পুষ্যমিত্র — বৌদ্ধসাহিত্যে ইনি বৌদ্ধ বিদ্বেষী নামে চিত্রিত। ইনি অশোক নির্মিত ৮৪ হাজার স্তূপকে নাকি ধ্বংস করে বিখ্যাত হতে চেয়েছিলেন। ইনি নাকি দু'বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন।

থেরাবাদ ও মহাসাংঘিক

মহাবস্তু অবদান — বৌদ্ধবিদ্যার এই কোষগ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী বুদ্ধ জাতক এবং অন্যান্য বহু প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। এটি সম্ভবত ২-৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে সংকলিত হয়।

মানুষ ও রাজা

চন্দ্রকীর্তি — বৌদ্ধ মাধ্যমিক দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা চন্দ্রকীর্তি

নাগার্জুন ও আর্যদেবের মতবাদের প্রচারক ছিলেন। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের এই মনীষী ধর্মপাল ও কমলবুদ্ধের ছাত্র ছিলেন এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যায় হন। তাঁর মতবাদ প্রাসঙ্গিকবাদ নামে বিখ্যাত।

ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার

কথাসরিৎসাগর — গুণাঢ্য রচিত বৃহৎকথা লুপ্ত হয়ে গেলে কাশ্মীরের কবি সোমদেব ভট্ট ১০৬৩-৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৯০০ কাহিনী সম্বলিত ২১৩৮৮ শ্লোকে এই গ্রন্থ রচনা করেন।

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ

গাবার — ভারতে অনাগত জরথুস্ত্রধর্মাবলম্বী পারস্যবাসী।

রাহুল — বুদ্ধের একমাত্র সন্তান।

কশ্যপ — মগধের মহাতীর্থে জাত। পিতা কপিল, মাতা সুমনা। পূর্বনাম পিপ্পলি। তিনি নিজেকে বুদ্ধের ধর্মপুত্র ভাবতেন। বিনয়পিটক ও সূত্রপিটক সংকলনে উপালি ও আনন্দকে সহযোগিতা করেন এই দীর্ঘজীবী ভিক্ষু।

কাত্যায়ন — বুদ্ধদেবের অন্যতম এই শিষ্য কচ্চায়ন বা কচ্চান নামেও পরিচিত।

উপলি — বুদ্ধদেবের খুল্লভ্রাতা উপলি বা উপালি অগ্রজদের সঙ্গে সঙ্ঘে প্রবেশ করেন বুদ্ধের কাছে প্রথম দীক্ষা পেয়ে। 'বিনয়পিটকে'র মুখ্য সংকলক।

প্রবোধচন্দ্রোদয় — চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মার অনুরোধে কৃষ্ণমিত্র একাদশ শতকে এই নাটকটি রচনা করেন।

অগস্টিন — পোপ প্রথম গ্রেগরি ক্যান্টারবেরির প্রথম আর্চবিশপ এই সন্তকে ইংল্যান্ডে পাঠালে তিনি সেখানে ধর্ম প্রচার করেন ও বর্ষপঞ্জীর প্রবর্তন করেন।

শ্বোয়ার্টজ — ইনি সম্ভবত জার্মান প্রচারক Karl Schwartz (১৮১২-১৮৮৫)।

ডফ — আলেকজান্ডার ডাফ (১৮০৬-৭৮)— কলকাতার খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের অন্যতম।

বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম

কিরান্তি	—	সম্ভবত কিরাতজাতির কোনও উপশাখা।
পৌন্ড্রবর্ধন	—	পূর্বনাম পুন্ড্রবর্ধন—উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম এই নগরটি বর্তমান বাংলা দেশের বগুড়া জেলার অন্তর্গত। এর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। হিউয়েন সাং এই শহরটি দেখেছিলেন।
কুমারিল ভট্ট	—	খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে জাত মীমাংসা দর্শনের এই প্রখ্যাত পন্ডিত-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্লোকবার্তিক'
ভবভূতি	—	কালিদাসোত্তর এই মহাকবি মহাবীর চরিত, উত্তর রামচরিত এবং মালতী মাধব-এর বিখ্যাত রচয়িতা।
বিজয়	—	এই বিজয় সিংহ বাঙালি ছিলেন কিনা এবিষয়ে সন্দেহ আছে। যেহেতু, তাঁর জাহাজ ভরুকচ্ছ ছুঁয়ে গেছিল, সেজন্য তাঁকে অনেকে রাট বা গুজরাটের ব্যক্তি বলে মনে করেন।
তাম্রলিপ্তি	—	আধুনিক তমলুক— মেদিনীপুরের অন্তর্গত।

হিন্দু বৌদ্ধে তফাত

ইৎসিং	—	বিখ্যাত এই চৈনিক পরিব্রাজক (৬৩৫-৭১৩ খ্রিস্টাব্দ) ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে তমলুকে পদার্পণ করেন ও দশ বছর নালন্দায় বাস করেন। তাঁর বিবরণ খুবই উল্লেখযোগ্য।
দিঙ্‌নাগ	—	কাঞ্চীতে জাত খ্রিস্টীয় পঞ্চাশ শতকের এই মনীষী ত্রিপিটকে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন ও বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর লেখা বইগুলি হারিয়ে গেছে।
উদ্যোতকর	—	অন্যতম ভরদ্বাজ বা পাশুপতাচার্য। শৈব সম্প্রদায়ের এই গুরু 'ন্যায়বার্তিক'-এর রচয়িতা।
চার্বাক	—	চারুবাক— ভাল কথা বলতেন বলেই সম্ভবত এই নাম। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ-মতের প্রবর্তক।
মৈত্রেয়	—	যোগাচার মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা। বোধিসত্ত্ব-চর্চা-নির্দেশ, সপ্তদশ-ভূমি-শাস্ত্র-যোগাচার্য এবং অভিসময়ালংকার-কারিকার রচয়িতা।

মধ্বাচার্য — উদিপিতে ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ৩৭টি গ্রন্থের রচয়িতা। এঁর মতবাদের নাম দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—অর্থাৎ ঈশ্বর দ্বৈত এবং অদ্বৈত দুই-ই। এঁরা পৃথক নন।

সদ্ধর্ম পুন্ডরীক — মহাযান সূত্রের নয় প্রধান গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

ভাস্করাচার্য — ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই জ্যোতির্বিদ জন্মগ্রহণ করেন ১১১৪ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের বিজ্জনবিড় গ্রামে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' (১১৫০ খ্রি.)।

বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন?

পালি — এই শব্দের প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় 'জাতক কথা' নামক গ্রন্থে।

রাজশেখর — ৯-১০ শতকে বর্তমান এই লেখক কাব্যমীমাংসা রচনা করেছিলেন। অন্যগ্রন্থাদির মধ্যে বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা ও কর্পূর মঞ্জরী বিখ্যাত।

ললিতবিস্তার — বিখ্যাত বুদ্ধজীবনী।

বাংলার বৌদ্ধসমাজ

পাচিত্তিয়ো — প্রায়শ্চিত্তীয় ধর্ম—বিনয়পিটকে উল্লিখিত।

কৌলজ্ঞান নির্ণয় — নাথধর্মাবলম্বী মৎসেন্দ্রনাথের রচিত বলে অনুমিত তন্ত্রগ্রন্থবিশেষ।

নামলিঙ্গানুশাসন — এটি আসলে 'অমরকোষ' নামেই সমধিক প্রচারিত-সংকলক ঃ অমরসিংহ।

পিঙ্গল নাগ — ইনি 'ছন্দসূত্র' নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

কাব্যালংকার — ভামহ রচিত অলংকার গ্রন্থ।

কোরুনন্দ — এই বৌদ্ধ নৈয়ায়িক-এর উল্লেখযোগ্য রচনা—প্রমাণ-বার্তিক-কারিকা, প্রমাণ-বার্তিক-বৃত্তি, ন্যায়বিন্দু প্রভৃতি।

গঙ্গেশ উপাধ্যায় — তত্ত্বচিন্তামণি বা প্রমাণ চিন্তামণি গ্রন্থের মৈথিলী লেখক।

খলিফা	—	ইসলাম ধর্মীয় রাষ্ট্রপ্রধান।
বরাহমিহির	—	(৫০৫-৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ) বিখ্যাত জ্যোতিষী। এঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'বৃহৎসংহিতা'।
উৎপল ভট্ট	—	বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'র টীকা প্রণেতা।
ভবদেব ভট্ট	—	১১-১২ শতকের এই ব্যক্তি হরিবর্মদেবের সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী ছিলেন। বৌদ্ধবিদ্বেষী এই ব্রহ্মবিদ্ নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।
হলায়ুধ	—	লক্ষ্মণ সেনের ধর্মাধ্যক্ষ বা বিচারপতি। বিখ্যাত গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব'।
তন্ত্রসার	—	কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ রচিত বিখ্যাত তন্ত্রগ্রন্থ। চৈতন্যদেবের সময়ে বর্তমান ছিলেন।

ভারতের ভক্তি সাধনায় বৌদ্ধপ্রভাব

বার্হস্পত্য	—	নাস্তিক দর্শন প্রবর্তক বৃহস্পতির মতবাদ। এঁর গ্রন্থই বৃহস্পতিসূত্র।
কেবলী জ্ঞান	—	জৈন মতবাদ বিশেষ। এই মতবাদে মোক্ষলাভের আগে কেবল জ্ঞানের উদয় ঘটে।
বিষ্ণুস্বামী	—	সম্ভবত দশম শতকের এই মনীষী উপনিষদ, গীতা, ভাগবত ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করে বিখ্যাত হন।
নিম্বাদিত্য	—	অন্য নাম নিম্বার্ক—রামানুজের ছোট ভাই। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদগুলি নিয়ে বিরোধী মতবাদগুলির সমন্বয় সাধন করে গ্রন্থ রচনা করেন।
নরসিংহ	—	গুজরাটের এই ভক্ত কবির ভজনগুলি প্রসিদ্ধ।
রামপ্রসাদ সেন	—	বিখ্যাত বাঙালি কবি। কালীকীর্তন ও বিদ্যাসুন্দরের রচয়িতা।